অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক • সালাহউদ্দীন আইয়ুব

দেশ

সমালোচনাতত্ত্ব, সাহিত্যের বোধ ও ব্যাখ্যা, নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতিজিজ্ঞাসা বিভিন্নভাবে বদলে গেছে আজকের পৃথিবীতে। নিখুঁত সাহিত্য কিংবা নিশ্ছিদ্র নন্দনতত্ত্ব এখন অতিকথা মাত্র: গত দু-আড়াই দশকে পশ্চিমের পোস্টস্ট্রাকচারালিজম ও পোস্টমডার্নিজম প্রায় সবকিছুকেই বদলে দেয় রাতারাতি। সমর্থন বা অসমর্থনের প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, এইসব ভাবনা ও বিতণ্ডা উদ্দীপক তো বটেই প্রচণ্ডভাবে সৃষ্টিশীলও। বহুকাল ধরে কবিতা ও কথকতাই ছিলো সৃষ্টিশীলতার প্রধান দুই আধার, আজো আছে–কিন্তু তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে সমালোচনা ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যান। পশ্চিম আমাদের মনে করে 'আদার', আমরাও পশ্চিমকে আপন ভাবি না। আমরা 'টেক্সট' নই, পশ্চিমের গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভের 'ফুটনোট'; তারপরও তাদের বিদ্যার পরিবেশ, জ্ঞানের কলকজা আমাদের আয়ত্তে থাকা দরকার। সালাহউদ্দীন আইয়ুব তরুণতম সমালোচক, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও গদ্যের লাবনিতে তাঁর রচনা এরই ভেতর সুধী-সামাজিকের মনে আলোড়ন তুলেছে। অরিয়েন্টালিজম ও এডওয়ার্ড সাইদের প্রতিপাদ্য, পশ্চিমের ভারতচর্চা, সাইদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা, সাম্প্রতিক অনুবাদতত্ত্ব, নারীবাদ ও তার সমালোচনাতত্ত্ব, নিম্নবর্গীয় ইতিহাসপ্রকল্প, উপনিবেশবাদের প্রধিকার, মিশেল ফুকো ও জাক দেরিদার চিন্তাধারা, সর্বোপরি উত্তরগ্রহনবাদী/উত্তরাধুনিক ভাবনাগুচ্ছ ও তার রাজনীতি স্বচ্ছ গদ্যে বিশ্লেষিত হয়েছে আইয়ুবের 'অরিয়েন্টালিজম, ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক বইতে।

মূল্য:১০০ টাকা

দেশ
দেশ প্রকাশন
৪০, আজিজ কো- অপারেটিভ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

দেশ

দেশ প্রকাশন

অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা
ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

প্রথম প্রকাশঃ
১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬

প্রকাশক ঃ
সাদী রহমান
দেশ প্রকাশন
৪০ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

প্রচ্ছদ ঃ
নূর ইসলাম প্রামানিক

কম্পোজ ঃ
চলন্তিকা কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ
ডায়নামিক প্রিন্টার্স (প্রা:) লি:
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

মূল্য: ১০০.০০ টাকা

ISBN-984-8182-02-0

Orientalism, Colonialism and Cultural Studies by Salahuddin Ayub. Published in 1st February 1996 by Saadi Rahaman, Desh Prakashan, 40 Aziz Co-operative Supper Market (ground floor), Shahbag, Dhaka 1000, Bangladesh. Price: Taka 100.00 ($ 4 abroad)

উৎসর্গ

ফৌজিয়া আখতার

মুখবন্ধ

আমার গদ্য ও তার বিষয়ের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের মনে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্নটা আমার বইয়ের বিষয়-আশয় সম্পর্কে। কেন এইসব বিষয়ে আমি লিখে চলেছি, সংক্ষেপে এই-ই হয়তো তাঁদের জানবার কথা। এর প্রথম উত্তর কেবল এইটুকু যে, আমার যা লেখার কথা, তাই লিখেছি; আর কিছু লিখবার ছিলোনা ব'লে লিখিনি। দ্বিতীয় কথা দেশজতা নিয়ে ,অর্থাৎ আমার রচনা 'স্বাদেশিক' কিনা। একজন বাঙালি বাঙলা ভাষায় লিখছে, দেশজতা ও স্বাদেশিকতার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো যুক্তি কি আর দিতে পারি! তৃতীয় কথা উপযোগ সংক্রান্ত। 'গণতন্ত্র, দেশবিদেশের রাজনীতি ও সমস্যা নিয়ে লিখলে যেরকম 'উপযোগী' হতো, আমার লেখার সেই 'উপযোগ' নেই তা আমি স্বীকার করি। তবে একটি কথা আগাম জানিয়ে দিই—আমার সাম্প্রতিক লেখাজোখা সম্ভবত কোনো বৃহৎ স্বদেশী বিষয়ের উপক্রমণিকা। বন্ধুরা জানেন, অনেকদিন ধরে আমি বাংলা রূপকথার রেটরিক ও মতাদর্শ নিয়ে মগ্ন: ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হেনরি গ্লাসির সঙ্গে শলা-পরামর্শের একটা কিনারা হলে অচিরেই সে-বিষয়ে বই লেখার ইচ্ছে। এর মধ্যে 'অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক' বইয়ের প্রবন্ধগুলো তৈরি হয়ে গেলো। তবে পরিসরের অভাবে অনেক গদ্য অন্তর্ভুক্ত হলো না।

আমার বক্তব্য বইতে মুদ্রিত আছে, আলাদাভাবে তার ভূমিকা লেখা বাহুল্য। দু-একটি তথ্য কেবল দিতে পারি। এ বইয়ের কিছু লেখা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ইত্তেফাক' 'সংবাদ' ও ' দৈনিক বাংলা'র সাহিত্যসম্পাদক, 'সমাজ নিরীক্ষণে'র বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'সুন্দরমে'র মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'একবিংশে'র খোন্দকার আশরাফ হোসেন 'উত্তরাধিকারে'র রশিদ হায়দার, 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা'র আজহার ইসলাম, 'জিজ্ঞাসা'র শিবনারায়ণ রায়, 'অনুষ্টুপে'র অনিল আচার্য ও 'অমৃতলোকে'র সম্পাদক-কে ধন্যবাদ জানাই। দৃশ্যত নয় পরোক্ষ, অথচ সংক্রামকভাবে, অনুপ্রাণিত করেছেন- ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

ফোকলোর বিভাগ : বর্ধমান হাউস
বাঙলা একাডেমি : ঢাকা
৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

লেখকের অন্যান্য বই

আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা (প্রবন্ধ)

দক্ষিণ পূর্ববাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (অনুবাদ)

বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব (অনুবাদ: প্রকাশিতব্য)

বাংলা রূপকথা : লোকবাদ ও মতাদর্শ (প্রকাশিতব্য)

সূচিপত্র

অরিয়েন্টালিজম ও রোঁলা বার্থ

এক.

"অরিয়েন্টালিজম" (১৯৭৮) বইতে এডওয়ার্ড সাইদ পশ্চিমের আধুনিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ইংরেজি 'অরিয়েন্টালিজম'কে বাংলায় বলা যায় প্রাচ্যতত্ত্ব বা প্রাচ্যতন্ত্র: এটা পশ্চিমের একটা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানপ্রকল্প। এডওয়ার্ড সাইদ এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে পশ্চিমের আধুনিকতাকে বিপন্ন করেছেন। সাইদ তদন্ত করেছেন পশ্চিমে কিভাবে জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতা, পান্ডিত্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, এবং বিদ্যার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা যুক্ত হলো। প্রাচ্যতত্ত্বের প্রশ্ন থেকে তিনি চলে যান আরো বড়ো প্রশ্নে : (ক) একজন তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে অন্য সংস্কৃতির দিকে কিভাবে তাকায়? (খ) একজন কি কেবল নিজের সংস্কৃতিকে অভিনন্দন জানায়, এবং বিপরীতে অন্য সকলের সংস্কৃতিকে উপহাস করে ? (গ) সাংস্কৃতিক ,ধর্মীয় এবং জাতিগত পার্থক্য কি সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসের তুলনায় বড়ো ? (ঘ) মতাদর্শ কিভাবে কর্তৃত্ব তৈরি করে? সেই কর্তৃত্ব কিভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে? সেই স্বাভাবিকতাকে কিভাবে অতঃপর প্রাকৃতিক মনে হয়? এডওয়ার্ড সাইদ বিশ্লেষণ করে দেখান, অরিয়েন্টালিজম পশ্চিমের সেই প্রজেক্ট , যার পেছনে কার্যকর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও প্ররোচনা; প্রাচ্যতত্ত্বের পান্ডিত্যের কলাকৌশলের অন্তরালে পশ্চিমের রাষ্ট্রের দাবি, ঔপনিবেশিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'অরিয়েন্ট' বা প্রাচ্যের লোকেরা হলো 'অবাস্তব'; তারা বেঁচে থাকে, কিন্তু তাদের কোনো বাস্তব নেই, তারা রোমান্টিক, এবং একটা পরাতাত্ত্বিক ভূগোলে তাদের বসবাস। বাস্তব জীবন আছে কেবল পশ্চিমের, কেননা তাদের আছে ক্ষমতা, রাজনীতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। অরিয়েন্টের ভেতর পশ্চিম খুঁজে পায় কেবল দুর্বলতা, অবাস্তবতা, দুর্গতি, মালিন্য , রোমান্টিকতা । ফ্রেডরিক শ্লেগেলের প্রাচ্যচর্চা বহুবিদিত; তিনি প্যারিসে এসে সংস্কৃত পড়েন; তাঁর এক হাতে ছিলো সংস্কৃত ও ফার্সি, অন্য হাতে গ্রীক এবং জর্মন। ১৮০০ সালে শ্লেগেল লেখেন: রোমান্টিকতার খোঁজে আমরা যেতে পারি অরিয়েন্টের কাছে— তবে এই রোমান্টিকতা প্রাচীন যুগের, এ হলো শকুন্তলা, যেন্দাবেস্তা, উপনিষদের রোমান্টিকতা। কিন্তু সেমেটির ভাষা শ্লেগেলের অপছন্দ ; কারণ সেমেটির ভাষা নাকি অনান্দনিক, শিক্ষাবোধশূন্য, যান্ত্রিক; কারণ সেমেটিরা ভিন্ন, পশ্চাদপদ, হীনমন্য। হিব্রুকে শ্লেগেল ভেবেছেন অতিপ্রাকৃত জগতের ভাষা; আর মুসলমানদের তাঁর মনে হয়েছে মৃত এবং শূন্যগর্ভ; মুসলমানদের ধর্মে গোঁড়ামি, অন্ধতা এবং না বাচকতা ছাড়া তিনি আর কিছু দেখেন নি। শ্লেগেলের বিশ্লেষণে ভাষা এবং জাতি এক- রজ্জুতে বাঁধা—কাজেই ইউরোপিয়রা যেহেতু শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের ভাষাও শ্রেষ্ঠ। শ্লেগেল 'ভালো অরিয়েন্টে'র দেখা পেয়েছেন কেবল ধ্রুপদী ভারতবর্ষে : উপনিষদের পৌরাণিক গীতময় আবহাওয়ায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ঘুরে ফিরে আসে। গোবিনিউ রেনান, হামবলড্ট, স্তাঁদাল, বারনউফ, রেমুসাট পালমার, ওয়েইল, ডসি, মুইর প্রমুখ। এদের সকলেই দাপ্তরিক কর্তব্য ও আপিশী তাগিদে অরিয়েন্টালিজমের চর্চা করেছেন। সেই সঙ্গে কয়েকটি সমিতি এবং সংগঠনও একই কর্তব্য পালন করেছে: (১) সোসাইটি এশিয়াটিক, প্রতিষ্ঠাকাল : ১৮২২: (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৩; (৩) অ্যামেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি, প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪২। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে ভ্রমণসাহিত্যের কথা যাঁরা ভ্রমণসাহিত্য লিখেছেন, তাঁরা অরিয়েন্ট-বিষয়ক ধারণাগুলোকে মদদ যুগিয়েছেন ভালোভাবে, পশ্চিম থেকে প্রাচ্য কতো ভিন্ন, বেগানা, উদ্ভট, এবং অপরিচিত কুশলতার সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে ইসলামী অরিয়েন্ট নিয়েও লেখা হয়েছে অনেক। লিখেছেন গ্যাটে, হুগো, লামারতিন, কিঙ্গলেইখ, নেরভাল, ফ্লবেয়ার, লেইন, বার্টন, স্কট, বায়রন, ডিসরায়লি, জর্জ এলিয়ট এবং গোতিয়ের মতো লেখকেরা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায়ও প্রাচ্যতত্ত্বে কাজ করেছেন অনেকে, যেমন : ডউটি, ব্যারেস, লটি, টি. ই. লরেন্স, ফরস্টার। ডিসরায়লি যে গ্রেট এশিয়াটিক মিস্ট্রি, বা মহান এশীয় মরমীবাদের কথা বলেছিলেন, এইসব লেখকদের সমবায়ী প্রযোজনায় সেই প্রতিপাদ্য, আকল্প, বা উপকল্পই, সম্প্রসারিত হয়েছে। মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্কের মৃত-লুপ্ত সভ্যতার কঙ্কাল এদের প্রাচ্যগবেষণাকে দারুণ উজ্জীবিত করেছে। আর সেজন্যেই ডিসরায়লির পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে: 'দি ইস্ট ইজ এ ক্যারিয়ার'।

অরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব হলো একটা বৃহৎ প্রবেশপথ: এই প্রবেশপথ দিয়ে ইউরোপিয়েরা সমগ্র নিকট প্রাচ্যে (ওসমানী সাম্রাজ্যের কিছু অংশ বাদে) ঢুকে পড়ে এবং দখল করে নেয়। এ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে পুরনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বৃটেন এবং ফ্রান্স, অবশ্য রাশিয়া এবং জার্মানিও পালন করে একই ভূমিকা। উপনিবেশ তৈরির প্রধান শর্ত স্বার্থের হিশেবনিকেশ, এবং স্বার্থের সুযোগ সৃষ্টি। স্বার্থ বাণিজ্যিক, যোগাযোগ-সম্পর্কিত, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবই হতে পারে। বৃটিশরা এ ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মকেও উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে: বেশ কিছু সংগঠন সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যেমন (১) সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চান নলেজ (১৭০১); (২) ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি (১৭৭২) ;(৩) সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অফ দি গসপেল ইন ফরেইন পার্টস (১৭০১); (৪) চার্চ মিশনারী সোসাইটি (১৭৯৯) ;(৫) ব্রিটিশ এণ্ড ফরেইন বাইবেল সোসাইটি (১৮০৪) ;(৬) লন্ডন সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চানিটি অ্যামাং দি জিউস (১৮০৮)। এই সব সংস্থা-সংগঠন খোলাখুলিভাবে ইউরোপিয় সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে।

ঔপনিবেশিক শক্তি প্রশাসনিক নিরাপত্তার জন্যে ধর্মকে কাজে লাগায়। বৃটিশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই ধর্ম মূলত খ্রিস্টধর্ম। ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা এর গভীর রাজনীতি সহজে আন্দাজ করতে পারি। বৃটিশ মিশনারীরা ভাষা, জীবন ও সংস্কৃতিতে

প্রচন্ড হস্তক্ষেপ করেছেন। বৃটিশ মিশনারীদের হস্তক্ষেপে বাংলা গদ্যের অস্বাভাবিক বিকাশ এবং অস্বাভাবিক ঐতিহাসিকতা তৈরি হয়। বৃটিশরা না এলে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটতো না, এমন কি বাংলা গদ্যও তৈরি হতো না, এই ধারণা আমাদের মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে তৈরি করে দেন। অথচ আনিসুজ্জামানের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাচ্ছে, আঠারো শতক নয় ষোল শতক থেকেই, ধারাবাহিকভাবে বাংলা কাজের গদ্যের এবং ভাবের গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা আঠারো শতককেই বাংলা গদ্যের আবির্ভাবকাল বলে চিহ্নিত করেন, এবং এই চিহ্নায়নের ভেতর এমন একটি মনোভঙ্গি আছে যে, যেন তার আগে বাঙালীরা কবিতায় কথা বলতো। কবিতাতেই রোজকার মানুষের যোগাযোগ হতো। কিন্তু আজ দেখা যাচেছ সেই সুদূর ষোলসতের শতকে বৈষ্ণব মহাজনেরা তাত্ত্বিক গদ্য লিখেছেন, বাংলা গদ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব। ষোল শতকে বাংলা কাব্যের ঐশ্বর্য ও দীপ্তিকে যদি অস্বীকার করা না যায়, বাংলা গদ্যের উদ্ভবকে অস্বাভাবিক ভাববো কেন? ষোল শতকের গদ্যে পয়ারের ছাপ থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, ছিলোও, কিন্তু এই ছাপ দেখে সেই গদ্যকে পদ্য বলার যুক্তি নেই। পয়ার-পদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই গদ্যে সংস্কৃত সূত্ররীতির প্রভাবও ছিলো : তবু তা গদ্যই, ষোলোশতকী গদ্য, আনিসুজ্জামানের "পুরোনো বাংলা গদ্য" (১৯৮৪) প্রকাশিত হবার পর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এ বইতে আনিসুজ্জামান ষোলশতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের উদ্ভব, বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত হাজির করেছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাস নতুন করে লিখতে গিয়ে আনিসুজ্জামান আমাদের মনে করিয়ে দেন মলিয়েরের একটি চরিত্রের উক্তি: 'হায় ইশ্বর! চল্লিশ বছর ধ'রে তাহলে না জেনেই আমি গদ্য বলে আসছি'। বৃটিশ উপনিবেশের কর্তাগণ আমাদের ভাষার বিকাশের ইতিহাসকে বদলে দেন, বিকৃত করেন, এবং এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেন যে নিজেদের ভাষার সঠিক ইতিহাস খুঁজতে আমাদের দু'শতাব্দীর বেশি সময় লেগে যায়।

এডওয়ার্ড সাইদের 'অরিয়েন্টালিজম'-এ ফিরে আসি। অরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্যের কোনো ভৌগোলিক সীমা স্বীকার করেন না: যা পশ্চিম নয় তাই অরিয়েন্ট, এবং তাই আদার; অথচ প্রাচ্যের জীবন বা সংস্কৃতি কি এক, কিংবা একরকম? তা নয়, এবং তা হয়না। কিন্তু প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা সমগ্র প্রাচ্যকে এক করে দেখেছেন, এবং এক ক্যাটেগরিতে বিন্যাস করেছেন। সাইদ বলেন: প্রাচ্যের লোকেরা তাদের দৃষ্টিতে প্রথমত একজন অরিয়েন্টাল, দ্বিতীয়ত একজন মানুষ, এবং তৃতীয়ত, আবারো, একজন অরিয়েন্টাল (পৃ ১০২)। আর এই অরিয়েন্টাল বলতেই ফরাশি লেখক ফ্লবেয়ারের মনে পড়ে চোর, লুচ্চা, বদমাশ, অভদ্র, গেঁয়ো, মরমী, উগ্র মনুষ্যপালের কথা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা 'সবসময়' অরিয়েন্ট'কে ওয়াচ করেছেন, কখনো ইনভলবড হননি। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কাছে ইসলামও 'অরিয়েন্টাল', কার্ল বেকার লেখেন : যদিও ইসলাম হেলেনিয় উত্তরাধিকার আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু তবু গ্রীক হিউম্যানিজমের সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো তৈরি হয়নি: গ্রীক দর্শন থেকে 'ইসলাম' বহু কিছু নিয়েছে, তবুও গ্রীক-দর্শনের সৃষ্টিশীল কল্পনাকুশলতা ইসলামে নেই: যদি থাকতো ইউরোপের রেনেসাঁ মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিতো (পৃ.

১০৩)। ফরাশি অরিয়েন্টালিস্ট লুই ম্যাসিগননের মতে, ইসলাম ধর্মের সারকথা হলো, মহান যিশুর আবির্ভাবকে অস্বীকার করা; আর মুসলমানদের বীর নায়ক যদি কাউকে বলতে হয় তবে তিনি 'মুহাম্মদ' নন, মনসুর হাল্লাজ' [পৃ. ১০৩] সাইদ বলেন, লুই ম্যাসিগনন বিদ্বান ব্যক্তি, তিনি যা লিখেছেন এবং যে অদ্ভুত সরলীকরণ করেছেন, তা জ্ঞানকৃত; খ্রিষ্টধর্ম, তার কাছে স্বভাবতই একমাত্র ধর্ম হিশেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদের চেয়ে মনসুর হাল্লাজ বড়ো, এই অদ্ভুত কথা তিনি কেন বললেন? তা কি এজন্যে নয় যে, মনসুর হাল্লাজের বিয়োগান্ত পরিণতির সঙ্গে যিশুখৃষ্টের জীবনের মিল পাওয়া যায়। ম্যাসিগনন মনে করেন, ইস্ট-ওয়েস্টের মধ্যে যে দূরত্ব, আধুনিকতা ও প্রাচীনতার মধ্যে সেই পার্থক্য। ইসলামী অরিয়েন্টকে তিনি সবসময় প্রাচীনকালের মধ্যে স্থাপন করেছেন, এবং পশ্চিমকে ব্যাখ্যা করেছেন সতত আধুনিক বলে। প্রাচ্য অপরিবর্তিত, এবং অপরিবর্তনীয়; প্রাচ্য একটা দূর অতীতের আখ্যান,এবং প্রাচ্যের মূল্য এই ঐতিহ্য, অতীত ও প্রাচীনতার জন্য। প্রাচ্য যে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং হয়েছে, প্রাচ্যের মানুষগুলোর যে একটা মুখর বর্তমান, এমনকি উপনিবেশ বিরোধিতার স্মরণীয় সংগ্রাম আছে, ম্যাসিগননের টেকস্ট সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশব্দএবং নির্বাক। প্রাচ্যকে সমকালীন সত্য হিশেবে দেখতে বা ভাবতে চাননি অরিয়েন্টালিস্টরা।

অরিয়েন্ট এবং অরিয়েন্টালিজমের সঙ্গে ইউরোপ সরাসরি জড়িত বহুকাল থেকে, কেবল মার্কিনদের ধারণা এ বিষয়ে একটু ভিন্ন—তারা অরিয়েন্ট বলতে দূরপ্রাচ্য, অর্থাৎ চীনজাপানকে, বোঝে। পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচ্য কেবল জড়িতই নয়, প্রাচ্য বহুকাল ধরে তাদের সম্পদশালী উপনিবেশ ছিল। অথচ অরিয়েন্টকে তারা সবসময় দেখেছে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জীবন, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন জাতি, হিশেবে। অরিয়েন্ট কোনো কল্পনা নয়, অরিয়েন্ট মূর্ত ও প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ তারা একে দেখেছে বর্তমান থেকে বিচ্যুত করে, প্রাচীন কল্পনার লীলালোক, একটা রোমান্স, আবেগ এবং উপভোগের বিষয় হিশেবে; যদিও প্রাচ্য লুণ্ঠন করেই ওদের সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে, প্রাচ্যকে ব্যবহার করেই তারা অনবরত লাভবান হয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ, এবং প্রাচ্যতত্ত্বের বিকাশ প্রতিষ্ঠানিক । এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলা হয়েছে, কোনো কোনো বিভাগ এখনো বিদ্যমান। এই বিদ্যার একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিলো অরিয়েন্ট এবং অকসিডেন্টের মধ্যে ভেদরেখা টানা; প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমের কোনো মিল নেই, এবং থাকা সম্ভব নয়, কিংবা সঙ্গত নয়, এই সরলীকরণ প্রাচ্যতত্ত্বের গৌরবময় প্রান্ত। এই ভেদ, বিচ্ছেদ ও বিভাজনকে পন্ডিতেরা বড়ো করে তোলেন। কেবল গবেষণায় নয়, সৃষ্টিশীল লেখকেরাও এই মনোভঙ্গিকে শিরোধার্য মানেন, ভিন্নতার এই ছকের মধ্যে এস্কিলাস কিংবা ভিক্টর হুগো যেমন আছেন, তেমনি আছেন কার্ল মার্কসও। সাইদ বলেন, যদি আঠারো শতককে প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার সূচনা-বিন্দু ধরি, দেখা যাবে অরিয়েন্টালিজম ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে পশ্চিমের ক্ষমতাবিস্তার ও কর্তৃত্ব-সম্প্রসারণের একটা ধরন, যার মূল অভিপ্রায় প্রভুত্ববাদী; সেজন্যে, পশ্চিম প্রবল এবং প্রধান, প্রাচ্য দুর্বল, নিষ্ক্রিয় ও অধস্তন; এই বক্তব্যকে অরিয়েন্টালিজমের সারসংক্ষেপ বলা যায় [ভূমিকা; অরিয়েন্টালিজম, পৃ.৩]।

'অরিয়েন্টালিজম' একটা প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞতা, একটা ডিসিপ্লিন অথবা ডিসকোর্স; যে-ডিসকোর্সের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা-সম্পর্ক, রাজনীতি, প্রভুত্ব ও প্রাধিকার। সাম্রাজ্যবাদের এই হলো চরিত্র, এবং এর কোনো ব্যতিক্রম নেই; সেজন্যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যে কায়দায় অরিয়েন্ট বিষয়ে ভেবেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আফ্রিকান অরিয়েন্ট বিষয়ে পরাক্রান্ত আমেরিকারও সেই দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু অরিয়েন্ট কি করে কেবল একটা মিথ, পুরাণ, কিংবা কল্পনা হয়; অরিয়েন্ট তো একটা বাস্তব ভৌগলিক সত্য, যার নিজস্ব আখ্যান জনপদ সংস্কার ঐতিহ্য ইতিহাস আছে; আছে নিজস্ব ভাষা ভাবনা জীবনধারা। অরিয়েন্ট তো নিজেই নিজের ঐতিহাসিকতা তৈরি করেছে, কর্তৃত্বপ্রয়োগ ও বলবিস্তারের মাধ্যমে পশ্চিম সেই ঐতিহাসিকতাকে বদলে দিয়েছে—এইমাত্র। অরিয়েন্ট কখনোই কেবল আইডিয়া মাত্র ছিলোনা : পশ্চিমই একে একটা আইডিয়া হিশেবে দেখাতে চায়। সাইদ বলেন, পশ্চিম অরিয়েন্টকে অরিয়েন্ট হিশেবে দেখায় নি, পশ্চিম 'অরিয়েন্ট'কে 'অরিয়েন্টালাইজ' করেছে। সেজন্যে ওয়েস্ট এবং অরিয়েন্টের মধ্যেকার সম্পর্ক হলো ক্ষমতার সম্পর্ক, শাসনের সম্পর্ক, কর্তৃত্ব আধিপত্য প্রভুত্বের সম্পর্ক, অরিয়েন্টালিজম তাই প্রভু-ভৃত্যের পুরাণ মেলে ধরে আমাদের সামনে।

দুই

অরিয়েন্টালিজমের প্রাথমিক সূচনা দান্তের লেখায়, এডওয়ার্ড সাইদ বলেন; দান্তের শিল্প-সিদ্ধি যদিও ক্লাসিক-এ উন্নীত তবু প্রাচ্যবিমুখতার ব্যাধি থেকে তিনিও মুক্ত নন, উপরন্তু তাঁর লেখায় এই ব্যাধির প্রাথমিক সূত্রপাত। সাইদ বলেন, দান্তের ইনফার্নোতে মোমেটো বা মুহাম্মদ চরিত্রটির কথা মনে পড়ে; দান্তে তাঁর ধ্রুপদী নরকযাত্রায় মুহাম্মদকেও টেনে এনেছেন; নরকে মুহাম্মদের সঙ্গে অন্য চরিত্রের দেখা, এবং আলাপ, মুহাম্মদের মুখে পাপ, পতন এবং প্রায়শ্চিত্তের স্বীকারোক্তি।

চরিত্রায়ণের স্বাধীনতা থাকতেই পারে লেখকের, কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। সমস্যাটা অরিয়েন্ট বিষয়ে দান্তের দৃষ্টিদোষে। দৃষ্টিকোণ নয়, দৃষ্টিদোষ। এই দৃষ্টিদোষ থেকে রেনেসাঁসের প্রতিভূ দান্তে মনে করেন; অরিয়েন্ট অর্থাৎ মুসলমানেরা, মহান খ্রিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞ। এই ধারণা দান্তের এবং তাঁর উত্তরসাধকদের; এই ধারণা অবিরলভাবে পোষণ করেছেন অরিয়েন্টালিস্টরা। এই অরিয়েন্টালিস্টরাই ধর্মমুক্তি এবং সেক্যুলারিজমের মুখোশে প্রচার করেছেন খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাস। অরিয়েন্টরা (ইসলামী/মুসলমান) যদি যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, সাইদের প্রশ্ন, তাহলে কোরানে ঈসা নবীর এতো উল্লেখ এবং আখ্যান এলো কোথেকে? সাইদের এই সাধারণ প্রশ্নের জবাব প্রাচ্যতত্ত্বের বড়ো বড়ো পুস্তকে পাওয়া যায় না।

অরিয়েন্টালিস্টরা 'অরিয়েন্ট' বিষয়ে যেসব ধারণা প্রচার করেছেন, পশ্চিমের সৃষ্টিশীল লেখকেরা যুগ যুগ ধরে তার অনুবর্তী। ফরাশি ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ার মিশরের নারীবিষয়ে একটা ধারণা প্রচার করেন যে, তারা নিজের কথা নিজে বলে না অন্যে বলে; নিজের

আবেগ নিজে প্রকাশ করে না, অন্যে প্রকাশ করে: তাদের অস্তিত্বও তাদের নয়, অন্যের ওপর নির্ভরশীল। মিশরে একবার গিয়ে, কিছুদিন থেকে,এক নৃত্যশিল্পীর শরীর ব্যবহার করে, ফ্লবেয়ার এই সমাজ বিষয়ে রায় দিয়ে দেন। মিশরে ফ্লবেয়ার ছিলেন একজন বিদেশি, বহিরাগত, এবং পর্যটক মাত্র; ছিলেন তুলনামূলকভাবে বিত্তবান; সর্বোপরি পুরুষ: এসব কারণে তিনি মিশরীয় নৃত্যশিল্পী কুচুক হানেমকে কব্জা করেন, ব্যবহার করেন, অতঃপর পাঠকের সামনে প্রাচ্যের রমণী বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন।

ফ্লবেয়ারকে পাগল করে ফেলে দুর্দান্ত নৃত্যশিল্পী কুচুক হানেম। এমনিতে তিনি ইতিপূর্বে অরিয়েন্টের নারী এবং বালকদের কথা পড়েন লেইনের লেখায়, পড়েন প্রাচ্যের 'আলেমা'দের কথা। এডওয়ার্ড সাইদ বলেন,আরবীতে 'আলেমা' অর্থ, শিক্ষিতা নারী। আঠারো শতকের রক্ষণশীল মিশরীয় সমাজে যে নারী কবিতা আবৃত্তি করতো, তাকে বলা হতো আলেমা; উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যুগপৎ নৃত্যশিল্পী ও পতিতানারীকে আলেমা বলা হয়। হানেমও এ ধরনের একজন নারী, যার সঙ্গে শোয়ার আগে ফ্লবেয়ার তার নাচ দেখেন। পরবর্তীকালে হানেম সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দেন, তার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের নারীগুলোর খুব তফাত নেই। যৌনতা, বিনয়, সৌন্দর্য ও মৃদুতায় হানেম তাদেরই সগোত্র। হানেমকে তাঁর ভালে লাগে, কেননা তাঁর কাছে হানেমের কোনো দাবি নেই। তাঁকে অবাক করে দেয় হানেমের কোমলতা ও মধুর নারীত্ব, কিন্তু হানেমের অভিজ্ঞতা থেকে ফ্লবেয়ার সমগ্র প্রাচীরমণীদের সরলীকরণ করেন; বলেন: অরিয়েন্ট নারীরা যন্ত্রের মতো যেন: যারা এক পুরুষের শরীর থেকে আরেক পুরুষের শরীরে গড়ায়, সবপুরুষ তাদের কাছে একরকম [পৃ.১৮৭]। হানেমের শরীর-সম্ভোগের মুহূর্তে ফ্লবেয়ারের মনে পড়ছিলো কেবল প্যারিসের পতিতানারী এবং পতিতালয়ের কথা; অরিয়েন্ট বিষয়ে যে অগাধ ও অফুরন্ত যৌনতার কথা তিনি পড়েছিলেন বইপত্রে, হানেমের শরীরও শরীরের আরাম তার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। প্রাক্তন বয়ান এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার এই সাদৃশ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সরলীকরণে, দ্রুত মীমাংসায়; তাই বিশেষ ব্যতিক্রম ও ভিন্ন পেশার এক নারীকে প্রাচ্যনারীর প্রতিভূ বলতে ফ্লবেয়ারের দ্বিধা হয় না। প্রাচ্যের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক নিবিড়, এটা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত, ফ্লবেয়ারও এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। যদিও তিনি এই সম্পর্কের কথা প্রথম বলেন নি, কিন্তু প্রভাবশালী কুশলতার সঙ্গে বলেছেন : শিল্পগত দক্ষতা তাঁর ঘোষণাকে নির্ভরযোগ্য বিশিষ্টতা দেয়। প্রাচ্য এবং যৌনতার সমীকরণ আধুনিক ফরাশি সমালোচক রোঁলা বার্থের রচনায় পুনরাবৃত্ত; অল্প পরে তা আলোচিত হবে।

মিশেল ফুকো যে 'স্ট্রাকচারড্ লার্নিং' এর কথা বলেছিলেন, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের লেখা তার উৎকৃষ্ট নমুনা। ফ্লবেয়ার নিজেই তো গিয়েছিলেন মিশরে, লক্ষ করেছেন ওখানকার জনপদের জীবনধারা; কিন্তু তিনি নিষ্ঠুরভাবে চালিত হন পুঁথিগত বিদ্যা অর্থাৎ টেক্সচুয়াল সংস্কার দ্বারা; ফলে মিশরে গিয়ে তিনি সর্বদা খুঁজেছেন পুঁথির সঙ্গে সাদৃশ্য, পুঁথির নির্দেশমতো খুঁজে খুঁজে তা পেয়েও গেছেন। উনিশ শতকের ফরাশি পর্যটকেরা আরবদের মনে করেছে একটা নিচু জাতি; তাঁদের মতে আরবরা সভ্য ছিলো একসময়, এখন অসভ্য আর বন্য হয়ে গেছে; নেপোলিয়নকে তাঁরা অভিধা দেন ক্রুসেডের

শেষতম মহান বীর। আদিকালের মহৎ তীর্থযাত্রিক, এবং ধর্মের অনন্য পরিত্রাতা। কেউ কেউ বলেছেন, আরবরা চায় ফরাশিই বলতে, পারে না। আরবদের সভ্যতা সংস্কৃতি জীবন বলতে কিছু নেই, যা-ও বা আছে তা খুব নিম্নমানের, বর্বর প্রকৃতির।

এডওয়ার্ড সাইদ পশ্চিমের অরিয়েন্টালিজম প্রকল্পের সূচনা এবং উৎসের প্রাথমিক সংকেতগুলো ইউরোপিয় টেক্সট থেকে আবিষ্কার করেছেন। সাইদের মনোভঙ্গি তীক্ষ্ণ, অন্তর্দৃষ্টি অভিনব, এবং বিশ্লেষণে যে অনুপুঙ্খতা আছে তার নজির বিরল। সাইদের মোটিফ কেবলি না-বাচক, কিংবা কেবলি আক্রমণাত্মক, নয়; যদি তাই হতো আজকের ইউরোপ-আমেরিকার অনেক অনেক বুদ্ধিজীবী সাইদের বই পড়ে অনুতপ্ত, লজ্জিত, বিব্রত হতেন না। ডেসমন্ড স্টেওয়ার্ট তো খোলাখুলি ভাবে বলেছেন, এই আমাদের লজ্জা দিয়ে গেলো; আমরা বুঝেছি, প্রাচ্যের সঙ্গে আমরা কখনোই সম্পর্কিত ছিলাম না; লজ্জা এবং অনুতাপ ছাড়া এ বই পড়া অসম্ভব।

এডওয়ার্ড সাইদ এক 'অরিয়েন্টালিস্ট স্টেজ'-এর কথা বলেন : স্টেজ-এ তিনটি শক্তি একইসঙ্গে সক্রিয়: ক. অরিয়েন্ট খ. অরিয়েন্টালিস্ট; গ. অরিয়েন্টালিজমের পশ্চিমী গ্রাহক বা ভোক্তা। এই মঞ্চ তৈরি হয়েছে দূর অতীতে, সুদূর রেনেসাঁস এনলাইটেনমেন্টের সময়। সাইদ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যেমন ধরা যাক বারথেলমি ডি হারবেল্টের কথা; তিনি লেখেন বিবলিওথেক অরিয়েন্ট (১৬৯৭)নামক বিখ্যাত বই, যা প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এর ভূমিকা লেখেন আন্তোনি গ্যালান্ড, ('এক হাজার রাতে'র প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদক)—সতের শতকে প্রকাশিত এ বইটিকে উনিশ শতকের প্রথম অবধি ইউরোপে ইসলাম (অরিয়েন্ট) বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হতো। সাম্প্রতিক 'কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইসলাম'-গ্রন্থেও একে উচ্চমূল্য দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের মতে, এর মাধ্যমে ইসলামের নতুন একটা ধারণা, এবং সেই ধারণার অভিপ্রেত বিস্তার সম্ভবপর হয়। গ্যালান্ড অসম্ভব প্রশংসা করেন ডি-হারবেলটের; বলেন: ডি হারবেলট অতীব যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেন আরবি ফার্সি এবং তুর্কি ভাষা, রচনা করেন এসব প্রাচ্যভাষার মূল্যবান অভিধান, এর পর তিনি অধ্যয়ন করেন প্রাচ্যের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব , ভূগোল , বিজ্ঞান, শিল্পকলা। অতঃপর দুটো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি: ১. বিবলিওথেক বা 'লাইব্রেরি' রচনা (অর্থাৎ বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত অভিধানকোষ; (২) এনথোলজি (সঞ্চয়ন)। তবে মৃত্যুর আগে কেবল 'বিবলিওথেক' এর প্রথম খন্ড সম্পূর্ণ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। ভূমিকায় গ্যালান্ড লিখেছেন : ডি হারবেলটের লক্ষ্য ছিলো 'ইউরোপীয় পাঠকদেরকে প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে সঠিক ও সুশৃংখল ধারণা দেয়া': 'অরিয়েন্ট কি এবং কিভাবে 'অরিয়েন্ট' পাঠ করতে হবে, বিবলিওথেক তার দৃষ্টান্ত'। গ্যালান্ড বলেন: ডি হারবেলটের বই পড়ে পাঠকের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে, পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন।

কিন্তু মহান বিশেষজ্ঞ বারথেলমি ডি'-হারবেল্ট কি করেছেন? তিনি অরিয়েন্টকে নিছক একটা সিস্টেম, পদ্ধতি এবং শৃংখলা মধ্যে ধরবার এবং বুঝে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বইয়ের উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে লেভানটিনের ইতিহাসগ্রন্থ থেকে, বাইবেলের ইমেজারিও তিনি ব্যাপক ব্যবহার করেন; কিছু কিছু বিবরণ দেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির, উল্লেখ করেন কয়েকটি স্থান বা অঞ্চলের নাম : আর এসবই

সুশৃংখল পদ্ধতিতে, যেমন বর্ণ-অনুক্রমে, বিন্যাস করেন। এই অনুক্রম, পারম্পর্য, পদ্ধতি, শৃংখলা, গ্যালান্ডকে মুগ্ধ করেছে। অর্থাৎ অরিয়েন্ট বা অরিয়েন্টাল গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো উপাত্ত-বিন্যাসের পদ্ধতি এবং শৃংখলা। কেননা সে পদ্ধতি সুশৃংখল, উপরন্তু ইউরোপিয়। ওই পদ্ধতিই একমাত্র; তার জন্যে গৌরব বোধ করেছেন ডি' হারবেল্ট, গ্যালান্ড এবং সমকালীন ও উত্তরকালীন প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা; ওই পদ্ধতির জৌলুশ, আভিজাত্য ও বৈজ্ঞানিকতায় নির্মমভাবে চাপা পড়ে অরিয়েন্টের আত্মরূপ, সত্যরূপ, পূর্ণরূপ।

ডি' হারবেল্ট বা গ্যালান্ড যে পদ্ধতির জন্যে উচ্ছ্বসিত, সেই পদ্ধতি উত্তরকালের প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা অনুকরণ করেন; লেখেন অরিয়েন্ট বিষয়ে রাশি রাশি পুস্তক, কিন্তু সে অরিয়েন্টের কোনো ভূগোল নেই, দেশকাল নেই, আইডেনটিটি বা ইনটেগ্রিটি নেই, অরিয়েন্টকে দেশকালের বন্ধন ও ভৌগলিক সীমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা রচনা করেন তাদের পান্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ, তৈরি করেন প্রাচ্যের ইমাজিনারি জিওগ্রাফি; সব চেয়ে বড় কথা, প্রাচ্যের এই ভূগোল-বিচ্যুতি ও দেশকালহীনতার নেপথ্যে কার্যকর থাকে ইউরোপের বর্ণান্ধতা, খ্রিস্টিয় শুদ্ধতার বাতিক, ধর্মীয় ক্রোধ এবং অ-খ্রিস্টান আদারকে বর্বর বলার আবেগ, পদ্ধতির ঝলকানিতে বিভ্রমসৃষ্টির কৌশল—সর্বোপরি ঔপনিবেশিক জাতিকেন্দ্রিক সম্প্রসারণবাদের জটিল রাজনীতি।

তিন

এডওয়ার্ড সাইদের 'অরিয়েন্টালিজম' প্রাণবন্ত বিতর্কের মুহূর্ত তৈরি করেছে পশ্চিমে। পশ্চিমের ভাবুকরা এখন আধুনিকতার জন্যে প্রচন্ডভাবে লড়ছেন; বিভিন্নভাবে তারা আধুনিকতার প্রকল্পকে অবিচল রাখতে উদগ্র। যেমন গিডেনস, যেমন গেলনার, যেমন হেবারমাস, যেমন এগলেটন : এঁরা সকলে মিলে পুনরায় আধুনিকতার সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক, যুক্তিতাত্ত্বিক সম্ভাবনা /প্রতিশ্রুতি/স্বতঃ সিদ্ধতা ব্যাখ্যা করছেন।বলাবাহুল্য সেই ব্যাখ্যার সারবত্তা যথেষ্ট; যদিও ব্যাখ্যার মনোভঙ্গিতে একটা রক্ষণশীলতা, আতংক, এমনকি অভিসন্ধি আছে। যেমন হেবারমাস; তিনি উত্তরগ্রন্থনবাদকে সন্দেহ করেন, তাঁর ধারণা; গোলার্ধের অনালোকিত অংশ (যাকে দয়া করে তাঁরা নাম দেন তৃতীয় বিশ্ব; 'না-বিশ্ব'ও বলতে পারতেন) কোথায় যেন এই ফরাশি-মার্কিন উত্তরাধুনিকতায় (উত্তরাধুনিকতাকে তিনি কখনো বলেন প্রাগাধুনিকতা, কখনো অনাধুনিকতা, কখনো যুক্তিহীনতা, কখনো রক্ষণশীলতা; দেরিদার বিনির্মাণকে তাঁর মনে হয় বিনাশবাদ) দূর থেকে, পরোক্ষে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে এ্যান্থনি গিডেনস 'দি কনসিকোয়েন্স অফ মডার্নিটি' এবং 'মডার্নিটি এন্ড সেলফ আইডেনটিটি' প্রভৃতি বই লিখে ঘোষণা করেন; আধুনিকতার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ স্বতঃসিদ্ধভাবে ঘটে গেছে, এবং এই বিকাশ অনবরত ঘটতে থাকবে, কাজেই এর কোনো বিকল্প নেই—বিকল্প হতে পারে কেবল, 'অনাধুনিকতা'। গিডেনস দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনকে চমৎকার শারীরিক ব্যায়াম বলেছেন। মার্শাল বারমেনের মনে হয়েছে, আধুনিকতা একটা ইতিবাচক প্রকল্প, এবং আধুনিকায়ন একটা ইতিবাচক প্রক্রিয়া; যেহেতু আধুনিকায়ন পৃথিবীর সর্বত্র সম্প্রসারিত, কাজেই আধুনিকতার আওতায় বিশ্বনিখিল ঢুকে গেছে। বারমেন বলেন, আধুনিকতা তৃতীয় বিশ্বেও রয়েছে, যদিও তা বিশ্লেষণহীন, অ-সূক্ষ্ম, আনক্রিটিকাল।

পশ্চিমের ভাবুকেরা উত্তরাধুনিকতা নিয়েও আতঙ্কিত : তাঁদের বিশ্বাস-এর উপদ্রবে আধুনিকতার প্রাক্তন আভিজাত্য ও জৌলুশ মূল্য হারাবে। সন্দেহ নেই এরা অত্যন্ত যুক্তিশীল ফ্রেমে আধুনিকতার স্বতঃসিদ্ধতা ব্যাখ্যা করেছেন;কিন্তু এর ভেতর কি লুকিয়ে নেই বৃহৎ কোনো রক্ষণশীলতা, সংস্কার, এমনকি আধুনিকতম কোনো অভিসন্ধি?

এডওয়ার্ড সাইদ অরিয়েন্টালিজম প্রকল্পের যে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, তা ইতিমধ্যে অনেক জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সাইদের বক্তব্য স্বভাবতই প্রাকঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষেই গেছে, ফলে ইউরো-আমেরিকার অনেকেই এখন তাঁর বক্তব্য খন্ডন করার চেষ্টা করছেন। লক্ষণীয়, যাঁরা "অরিয়েন্টালিজম" বইটি পড়েছেন, তাঁরা জানেন সাইদ তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্যে পশ্চিমের উপন্যাসমালাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কথা মোটের ওপর এই যে (যে-বক্তব্য তাঁর পরবর্তী 'কালচার এন্ড ইমপেরিয়ালিজম' (১৯৯৩) বইতে আরো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত) পশ্চিমের উপন্যাস এবং উপন্যাসের আখ্যান জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে পশ্চিমের কর্তৃত্ববাদী বর্ণসংস্কারস্পৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বতন্ত্রী রাজনৈতিক অভিলাষকে সমর্থন করেছে। যেমন ডিসরায়লি, ওয়াল্টার স্কট, কিপলিং কিংবা জোশেফ কনরাডের উপন্যাস। সাইদ বলতে চান, জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে, ইশারায়, সম্প্রসারণবাদ ছড়িয়ে গেছে এসব উপন্যাসে।

উপন্যাস ও আখ্যানকে ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের দলিল হিশেবে পাঠ করা এবং ব্যাখ্যা করা পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা বলতে চান, উপন্যাস বহুমাত্রিক কল্পনাশীল এবং বিশিষ্ট একটা ফর্ম, উপন্যাসকে অতোখানি রাজনৈতিক ভাবা ঠিক হয় না। তাঁরা জর্জ এলিয়ট, ডিসরায়লি এবং ডিকেন্সের উদাহরণ টানেন; বলেন, এদের উপন্যাসগুলোতে বাস্তবতার উপাদান অল্প, এগুলোর ভেতর রাজনীতি এবং ঐতিহাসিকতার ইঙ্গিত খোঁজা বাড়াবাড়ি। সাইদের 'অরিয়েন্টালিজম'(১৯৭৮) ছাড়াও আরো কয়েকটি বই এঁদের বিক্ষুব্ধ করে, যেমন হোমি ভাভা সম্পাদিত 'নেশন এন্ড ন্যারেশন' (১৯৯০), এবং জোনাথান আর্ক ও হ্যারিয়েট রিটভো সম্পাদিত 'ম্যাকরোপলিটিক্স অফ নাইনটিনথ সেঞ্চুরি লিটারেচর' (১৯৯১)। গত পাঁচ দশকে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমনসব ঘটনা অদলবদল এবং রূপান্তর ঘটেছে যে, শাদা-পশ্চিমের সার্বভৌমিকতা আর আগের মতো অবিচলিত নেই; এই পটভূমিতে উভয়গ্রন্থের লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে উপন্যাস একটা জাতির আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন সৌন্দর্যের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে, কেনই বা জাতীয়তাবাদ নামক রাজনীতি উপন্যাসের নির্ণেয় চরিত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে জাতি, উপন্যাসের মূল প্রেরণা জাতীয়তাবাদ; উপন্যাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষা উন্মিলিত হয়, এবং উপন্যাস জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ফর্ম। একদিকে উপন্যাস এবং অন্যদিকে জাতি : এই হলো মতাদর্শের দুই রাস্তা, সেজন্যে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশ এবং উপন্যাসের উৎক্ষেপ অনেকটা সমান্তরাল ঘটনা। উপন্যাস বিষয়ক এই প্রতিজ্ঞার ফ্রেমে তাঁরা বিন্যাস করে দেখান ডিসরায়লির ট্রিলজি [বিশেষত তাঁর দুটি উপন্যাস (চরিত্রের নামে নাম) ক. কনিংসবি, খ. ট্যানক্রেড] এবং জর্জ এলিয়টের ডানিয়েল ডেরোন্ডা। কিন্তু যাঁরা বলেন, এসব উপন্যাস জাতীয়তাবাদী নয়, এবং রাজনৈতিক নয়, তাঁরা অদ্ভুত কথা বলেন। তাঁরা চৌকস

সরলতায় ঘোষণা করেন, ডিসরায়লি-এলিয়টের এগুলো কোনো উপন্যাসই নয়; এগুলো মূলত রোমান্স, বলা যায় ইউটোপিয়ান রোমান্স, আর বলাবাহুল্য, রোমান্সের মতাদর্শ, বা জাতীয়তাবাদ-বিচার অনর্থক। এসব কথা যে কতো সরল কিন্তু উদ্দেশ্যদুষ্ট, এমন কি মিথ্যা, তা এঁদের উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের জানবার কথা। সবার কথা বাদ দিয়ে কেবল ডিসরায়লির কথাও যদি ধরি, দেখবো: তাঁর উপন্যাসের হরফে হরফে রাজনীতি, ডিসরায়লির চরিত্ররা অবিরাম রাজনীতির কথা বলে,তাদের আলাপের বিষয় ব্যতিক্রমহীনভাবে রাজনীতি। ডিসরায়লির ট্রিলজির সংলাপ আশিভাগ রাজনৈতিক, এটা প্রায় হিশেব করে দেখানো যায়। ডিসরায়লি ক্যারিজম্যাটিক লিডারশিপের (যাদুকরী নেতৃত্ব) কথা বলেন, বলেন মহান নেতার অভ্যুদয়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে জানান : রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত আস্থা এবং বিশ্বাস। আস্থা থাকলে এবং আস্থা তৈরি করতে পারলে রাজনীতি চরিতার্থ হয়; তখন উপনিবেশের পর উপনিবেশ তৈরি করা যায়: আস্থা বিক্রি করে উপনিবেশ বানানো ডিসরায়লি খারাপ মনে করেন না। ডিসরায়লি আমৃত্যু রাজনীতিলিপ্ত ছিলেন, ছিলেন যাদুকরী বক্তা, গ্রেট পার্লামেন্টারিয়ান। আঁদ্রে মালরো ডিসরায়লির যে জীবনী লিখেছেন, তা পড়ে কিংবা না পড়েও তাঁর সম্পর্কে এসব অনেকেরই জানা। অতএব কিংবদন্তীতুল্য ডিসরায়লি যখন উপন্যাস লেখেন, তাতে রাজনীতির দৃঢ় ছাপ থাকাই স্বাভাবিক। ডিসরায়লির উপন্যাসের এক নায়িকা বলে : 'সবটাই জাতি, জাতির বাইরে কোনো সত্য নেই, থাকে না'।[টানক্রেড; পৃ.১৫৩]।

জর্জ এলিয়টের ইহুদী জাতীয়তাবাদ বহুবিদিত, ইহুদী জাতীয়তাবাদের আবেগ এবং কাতরতা তাঁর একাধিক উপন্যাসে, বিশেষত ডানিয়েল ডেরোন্ডায়, প্রবল। এসব যদি ইউটোপিয়া বা রোমান্স বলে উড়িয়ে দিই, কথাশিল্পী হিশেবে এদের আকর্ষণ বা তীব্রতাই অনেক কমে যায়। বিরোধিরা বড়ো আশ্চর্য কথা বলেন: যেটাকে এডওয়ার্ড সাইদ 'সাম্রাজ্যবাদ' বলছেন, সেটা 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' নয় কেন? যাকে তিনি 'কলোনিয়াল' বলেছেন তাকে 'গ্লোবাল' বললে দোষ কি?

চার

এডওয়ার্ড সাইদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, অরিয়েন্টালিস্টরা কিভাবে প্রাচ্যের আলোচনায় যৌনতা এবং অবাধ শারীরিকতাকে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কে জড়িত করেছেন। সাইদ বলেন; ইউরোপিয়রা প্রাচ্যে দেখে সহজপ্রাপ্য যৌনতার সমারোহ; প্রাচ্যে সহজেই বাগানো যায় নারী এবং বালকের শরীর; এই আকর্ষণে ইউরোপের অনেক পর্যটক ছুটে গেছেন প্রাচ্যে, যেমন ফ্লবেয়র যেমন রোঁলা বার্থ। রোঁলা বার্থের কথা শুনে কেউ কেউ চমকে উঠবেন, কিন্তু চমকাবার কিছু নেই। রোঁলা বার্থ কৃতবিদ্য মনীষী, এবং বিংশ শতাব্দীর সেরা সমালোচকদের একজন। রোঁলা বার্থ টেক্সচুয়াল ক্রিটিসিজমের মহান ফরাশি তাত্ত্বিক; এডওয়ার্ড সাইদ যে অরিয়েন্টালিস্ট প্রজেক্টের কথা বলেন, তার সঙ্গে রোঁলা বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাইদ অরিয়েন্টালিস্টদের যে সরলীকরণ, উন্নাসিকতা, বর্ণসংস্কার, আধিপত্যবাদ এবং জাতীয়তা ব্যাধির কথা বলেন, রোঁলা বার্থও সেই ব্যাধি এবং দৃষ্টিদোষ থেকে মুক্ত নন।

রোঁলা বার্থের চিন্তার বড়ো অংশ উত্তরগ্রন্থনবাদী টেকস্ট-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অরিয়েন্টালিজমের টেকস্ট অরেয়েন্ট বিষয়ে যে ধারণা দেয়, তাই তিনি হরফে হরফে মিলতে দেখেছেন প্রাচ্যে, জাপানে, মরক্কোয়; কেননা বার্থ তাই দেখেছেন, যা তিনি দেখতে চেয়েছেন। এখানে বলে নেওয়া ভালো 'অরিয়েন্টালিস্ট' একসময় সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হতো, যে বিশ্বব্রহ্মান্ডে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, প্রাচ্যের বিভিন্নদেশ ভ্রমণ করেছে। ফ্লবেয়ারের অভিধানে অরিয়েন্ট বিষয়ে এই ধারণাটি পাওয়া যায়। বার্থও ভ্রমণ করেছেন যথেষ্ঠ, সে-অর্থে তিনিও অরিয়েন্টালিস্ট, বার্থ জাপানে গেছেন জাপানকে তাঁর মনে হয়েছে অগাধ যৌনতার সুখে ভরপুর চিহ্নের সাম্রাজ্য। জাপান থেকে ফিরে তিনি বই লেখেন 'এম্পায়ার অফ সাইনস'। ১৯৪৯ -৫০ সালে তিনি সমকামের সুখ যাপন করেন রুমানিয়ায় ; তারপর যান মরক্কোতে, ১৯৬৮ সালে; মরক্কোতেও সমকামের ছড়াছড়ি দেখে খুশি হন। জাপানে তিনি পান সুখী ও স্বচ্ছন্দ যৌনতা। সাইদ লিখেছিলেন, প্রাচ্যের যৌনতার বিবরণে পশ্চিমের লেখকেরা অরিয়েন্টকে সেক্সচুয়ালাইজ করেছেন । সাইদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল জাপান মরক্কো বিষয়ে বার্থের লেখাজোখা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। মরক্কোর ওয়াদি (গ্রাম) সুক (বাজার) তানজিয়ার্সের দোকানপাট অথবা জাপানের রান্নাবান্না এমনকি জাপানীদের প্যাচিনকো নামক খেলা—সবই যৌনায়িত হয়েছে। সাইদ অরিয়েন্টালিজমের তিনটি পরস্পরপ্রবিষ্ট প্রান্ত নির্দেশ করেন (ক) উপনিবেশবাদ, (খ) প্রাচ্য-প্রতীচ্য বৈপরীত্য; (গ) যৌনতা। রোঁলা বার্থ যখন প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছেন ভুলতে পারেন নি, যে তিনি অগ্রসর আধুনিক সভ্যদেশের মানুষ, ডিঙাতে পারেন নি প্রাচ্য প্রতীচ্যের তফাত: সরল যৌনতার ফ্রেমে প্রাচ্যকে বেঁধে ফেলতে তাঁর বাধেনি। প্রাচ্য বিষয়ে বার্থের লেখা পড়লে সেই জটিল প্রশ্ন ফিরে আসে আবার, একটা মুক্তসমাজ থেকে একটা অবরুদ্ধ সমাজ কতটুকু বোঝা যায়? জাতিগত সংস্কার আধুনিকতা দিয়ে মেকআপ করা সম্ভব কিনা? জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক কিরকম ঘনিষ্ঠ কতোটা অবিচ্ছেদ্য!

রোঁলা বার্থ ছিলেন সমকামী, প্রাচ্যে তিনি সুযোগ পেলেই দৌড়াতেন সমকামের তৃষ্ণায়। বলে নেওয়া দরকার সমকাম সাধারণত এক্সপ্লয়টেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত: জোনাথন ডলিমোর নামক এক সমকামতাত্ত্বিক তাঁর 'সেক্সচুয়াল ডিসিডেন্স' বইতে লিখেছেন, সমকামে তারাই সাধারণত অভ্যস্ত যারা নিজ দেশে যৌন তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, এবং বাইরে গিয়ে সেটা মিটিয়ে নেয়। তবে বিদেশে যৌনসুখ মেটানোর সময় সমকামীর মনে কাজ করে এক্সপ্লয়টেশনের বোধ: ভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ও শরীরকে একপ্লয়েট করার মানসিকতা। ডলিমোর সমকামকে 'এসেনসিয়েলি এক্সপ্লয়টেটিভ' বলেছেন ।

রোঁলা বার্থের ভেতরও কি কাজ করেছে সেই বাসনা এবং মনোভঙ্গি? প্রাচ্যের মানুষের শরীর যা-খুশি ব্যবহার করতে পেরে তাঁর রক্তেও কি অক্সিডেন্ট গরিমা লাফিয়ে উঠেছিলো? রোঁলা বার্থের শেষতম বইয়ের নাম 'ক্যামেরা লুসিডা'। এই বইতে এক

ফরাশি জেনারেলের ছবি আছে। এই জেনারেল আফ্রিকার কিছু অংশ দখল করে ফরাশি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ছবিটিতে দেখা যায় একজন কৃষ্ণকায় তরুণ নাবিক ওই জেনারেলের পুরুষাঙ্গ ধরে আছে। পশ্চিমের এক পন্ডিত এই ছবিটিকে অরিয়েন্টালিজমের একটা লাগসই দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; আর আমার ধারণা, শেষতম গ্রন্থের এই ছবিটিতে বার্থের নিজের প্রতিকৃতিও আঁকা আছে। মনে রাখতে বলি, রোঁলা বার্থের নিজের দাদাজানও ফরাশি ঔপনিবেশিক সরকারের জাঁদরেল প্রশাসক ছিলেন।

১৯৬৮ সালে রোঁলা বার্থ মরক্কোর রাবাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যান। চুক্তি ছিলো রাবাতে তিন বছর তিনি ফরাশি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করবেন। কিন্তু, রোঁলা বার্থ একবছরই ওখানে ছিলেন, তার বেশি থাকা সম্ভব হয় নি। সামাজিক চোখ, কালো আদমীর বিক্ষোভ ও বিরূপতায় পড়ে বার্থের অরিয়েন্ট-বিষয়ক স্বপ্ন, অগাধ যৌনতৃপ্তির আরাম, খানিকটা ভেস্তে যায়।

আগেই বলেছি, জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে রোঁলা বার্থ লেখেন 'এম্পায়ার অফ সাইনস', আর মরক্কো বিষয়ে তাঁর বইটির নাম 'ইনসিডেন্টস'। মরক্কো ছিল ফরাশি উপনিবেশ; মরক্কোতে তিনি যখন ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য পড়াতে যান, ততোদিনে উপনিবেশ উঠে গেছে। ছাত্রেরা ঘৃণা করতে শুরু করেছে ঔপনিবেশিক প্রভুর সাহিত্য। ফরাশি উপনিবেশ এবং ফরাশি সাহিত্যকে অভিন্ন মনে হয়েছে তাদের। ছাত্রেরা বিক্ষোভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে; ঔপনিবেশিক সাহিত্য পড়বেনা জানায়, ক্লাশে বার্থকে অপমান করে; চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হন রোঁলা বার্থ। মরক্কোর উপনিবেশ-বিরোধিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভ এবং উদ্ভূত অসদ্ভাবকে তিনি ব্যাখ্যা করেন একটা জটিল তত্ত্বে। তাঁর মতে : মরক্কোর সমাজ যেহেতু বিভক্ত, সেজন্যে তার ভাষার ভেতর একটা যুদ্ধ চলছে। অন্যদিকে যৌন-সম্পর্কের নিয়ন্ত্রন বা অবরুদ্ধতায় তিনি পীড়িত, ছাত্র-বিক্ষোভের তত্ত্বকে তিনি যৌননিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মেলাতে পারেন না। রোঁলা বার্থ বুঝতে পারেন না, যদি অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক উন্নত, অর্থাৎ মুক্ত না হয়, কেবল যৌনসম্পর্ক হঠাৎ করে মুক্ত হবে কেন? বার্থ বুঝতে পারেন না, ফরাশি সাহিত্য উন্নত হওয়া সত্ত্বেও রাবাতের ছেলেরা কেন তা পড়তে চায় না? ছাত্রদের বিক্ষোভকে তাঁর মনে হয় একেবারেই অসংগত একটা ঘটনা। অজ্ঞতার ফল বলে ধরে নেন একে; কিন্তু এর ভেতর যে সার্বিক স্বাধীনতার মহৎ আকুতিও লুকিয়ে থাকতে পারে, অরিয়েন্টালিস্ট বার্থ তা ভুলে যান।

রোঁলা বার্থ জাপান বিষয়ে বইটি লেখেন মরক্কোতে বসে। জাপানে তিনি পান মুক্ত যৌনতা, সুখী প্রেমকামের সুবিধে; বার্থের ব্যক্তিগত যৌন অভিজ্ঞতা অন্তত তাই মরক্কোতে কেন তা নেই, অন্তত ওভাবে নেই, বার্থ বেদনাবোধ করেন। কিন্তু জাপান বিষয়ে লিখতে গিয়ে বার্থ ফ্যান্টাসি তৈরি করেছেন; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিক বাস্তবতা হিশেবে দেখাতে চেয়েছেন। অথচ জাপান বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, ওরকম 'হ্যাপি সেক্সচুয়ালিটি' ও-সময় জাপানে একেবারেই ছিলো না। সত্যভাষণের চেয়ে ফ্যান্টাসি, বাস্তবতার বদলে রোমান্স, ভিশনের স্থলে ইল্যুশন, গভীরতার জায়গায় বাহ্য-

পরিস্থিতি : অরিয়েন্টালিস্টদের প্রাচীন স্বভাব। 'ইনসিডেন্টস'-এ বার্থ বলতে চান, ফরাশি সাহিত্য মরক্কোর ছাত্ররা পড়তে চায় না, 'বুর্জোয়া-সাহিত্য' ব'লে। আসলে কি তাই? এই যুক্তিতেই কি ছাত্রেরা ফরাশি সাহিত্যের বিরোধিতা করেছে? কলোনির বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষোভকে বার্থ এইভাবে বিকৃত করেন। কারণ, কলোনির প্রভুদের একজন হয়ে 'ব্ল্যাক অরিয়েন্টে'র ন্যায্য ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং প্রত্যাখ্যান বোঝা অসম্ভব, বিংশ শতাব্দীর সেরা সমালোচক রোঁলা বার্থও তা বোঝেন নি।

রোঁলা বার্থ তাঁর নিজস্ব সামাজিক/সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে মরক্কো (অরিয়েন্ট)-কে বিচার করেছেন, তাঁর চোখে পড়েছে কেবল ভিন্নতা, বৈপরীত্য, ব্যবধান। 'ইনসিডেন্টস'-এ তিনি ফরিদ নামক এক যুবকের কথা বলেন, যে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর কাছে সিগারেট চায়; তারপর চায় টাকা, এবং ইঙ্গিত করে সমকামের; বার্থের সঙ্গে দেখা হয় স্কুলশিক্ষকের, সে-ও তাঁকে সমকামের আমন্ত্রণ জানায়; বার্থ পরিচিত হন মুস্তফার সঙ্গে, যার চোখ মায়াবী, যার চেহারা রোমানদের মতো অপরূপ; তাঁর ভালো লাগে কৃষকদের, কারণ তারা প্রতিবাদ করে না, ছাত্রদের মতো তারা বদমাশ নয়। মরক্কোতে তিনি দুটি জিনিশ খুঁজে পান : সমকাম ও অভাব, বার্থ এই 'অভাব'কেও যৌনায়িত করেছেন, অভাবকে ধরে নিয়েছেন সমকামের একটা ভূমিকা; সমকাম বদলে দিচ্ছে অভাবকে, এবং অভাব পরিপূরক হয়ে উঠছে সমকামের; কেননা সেই প্রক্রিয়ায় বার্থ মরক্কোর অভাবী মানুষদের শরীর ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার কি ঔপনিবেশিক? এর ভেতর কি আছে প্রভুত্বের কোনো বাসনা? 'অরিয়েন্টালিজম' কি তবে যৌনবাসনা, শরীরসম্ভোগ, আর ব্যাপক এক্সপ্লয়েটেশনের একটা প্রকল্প? এই প্রকল্প কি মানবিক? এই প্রকল্প এবং প্রক্রিয়াকে কি আমরা আধুনিক বলতে পারি?

অরিয়েন্টালিজম ও ভারতবর্ষ

এক

"অরিয়েন্টালিজম" (১৯৭৮) বইতে এডওয়ার্ড সাইদ জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। সাইদ দেখিয়েছেন পশ্চিমের জ্ঞান কিভাবে পশ্চিমের ক্ষমতা তৈরি করে, সেই ক্ষমতা কিভাবে উপনিবেশ বানায়, সেই উপনিবেশ কিভাবে একটা বৈধ সম্প্রসারণবাদে বদলে যায়। প্রাচ্যকে 'উপনিবেশ' বানাতে হলে প্রাচ্যকে জানতে হবে; কিন্তু জানতে হবে একেবারেই নিজের মতো; তারপর নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সেই প্রাচ্যকে উপস্থিত করতে হবে : প্রাচ্যকে প্রাচ্যের মতো জানলে চলবে না, প্রাচ্যকে পাঠ করতে হবে পশ্চিমের চোখে। প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা এইভাবে 'প্রাচ্য'কে জেনেছেন, সেই জানার বিবরণই দু-শতাব্দী ধরে 'অরিয়েন্টালিজম' নামে পরিচিত।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 'অরিয়েন্টালিজম' একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকল্প মাত্র। কিন্তু সাইদ দেখান, 'অরিয়েন্টালিজমে'র বিদ্যাচর্চার অন্তরালে বিচিত্র ও নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় ইউরোপিয় রাষ্ট্রশক্তির প্ররোচনা ও সহিংস সাম্রাজ্যবাদ অসামান্য চাতুর্যে বিস্ফারিত। অরিয়েন্টালিস্ট বিশেষজ্ঞেরা সবসময় সচেতনভাবে সম্প্রসারণবাদের পক্ষে কাজ করেন নি; কিন্তু জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁদের প্রাচ্যচর্চা, পাণ্ডিত্য, ও জ্ঞান উপনিবেশ-নির্মাণের পথ সুগম করেছে।

প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা প্রাচ্য বিষয়ে আরেকটা অদ্ভুত সমস্যায় আক্রান্ত, তার নাম 'রোমান্টিকতা'। 'প্রাচ্য'কে তারা বাস্তব ভাবতে চাননি, প্রাচ্যকে তারা 'রোমান্টিকতা'র আবরণে আড়াল করেছেন, সরলীকরণ করেছেন, মিস্টিফাই করেছেন। বাস্তব প্রাচ্যের বদলে তার রোমান্টিক প্রতিভাস অরিয়েন্টালিস্টদের লুব্ধ করেছে। ফলে সমকালীন প্রাচ্য নয়, তার সুদূর অতীতই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। সেজন্যে ফ্রেডরিক শ্লেগেল সংস্কৃত ও ফার্সির প্রতি প্রচন্ড দুর্বল : প্রাচীন ভারতবর্ষ ও সুদূর পারস্যসভ্যতা তাঁকে অভিভূত করেছে। শকুন্তলা, যেন্দাবেস্তা ও উপনিষদ দ্বারা শ্লেগেল আচ্ছন্ন; বিভিন্নভাবে সেই আচ্ছন্নতা, শিহরণ ও এডিকশনের বিবরণ তিনি দেন; কিন্তু এই 'রোমান্টিক ভারতবর্ষে', ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন, আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। গোবেনিউ, রেনান, হামবলড্‌ট, স্ত্যাঁদাল, বরনো'ফ, পালমার, ওয়েইল—এঁরা সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর সেরা অরিয়েন্টালিস্ট, এঁরা সকলেই 'প্রাচ্য'কে রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন, এবং কেউই প্রাচ্যে পশ্চিমের হস্তক্ষেপ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বিচলিত হন নি। উত্তর-ঔপনিবেশিক মুহূর্তে তাই প্রয়োজন পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ত্বের পুনর্বিচার, এডওয়ার্ড সাইদের 'অরিয়েন্টালিজম' এক্ষেত্রে একটা মাইলফলকের মতো, সন্দেহ নেই।

ইউরোপে একটা সময় এমনও গেছে, যখন পর্যটকমাত্রই অরিয়েন্টালিস্ট বলে বিবেচিত হতেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে ঘোরাঘুরি করেছেন, তিনিই প্রাচ্যতাত্ত্বিক।

এরপর সাম্রাজ্যবিস্তার ও ঔপনিবেশিকায়নের প্রয়োজনে ইউরোপে বেতনভূক অরিয়েন্টালিস্ট দেখা দেয়। প্রাচ্যচর্চা ক্রমশ বিধিবদ্ধ, সরকারি অনুদানভূক্ত, প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে। এজন্যে একদিকে নৃতত্ত্ব যেমন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পর্কিত হলো, অন্যদিকে অরিয়েন্টালিজমও ইম্পেরিয়ালিজমের একটা প্রজেক্টে পরিণত হলো। প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে; যেমন : 'সোসাইটি এশিয়াটিক' (১৮২৩), 'আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি' (১৮৪২) : এইসব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু তার অনেক পূর্বে, আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জন্ম নেয় 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' (১৭৮৪)। স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা; এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিলো 'ইন্ডোলজিকাল স্টাডিজ' বা ভারতচর্চা। এশিয়াটিক সোসাইটির সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা ভারতের অতীত উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্য, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা ও মনুমেন্টের মাধ্যমে তারা অতীত ভারতকে আলোকিত করেন, এবং সন্দেহ নেই তাঁদের মাধ্যমেই কালিদাসের 'শকুন্তলা' এবং 'ঋগ্বেদ' পুনরাবিষ্কৃত হয়।

ভারতের জ্ঞান ও মনোলোকে ইউরোপিয় হস্তক্ষেপের পরিণতিকে 'রেনেসাঁস' বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে পরে যাবো; তার আগে এশিয়াটিক সোসাইটির ভারততত্ত্ব এবং সেই বিদ্যার প্রাসঙ্গিক পরিবেশ আলোচনা করা দরকার।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিমুখতার বদনাম দীর্ঘদিনের। তবে ভারতীয়রা যেমন নিজেদের ইতিহাস জানতোনা, তেমনি ইউরোপিয়রাও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমান অজ্ঞ ছিলো। ১৪৯৪ সালে, রোমে, ভারত সম্পর্কে জিওলিয়ানো দাতির একটা প্যাম্পলেট প্রকাশিত হলে ইউরোপের টনক নড়ে; এবং দেখা গেলো এর ৪ বছর পরই ১৫৯৮ সালে পর্তুগিজ ভাস্কো দা গামা ভারতের মাটিতে পা রাখছেন। ভাস্কো দা গামার ভারতে পদার্পণ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে বদলে দেয়। এতোকাল ধরে ইউরোপের ধারণা ছিলো ভারতবর্ষ একটা অদ্ভুত জায়গা; ভাস্কো দা গামা এসে দেখেন ভারত কোনো অলীক ভূখণ্ড নয়—এখানে বাস্তব মানুষের বসবাস, এর সম্পদ অফুরন্ত, এর নিসর্গ ও প্রতিবেশ বৈচিত্র্যময়, এবং এর ভেতরে অবাস্তব কিছু নেই।

অতঃপর শুরু হলো ভারত-আবিষ্কারের কৌতূহল, এবং ভারত-দখলের বাসনা, এবং ভারত বিষয়ে লেখালেখির প্রাচুর্য। যাঁরা ভারত নিয়ে লিখলেন তাঁদের মধ্যে পর্তুগিজ আছেন, ফরাশি, ডাচ, ডেনেশিয় এবং ইংরেজরা আছেন। ভারত বিষয়ে প্রথম যে পর্তুগিজ বই লেখেন তার নাম টম পিয়ার্স; কিন্তু পিয়ার্সের 'সুমা অরিয়েন্তেল' (১৫১৫) বহুকাল প্রকাশ করা হয়নি পাণ্ডুলিপিতে অনেক জরুরি, কিছুবা গোপনীয়, তথ্য ছিলো ব'লে। তারপর লেখা হয় দুরাট বারবোসার বই (১৫১৮); তারপর চার-ভল্যুমে ভারত বিষয়ে বিরাট বই লেখেন গাসপার কোরিয়া, যার নাম 'দি ল্যান্ডস অফ ইন্ডিয়া' (১৫৫০)। পর্তুগিজদের মধ্যে ভারতসম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকের নাম ফার্নাও লোপেস (১৫০০-৫৯) : আপিশী তথ্য, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লেখেন "হিস্ট্রি অফ দি ডিসকভারি এণ্ড কনকোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া বাই দি পর্তুগিজ"। এ বই এতো জনপ্রিয় ছিলো যে এটা ফরাশি (১৫৫৩) স্পেনিয়

(১৫৫৪) ইতালিয় (১৫৫৬) এবং ইংরেজিতে (১৫৮২) অনূদিত হয়। তাছাড়া পর্তুগালের সরকার-বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত বেতনভুক্ত ঐতিহাসিকেরাও ভারত বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। এইসব লেখালেখির ফলে ভারত সম্পর্কে ইউরোপের কৌতূহল বেড়ে যায়। অনেক ডাচ লেখকও ভারত বিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু পর্তুগিজদের তুলনায় তা গৌণ। ফরাশি লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবিষয়ে অন্য লেখকদের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বইপত্র লেখেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে (১৭৪৪) দু-জন ফরাশি লেখক ফরাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে আগমন এবং তাদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ভূমিকা বিষয়ে দুটো বই লেখেন। ডেনেশিয়রাও ভারতে এসেছিলো, কিন্তু দীর্ঘদিন থাকেনি; কেউ কেউ বইপত্র লেখার চেষ্টা করে হতাশ হন, কারণ প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব। এদের মধ্যে আউগুস্ত হেনিংসের কথা উল্লেখযোগ্য, যিনি ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন : 'এই অঞ্চল বিষয়ে লেখার জন্যে যেসব তথ্য দরকার তার কিছুই হাতে নেই, এবং তা পাওয়া বেশ মুশকিল; আদৌ মিলবে কিনা সন্দেহ'।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা এসেছে সবার পরে, পরিকল্পিতভাবে, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যে; যে-কারণে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের লিপ্ততা ছিলো অনেক গভীর, নিগূঢ়। ভারতের রঙ্গমঞ্চে সকল ইউরোপিয় শক্তি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু জয় হয়েছে ব্রিটিশদের; কারণ ব্রিটিশরা জ্ঞানগত, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে যেরকম জড়িত হয়েছিলো অন্য ইউরোপিয় শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ লেখক, ঐতিহাসিক, বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতদের সমবায়ী এবং বিচিত্র উদ্যমে ভারতবর্ষ বিষয়ে অসংখ্য বই-পুস্তক, দলিলপত্র, জরিপ তৈরি হয়। প্রথমপর্যায়ে যারা বইপত্র লিখেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিলো ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরিবেশ, কোম্পানির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং এতদঞ্চলে বাণিজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন রচনা। যেমন রবার্ট ওরমের বই (১৭৭৮) কিংবা রিচার্ড জোসেফ সুলিভানের রচনা (১৭৭৯)। অনেক ইংরেজ পর্যটকও ভারত ভ্রমণ করে বিভিন্ন বৃত্তান্ত ইংরেজ পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেন। তবে প্রথম পর্যায়ের এসব লেখক, পর্যটক, বিবরণকারগণ ভারতের অতীত, ঐতিহ্য, কিংবা ইতিহাস বিষয়ে কৌতূহলী ছিলেন না, ভারতে বাণিজ্যিক সুবিধা এবং তার সমকালীন রাজনীতিই ছিলো তাদের বিষয়বস্তু; আর পর্যটকদের লেখায় ছিলো কেবল 'একটা নতুন, অদ্ভুত, দেশ আবিষ্কারের' বিস্ময়ঘেরা কাহিনী। তবে 'ইংল্যান্ডে'র তুলনায় 'ইন্ডিয়া' কতো অনুন্নত, কতো আদিম আর অমার্জিত, সে কথা গুছিয়ে লিখতে ভ্রমণবৃত্তান্তকারদের ভুল হয়নি।

ভারতের ধর্ম, দর্শন ও প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে মিশনারীরা সর্বাধিক মনোযোগী ছিলেন, যেমন রোমের উদ্দেশে লেখা খ্রিষ্টান মিশনারীদের চিঠিপত্র। অনেক মিশনারী আবার স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন ভারতে, এবং এখনকার ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। অব্রাহাম রজার সম্ভবত প্রথম মিশনারী ব্যক্তি, যিনি লেখেন 'দি ওপেন ডুর টু হিডেন হিথেনডম' (প্রথম প্রকাশ: লেইডেন, ১৬৫১); রজার এক ভারতীয় ব্রাহ্মণের সহযোগিতায় সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরির দু'শো চরণ অনুবাদ করেন। রজার অবশ্য সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা জানতেন না; তবু সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ধারণা যে ছিলো, সেটা তার বই থেকে বোঝা যায়।

ইংল্যান্ড থেকে প্রথম যে ইংরেজ ভারতে আসেন তার নাম ফাদার টমাস স্টিফেন্স; সেটা ১৫৭৯ সালের ঘটনা। স্টিফেন্স একটা ভারতীয় ভাষা শেখেন, গোয়া-অঞ্চলে তিরিশ বছর বাস করেন, এবং পর্তুগিজ ভাষায় ভারতের একটা ভাষা বিষয়ে ব্যাকরণ- পুস্তক রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষা প্রথম যিনি অসাধারণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তার নাম রোবের্তো দি নবিলি (১৫৭৭-১৬৫৮)। বলা হতো তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চেয়ে বেশি জানতেন সংস্কৃত ভাষা। তাঁর অনেক রচনা হারিয়ে গেছে পরে, তবে বেদ বিষয়ে তিনি যে বইটি লিখেছিলেন, ফরাশি-ইউরোপিয় মিশনারিরা তা ভালোভাবে জানতেন; সেকারণে ক্রমে ক্রমে মিশনারিদের পক্ষে ভারতীয় ভাষার অভিজ্ঞতা সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠলো। জর্মনমিশনারিরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বুৎপত্তি অর্জন করেন; এরকম একজন মিশনারির নাম জাঁ-ফ্রাঁসোয়া পনস। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অসংখ্য নাটকের কথা তিনিই প্রথম বলেন একটি লেখায়, তা থেকে স্যার উইলিয়াম জোনস অনুপ্রাণিত হন, এবং কালিদাসের 'শকুন্তলা' আবিষ্কার করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

মিশনারিরা কোন প্রণোদনায় ভারতের ভাষা-ধর্ম-দর্শন শিখেছে কিংবা ব্যাখ্যা করেছে, সে কথায় যাচ্ছিনা; মিশনারিদের ভারতচর্চা জ্ঞানগত অর্থে কতোটা উল্লেখযোগ্য, সেটাই বলতে চাইছি। ভারতবর্ষে এমন পন্ডিতও ছিলেন যাঁরা কোনোরকম রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা ছাড়াই ভারতচর্চা করেছেন, যেমন ফিলিপো সাসেতি (১৫৪০-৮৮)। ফিলিপো ছিলেন অর্থশালী বিরাট ব্যবসায়ী-পরিবারের সন্তান; কিন্তু ব্যবসায় তাঁর উৎসাহ ছিলোনা, জ্ঞানসাধনাই তাঁকে চালিত করেছে, এবং তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের প্রধান বুদ্ধিজীবীদের একজন। ব্যবসায় উৎসাহ না থাকলেও বাণিজ্য-উপলক্ষেই তাঁকে ভারতবর্ষে আসতে হয়। ভারতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহচর্যে তিনি সংস্কৃত শেখেন, এবং মনে রাখা দরকার, উইলিয়াম জোনসের আগেই তিনি সংস্কৃত-র মধ্যে ধ্রুপদী ইউরোপিয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন—ফিলিপো সাসেতির চিঠিপত্রে তার বিবরণ আছে।

দুই

তবে এই উপমহাদেশে ভারততত্ত্ব, বা প্রাচ্যতত্ত্ব, বা অরিয়েন্টালিজমের প্রাতিষ্ঠানিক পরিণতি ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারিতে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। সন্দেহ নেই স্যার উইলিয়াম জোনস ছিলেন সোসাইটির প্রতিভূ পুরুষ, এবং তাঁর নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতেরা ভারতবিদ্যায় যে অবদান রাখেন, সারা পৃথিবীর জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভারতবর্ষে এই প্রথম বিদেশি রাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলো, এবং এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলায় ভারতচর্চার সূচনা। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংসকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন; অতঃপর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হন স্যার উইলিয়াম জোনস। উইলিয়াম জোনস ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। উইলিয়াম জোনস তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পুরোধা, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, প্রতিবর্ণায়ন, অনুবাদ ও বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা ও বর্ণলিপি বিষয়ে যুগান্তকরী বক্তব্যের প্রবক্তা, জ্ঞানের সর্বশাখায় শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব। গ্রীক, ইতালি এবং ভারতের দেবতা নিয়ে তিনি যে তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাকে 'কম্প্যারাটিভ

মিথলজি'র উপক্রমণিকা বলা যায়। জোনস ভারতীয় পুরাণকে গ্রীক-ইতালিয় পুরাণের সমকক্ষ করে তোলেন। উইলিয়াম জোনস মিশনারী ছিলেন না, জাতিগত অন্ধতা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিলো প্রাচ্যের জ্ঞানকে পশ্চিমে তুলে ধরা। তিনি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া খ্রিস্টান ছিলেন না। জোনসের দাক্ষিণ্যে ভারত-ইতিহাসের অসংখ্য লুপ্ত পৃষ্ঠা পুনরাবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে উইলিয়াম জোনস সেই বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, যা তাঁকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তকরূপে অমর করে রেখেছে। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপিয় ভাষার সাদৃশ্যের কথা জোনসের আগেও কেউ কেউ বলেছেন, যেমন সাসেতি, যেমন লেইবনিজ; কিন্তু মনে রাখা দরকার জোনস শুধু সাদৃশ্যের কথা বলেননি। তাঁর বক্তব্য হলো : 'সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন এবং আরো কোনো কোনো ভাষা— ভাষিক সংগঠন, ক্রিয়ামূল ও ব্যাকরণগত দিক থেকে পরস্পরসদৃশ, এই সাদৃশ্য জানিয়ে দেয় এগুলো একই ভাষা-বংশের সন্তান, এবং এক অভিন্ন ভাষা থাকে উদ্ভূত, সেই অভিন্ন ভাষাটির অস্তিত্ব সম্ভবত লুপ্ত হয়ে গেছে।' বলা বাহুল্য, জোনস যে-বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং সংস্কৃত-গ্রীক-লাতিন ভাষাসমূহের 'অভিন্ন উৎস' নির্দেশ করেছেন, তা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

উইলিয়াম জোনসের জাতিবিষয়ক অনুসন্ধানও অভিনব। হিন্দু, আরব, তাতার জাতির জন্মের উৎস ও বিকাশধারার রূপরূপান্তর জোনসকে উদ্দীপ্ত করেছিলো ব্যাপকভাবে। জোনস প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রথমবারের মতো সুশৃংখলভাবে উত্থাপন করেন। হিন্দু-পুরাণ, মনুসংহিতা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে উইলিয়াম জোনস চার পর্বে ভাগ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে রূপরেখা তৈরি করেন, তা এখনো পর্যন্ত নির্ভুল বলে প্রমাণিত। ১৭৮৯ সালে জোনস কালিদাসের শকুন্তলার ভূমিকা-সম্বলিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইউরোপে 'শকুন্তলা'র অনুবাদ-ভূমিকায় জোনস কালিদাসকে 'ভারতের শেক্সপীয়র' বলায়, 'এডিনবরা ম্যাগাজিন' এবং 'কোয়ার্টারলি রিভিয়্যু' ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভারতের সংগীত নিয়েও জোনস গবেষণা করেন। জোনসের একটা স্বভাব ছিলো অধ্যয়নের সর্বগ্রাসিতা: সংগীত বিষয়ে যখন পড়তে শুরু করলেন, যা কিছু মিললো সংস্কৃত বা ফার্সিতে, সবই পড়ে শেষ করলেন। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে তাঁর সন্দর্ভ 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর তৃতীয় ভল্যুমে (নভেম্বর ১৭৯০) প্রকাশিত হয় বিচারপতি হওয়ার কারণে হিন্দু আইনের অনুসন্ধানও তিনি পেশাগত কর্তব্য ভেবেছেন। জোনসের গবেষণার ফলে জানা গেলো, যে, বিজয়নগর বলে একটা রাজ্য ছিলো, এবং কৃষ্ণদেব নামক এক রাজা ছিলেন। জোনস কোম্পানিকে অনুরোধ করে 'মৌলবি' এবং 'পণ্ডিতদে'র জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করেন। জোনস হিন্দু এবং পারসিক মরমী গীতিকবিতার ইতিহাস রচনা করেন, তেরো শতকের সংস্কৃত কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ করেন। ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, মাত্র আটচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪), অথচ এই অল্প সময়ের ভেতর জ্ঞানজগতে, বিশেষত ভারতবিদ্যায়, তিনি যে অবদান রাখেন গুণে ও পরিমাণে তা নজিরবিহীন।

স্যার উইলিয়াম জোনসের পরও ভারতবিদ্যাচর্চা অব্যাহত থাকে; এইচ. টি. কোলব্রুক, এইচ.এইচ. উইলসন, জেমস প্রিনসেপ প্রমুখ পণ্ডিত ও ভারততত্ত্বে জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।

এইচ. টি. কোলব্রুক (হেনরি টমাস কোলব্রুক : জন্ম ১৭৬৫) উইলিয়াম জোনসের স্থলাভিষিক্ত হন, এবং ম্যাক্স মুলারের মতে কোলব্রুকের চেয়ে বড়ো অরিয়েন্টালিস্টের জন্ম ইংল্যাণ্ডে হয়নি। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ে কোলব্রুকের অবদান অবিস্মরণীয়। কোলব্রুকের বাবা ছিলেন কোম্পানির প্রভাবশালী চেয়ারম্যান; তিনি ইংল্যাণ্ডের 'হাউস অফ কমনস'-এর সদস্য ছিলেন। কোলব্রুক পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ১৭৮৩ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৮৬ সালে রাজস্ব কর্মকর্তার চাকরি নেন কোলব্রুক, অতঃপর ভারতবিদ্যা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের জ্ঞানশূন্যতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মূঢ়তা কোলব্রুককে পীড়িত করে তাছাড়া কোলব্রুকের বাবাও বিদ্যাচর্চায় প্রচণ্ড অনুপ্রাণিত করেন পুত্রকে। কোলব্রুকের একটা মানসিকতা ছিলো, জ্ঞানকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত করা; যাদের বিদ্যা ওরকম নির্ভুল বা বিশুদ্ধ নয়, কোলব্রুক তা ভীষণ অপছন্দ করতেন। গুণগ্রাহীও ছিলেন তিনি, উইলিয়াম জোনসের মতো পণ্ডিতের মৃত্যু তাঁকে খুব শোকাহত করে; বাবাকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন যে, এশিয়াটিক সোসাইটির সকল সদস্যের সমবেত প্রয়াসও উইলিয়াম জোনসের শূন্যতা ভরাতে পারবেনা। কোলব্রুক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সামাজিক স্মৃতি, প্রথা, অনুশাসন, ধর্ম ও দর্শন পাঠ করেন : এসব বিষয়ে কোলব্রুকের গবেষণা, বিশ্লেষণ ও রচনা এখনো বিশেষজ্ঞদের প্রধান ব্যবহার্য উৎস। ভারতের ধর্মশাস্ত্রে কোলব্রুকের পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। কোলব্রুকের সমকালে আরো অনেক ইউরোপিয় পণ্ডিত ভারতবিদ্যায় অবদান রাখেন; যেমন উইলিয়াম মার্সডেন, গোল্ডিংহাম, স্যার চার্লস মালেট, জোনাথান ডানকান, উইলিয়াম হান্টার, উইলফোর্ড, জন বেন্টলি এবং আরো অনেকে। তবে কোলব্রুকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ' রচনা, তবে তা সম্পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা, সন্দেহ। অবশ্য কোলব্রুকের চেয়ে উইলকিনসের 'ব্যাকরণ' অনেক জনপ্রিয় হয়েছিলো; কারণ সেটা কোলব্রুকের মতো জটিল, গভীর, বিশদ ছিলো না। কোলব্রুকের ব্যাকরণের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮০৫ সালে।

এর মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরী, জন মার্শমান 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র স্কলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এবং কিছু যৌথ প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। কেরী-মার্শমানের লক্ষ্য ছিলো মূলত ধ্রুপদী সাহিত্য ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনার বাংলায় অনুবাদ; এবং এই প্রক্রিয়ায়, সোসাইটির সহযোগে, 'রামায়ণে'র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' যখন সবদিক থেকে প্রাচুর্য ও জৌলুশে ভ'রে উঠেছে ঠিক তখনই কোলব্রুক চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। তাঁর স্থানে এলেন এইচ. এইচ. উইলসন। কোলব্রুকের গুরু ছিলেন উইলিয়াম জোনস; কোলব্রুক এবং জোনস ভারতবিদ্যাকে যতদূর এবং যেভাবে সম্প্রসারিত করেন, উত্তরসাধকেরা তার অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন।

এইচ. এইচ. উইলসনও কৃতী অরিয়েন্টালিস্ট : কালিদাসের 'মেঘদূত' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তিনি ('ক্লাউড মেসেঞ্জার' নামে যা ১৮১৩ সালে প্রকাশিত হয়); এই অনুবাদের পর তিনি অভিধান রচনার কাজে হাত দেন। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হলো জেমস মিলের বিখ্যাত 'দি হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' : তবে মনে রাখা দরকার এবই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হলেও, এর দৃষ্টিভঙ্গি, সোসাইটির অরিয়েন্টালিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

জেমস মিল ছিলেন উগ্র বর্ণবাদী এবং প্রচণ্ড রকম ইংরেজ; এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের যে ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার প্রকাশ করে আসছিলেন এতোদিন ধরে, জেমস মিল তা প্রবল উপেক্ষা ও উন্নাসিকতায় নাকচ করে দেন। ভারতবর্ষ জেমস মিলের চোখে 'তাবুলা রাসা' বা 'শূন্য শ্লেট' মাত্র : ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের কোনো ইতিহাসে থাকতে পারে, মিল বিশ্বাস করেন না। জেমস মিল উপযোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, তাঁর ইতিহসও সেই দৃষ্টিভঙ্গির ফল; জেমস মিলের ইতিহাস ইংরেজদের খুব পছন্দ হয়েছিলো, এবং দেখা যায়, উত্তরকালের অনেক ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখার মডেল হিশেবে মিলের বইটিকে শিরোধার্য মেনেছেন

উইলসনের কাজের এলাকা ছিলো বিশাল; সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও ভূমিকা রচনা তার মধ্যে অন্যতম। উইলসন বিপুল সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য পাঠকদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। অবশ্য দৃষ্টি যে খুব আকৃষ্ট হয় নি, সেটা বলা বাহুল্য। জর্মনির আউগুস্ত ভন শ্লেগেল তো উল্টো, অন্য অর্থে, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সোসাইটির পণ্ডিতদের সংস্কৃত-উদ্ধার চেষ্টায়। শ্লেগেল যাই বলুন, জোনস-উইলসন এবং অপরাপর পণ্ডিতদের সংস্কৃত-চর্চা ও প্রাচীন ভারতের নৃতাত্ত্বিক-জাতিতাত্ত্বিক-প্রাকৃতিক ইতিহাস-সন্ধান কোনোভাবেই অবমূল্যায়ন করা যাবে না। ১৮৩২ সালে উইলসন ইংল্যাণ্ডে চলে যান।

উইলসনের পর ১৮৩২ সালে সোসাইটির একটা নতুন জার্ণাল প্রকাশিত হলো 'দি জার্ণাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', সম্পাদক : জেমস প্রিনসেপ। এতোদিন সোসাইটির প্রধান মুখপত্র ও প্রকাশনা ছিলো 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' : জার্ণাল বার হবার (১৮৩২) আগে 'রিসার্চেস' সতের-এর ভল্যুম প্রকাশিত হয়। 'রিসার্চেস'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেলো সোসাইটির জার্ণাল। অন্যদিকে উইলসনের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে আবির্ভাব ঘটলো জেমস প্রিনসেপের; কেননা উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। তবে ইংল্যান্ড যাবার পূর্বে উইলসন কাজ করে যান অনেক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়ে অফুরন্ত গবেষণা ও প্রকাশনা; তবে ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের পর উইলসনের ভারত-চর্চা বেড়ে যায় আরো, সেগুলোর গুরুত্বও বেশি; যেমন "ঋগ্বেদ"-এর অনুবাদ, 'জার্ণাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে বিভিন্ন গবেষণা-সন্দর্ভ, ইত্যাদি। ম্যাক্স মুলারের কাজেও উইলসন বিরাট অনুপ্রেরণা ছিলেন।

উইলসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী জেমস প্রিনসেপ (জন্ম : আগস্ট ১৭৯৯); ১৮১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ভারতে আসেন, এবং ১৮৩২ সালে সোসাইটির সচিব হন। উইলসন মেধাবী প্রিনসেপকে খুঁজে বার করেন এবং তাঁর প্রস্তাবসূত্রে জন্ম নেয় সোসাইটির জার্ণাল। তার আগে 'রিসার্চেস'-ই ছিলো সোসাইটির একমাত্র মুখপত্র; অবশ্য জার্ণাল বার হবার (১৮৩২) পরও 'রিসার্চেস' প্রকাশিত হতে থাকে—১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। তবে 'জার্ণালে'র গুরুত্ব যে বেড়ে গিয়েছিলো সব দিক থেকে, সেটা বলা বাহুল্য। প্রিনসেপ ছিলেন মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখাজোখায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে বিদ্বৎসমাজে, তাছাড়া স্থাপত্য, রসায়ন ও পরিসংখ্যানেও তাঁর বুৎপত্তি ছিলো অগাধ : তবে সোসাইটির সম্পাদক হবার পর তিনি ইতিহাসে ফিরে আসেন

জেমস প্রিনসেপ ভারত-চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। এতোদিন ভারতবিদ্যা এ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সন্ধানে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষা-সাহিত্য-পুরাণ-কাব্য-কথকতা; প্রিনসেপ মুদ্রা, এপিগ্রাফ ও আর্কেওলজির ভিত্তিতে ভারততত্ত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। যার ফলে মাত্র ছ'বছরের সময়কালে (১৮৩৩-১৮৩৮) প্রাচীন ভারতের অনেকগুলো রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়। প্রিনসেপের সময় সোসাইটির আর্থিক দুরবস্থা দুর্ভাগ্যজনক। জেমস মিল এবং ম্যাকলের কোনো উৎসাহই ছিলো না প্রাচীন-ভারত বিষয়ক বিদ্যাচর্চা বা গবেষণায়; তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে এর বিপক্ষে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেন, এবং তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা-পলিসি পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন ১৮৩৩ সাল থেকে দ্রষ্টব্য।

ব্রিটিশ সরকারের পলিসির এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়, স্বাভাবিক; অরিয়েন্টালিজম, সোসাইটির বিদ্যাচর্চা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার এই পরিণতি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে এই আলোচনা শেষ করতে চাই।

তিন

অরিয়েন্টালিজমের পরিণতি যা হবার কথা, ভারতবর্ষে তাই হয়েছে। ভারততত্ত্ব ঔপনিবেশিকায়নের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে; কাজেই ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতবর্ষকে যখন বুঝে ফেলেছে সম্পূর্ণ, ভারতবিদ্যার প্রয়োজন আর বোধ করেনি। অরিয়েন্টালিজম এভাবে কলোনয়ালিজমের সঙ্গে যুক্ত হলো, এভাবে জ্ঞান ক্ষমতার একটা কৌশল হলো, বিদ্যা ও বিশেষজ্ঞতা এভাবে কর্তৃত্ব-প্রয়োগের হাতিয়ার হলো, এই ভাবে উপমহাদেশের এই জনপদ উপনিবেশ হলো। একটা জনপদ যখন উপনিবেশে পরিণত হয়, তখন উইলিয়াম জোনস, টি. এইচ. কোলব্রুক, উইলসন বা প্রিনসেপের মতো পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না, তখন দরকার চমৎকার কর্তৃত্ব, প্রশাসন, প্রভুত্ব, জবরদস্তি, নেটিভের সঙ্গে লেন-দেন আর হিশেব-নিকেশ। এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাচর্চার তখন দরকার থাকে না। তখন অর্ধশতাব্দীর শ্রম-মেধা-প্রতিভায় উদ্‌ঘাটিত ভারতের সমৃদ্ধসভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে জেমস মিল এক লহমায় 'তাবুলা রাসা' বা শূন্য পৃষ্ঠা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। সোসাইটির পণ্ডিত ও জ্ঞান-সাধকেরা বিমূঢ় হন তাতে, কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন তাতে বিচলিত হয় না : ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন, ক্ষমতা ও আধিপত্য আপন গতিতে চলতে থাকে।

এডওয়ার্ড সাইদের "অরিয়েন্টালিজম" (১৯৭৮) বইয়ের উল্লেখ প্রবন্ধের শুরুতে করেছি। সাইদের বইতে ইউরোপিয়দের প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো আছেই, ভারতবর্ষে ইউরোপিয়দের জ্ঞানচর্চা এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ভারতবিদ্যা সম্পর্কেও বিভিন্ন স্থানে মন্তব্য পাবো। অরিয়েন্টালিজমকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেছেন এডওয়ার্ড সাইদ, ফলে তাঁকে সামগ্রিক সারাংশে আসতে হয়েছে। অরিয়েন্টালিজমকে তিনি দেখেছেন পশ্চিমের এক প্রজেক্ট হিশেবে, যে-প্রজেক্ট চরিত্র স্বভাব ও পরিণামের দিক থেকে একশোভাগ ইউরোপিয়; অরিয়েন্টালিজমে অন্তরিত ঔপনিবেশিক মতাদর্শ উপেক্ষা করার উপায় নেই। ইউরোপিয় পণ্ডিতবর্গের

অরিয়েন্টালিজম সম্পর্কে সাইদের প্রধান আপত্তি কয়েকটি :

> এক. অরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্যকে আপন ভাবেন নি, সব সময়েই মনে করেছেন আদার/ভিন্ন/অপর ব'লে। অরিয়েন্ট এবং যা কিছু অরিয়েন্টাল, সবই ভিন্ন এবং অপরিচিত; অপরিচিত বলে 'আনফ্যামিলিয়ার', আনফ্যামিলিয়ার বলে 'রোমান্টিক' : যা রোমান্টিক তা বাস্তব নয়। অরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্যের রোমান্টিক অতীত ও পুরাণে যতো আকৃষ্ট, প্রাচ্যের সমকালীন দুঃখ, দুঃশাসনে ততোটাই অমনোযোগী।
>
> দুই. অরিয়েন্টালিজম প্রাচ্যকে বুঝবার একটা প্রয়াস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বোঝাপড়া ঔপনিবেশিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ।
>
> তিন. নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে প্রাচ্যের সভ্যতা ও ইতিহাসের সন্ধান ইউরোপিয় অরিয়েন্টালিস্টরা করেছেন; ফলে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য তাদের মনে হয়েছে অদ্ভুত ও বেগানা, এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে সব সময়। কাজেই অরিয়েন্টালিজমের প্রকল্পে ইস্ট-ওয়েস্টের দূরত্ব এবং অরিয়েন্ট-অকসিডেন্টের বিপরীত যুগ্মপদ কখনো মুছে যায়নি।
>
> চার. অরিয়েন্টালিজমের সঙ্গে পাশ্চাত্যের রাজনীতির সম্পর্ক নিবিড়: এই রাজনীতি বাদ দিয়ে সাহেবদের প্রাচ্যবিদ্যা বা ভারতচর্চা বিচার করা যায় না।
>
> পাঁচ. অরিয়েন্টালিজম একটা জ্ঞান, যে-জ্ঞান বিশেষভাবে পশ্চিমের, যে-জ্ঞানের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে পশ্চিমের ক্ষমতা; অই জ্ঞান এবং ক্ষমতার জোরে পশ্চিম অর্জন করেছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ, রাষ্ট্র শাসনের বৈধতা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এভাবে অর্জিত জ্ঞানের জোরে বৈধ হয়েছে, এবং এর ভেতর কোনো অন্যায় চোখে পড়েনি, অরিয়েন্টালিস্টদেরও নয়।

সাইদের বক্তব্য প্রভাবশালী, বিংশ শতাব্দীর অনেক ভাবুক ব্যক্তি সাইদের বই পড়ে অনুতপ্ত হয়েছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাইদের বইকে সবচেয়ে মূল্য দেবে, সেটা স্বাভাবিক। জীবনের শেষ পর্বে নীহাররঞ্জন রায়ের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবীও সাইদের বই পড়ে অসম্ভব অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার প্রমাণ তার ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধ 'অরিয়েন্টালিজম'। নীহাররঞ্জন রায় ভারতের রেনেসাঁসের যে পুনর্বিচার করেছেন দীর্ঘ এক প্রবন্ধে, সেটাও এই প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়।

এডওয়ার্ড সাইদের "অরিয়েন্টালিজম" বইটি যাঁরা পড়েছেন, নীহাররঞ্জন রায়ের 'অরিয়েন্টালিজম' নামের ইংরেজি প্রবন্ধটিকে তাঁদের মনে হবে সাইদের বইটির সংহত ও সংক্ষিপ্ত সারাংশ। এডওয়ার্ড সাইদের বই নীহাররঞ্জনকে উদ্দীপিত করেছে। তিনি সাইদের শুধু বক্তব্য নয়, বিশেষ ধরনের ভাষা-পরিভাষারও অনুসারী। নীহাররঞ্জন বলেন, আঠারো-উনিশ শতকে পশ্চিমের প্রাচ্যচর্চা ও ভারতবিদ্যা এবং পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্য দখল ইউরোপের একটা নতুন বস্তুগত সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণে সাহায্য করেছে। নীহররঞ্জন রায় বলেন, অরিয়েন্ট কি অরিয়েন্টালিজম কাকে বলে এগুলো—ভালো করে বোঝা দরকার। অরিয়েন্টালিজম একটা জ্ঞান-প্রকল্প : এই জ্ঞান ইউরোপিয় ইন্ডোলজিস্ট প্রশাসক বৃত্তান্তকার ঐতিহাসিক পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি; যে জ্ঞানের মূল লক্ষ্য প্রাচ্য এবং

পশ্চিমের মধ্যে বিরাট এক বিভাজনরেখা টানা। এই বিভাজন ইউরোপিয় পণ্ডিতেরা সচেতনভাবে তৈরী করেছেন এবং এই বিভাজন প্রাচ্যতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিভাজনের ফলে প্রাচ্যতত্ত্বের টেকস্টে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে পশ্চিম কতোটা উন্নত, প্রাচ্য কতোটা হতচ্ছাড়া; পশ্চিম কি রকম শক্তিশালী প্রাচ্য কেমন হীনমন্য। অরিয়েন্টালিজমের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তি দুর্বল প্রাচ্যকে শাসন করার বৈধ 'অথরিটি' অর্জন করে। পশ্চিমের ছিলো রেনেসাঁস, এনলাইটেনমেন্ট, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অহংকার ও দাপট, সেই অহংকারও ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। নীহাররঞ্জন দুঃখের সঙ্গে বলেন, যে-রেনেসাঁস ও আলোকপর্ব একান্তভাবে ইউরোপের ঘটনা তাকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বলে ভাবলেন এবং এভাবে রেনেসাঁসের মিথ তৈরী হলো ভারতবর্ষে। ঔপনিবেশিক ভারতে রেনেসাঁস কেন ঘটতে পারেনা, অন্যত্র দীর্ঘ এক প্রবন্ধে, নীহাররঞ্জন তা বিশ্লেষণ করেছেন।

নীহাররঞ্জন বলেন 'অরিয়েন্টালিজম' বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রকল্প নয়। পশ্চিম-ইউরোপে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে এই ডিসিপ্লিন গড়ে ওঠে। এই ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে প্রাচ্যকে ব্যাখ্যা এবং নিয়ন্ত্রণ করা ইউরোপের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ অরিয়েন্টালিজম কেবলি একটি একটা জ্ঞান, পান্ডিত্য, বা ব্যাখ্যাশাস্ত্র নয়, প্রাচ্যের দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলও। প্রাচ্যতত্ত্ব কেবলি একটা বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানগত অন্বেষা নয়। লেখাটির শেষে নীহাররঞ্জন একটা প্রশ্ন রেখেছেন, প্রশ্নটি হলো:

> ১৮৩২ সালে শিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ৪৭ বছর পূর্ণ হয়। এই দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর মতো সময়কালে কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সোসাইটির সদস্য ছিলেন না, রাজা রামমোহন রায় বা রাধাকান্ত দেব কেউই এর সদস্য হতে পারেন নি; অথচ বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা এদের ছিলো, ভারতের ধর্ম, ঐতিহ্য সাহিত্য, দর্শনে এরা সুপণ্ডিত ছিলেন, কেন এরকম হলো? এশিয়াটিক সোসাইটি কেন কেবলমাত্র একটা ইউরোপিয় সংস্থায় হয়ে থাকলো কেন কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবী তাতে ঢুকতে পারলেন না?

এই প্রশ্ন বিরাট এক প্রশ্ন: নীহাররঞ্জন ছাড়া এই প্রশ্ন আর কেউ তুলেছেন বলে জানিনা। মেঘালয়ের এক অধ্যাপক ও. পি . কেয়ারিওয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর পি এইচ ডি ডিগ্রি করেছেন, এবং তিনশো পৃষ্ঠার অভিসন্দর্ভ লিখেছেন; সেই অভিসন্দর্ভে সবই আছে, এই ছোট্ট সাধারণ প্রশ্নটি ছাড়া।

এই প্রশ্ন এড়িয়ে অরিয়েন্টালিজম, বা ভারতবিদ্যা, কোনোটাই বোঝা যাবেনা। অরিয়েন্টালিস্টদের বইপত্রে অনেক ধরনের গোলযোগ তো এমনিতেই আছে, সেটা নিয়ে ডক্টরাল সন্দর্ভও তৈরি করা যায় : কিন্তু তার আগে দরকার নীহাররঞ্জনের ছোট্ট প্রবন্ধের ছোট্ট প্রশ্নটির মীমাংসা : যদি আমরা বুঝতে চাই জ্ঞানের রাজনীতি; জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ; ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার ঝগড়া : যদি বুঝতে চাই সাইদের বই , নীহাররঞ্জনের বৃদ্ধ বয়সের উদ্বেগ, যদি ধরতে চাই কেন এবং কিভাবে ব্যাপ্ত হলো রেনেসাঁসের মিথ—আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে, আমাদের অভিজাত জ্ঞানচর্চায়, অভিসন্দর্ভে; রাশি রাশি প্রবন্ধ, ব্যাখ্যান ও ভাষ্যে

অরিয়েন্টালিজম: বিতর্কের প্রতিপাদ্য

পশ্চিমের 'অরিয়েন্টালিজম'কে এডওয়ার্ড সাইদ একটা 'প্রজেক্ট' বা প্রকল্প বলেছেন—যে প্রকল্প ঐতিহাসিক, জ্ঞানময়, পান্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু একইসঙ্গে তা পশ্চিমের সমকালীন রাজনীতি, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতা, বিদ্যার সঙ্গে রাজনীতি, পান্ডিত্যের সঙ্গে প্রভুত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে হলে 'অরিয়েন্টালিজম' নামক বিদ্যাপ্রকল্পকে তার অপরূপ উৎপ্রেক্ষা মানতে হয়। 'কেন্দ্র' ও 'প্রান্ত' নাম দিয়ে পৃথিবীর বিভাজন যদি করি, তাহলে এডওয়ার্ড সাইদের বইটিকে 'প্রান্তে'র সমর্থক ও প্রান্তদেশীয় গোলার্ধের প্রতি পক্ষপাতমূলক বক্তব্যের প্রেরণাময় এক সন্দর্ভ বলা যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে-সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে, তার সঙ্গে সাইদের বইটির আভ্যন্তর চেতনার মিল খুব বেশি—"অরিয়েন্টালিজম" (১৯৭৮) বইয়ের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক বিতর্কের মূলও সেখানে। এর সঙ্গে জড়িত পরবাসী বুদ্ধিবৃত্তির প্রসঙ্গ, যাকে এডওয়ার্ড সাইদ সুন্দর একটি নাম দিয়ে বলেন, 'ফিগর অফ এক্সাইল'। আথেনীয় নাটক থেকে আজকের সময় পর্যন্ত যে বিরাট অরিয়েন্টালিস্ট মানচিত্র তুলে ধরেছেন এডওয়ার্ড সাইদ, এবং তার নিরিখে প্রায় অভিন্ন প্রস্তাব ও মীমাংসা করেছেন—জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচারে তার সবটা অন্তর্বিরোধহীন নয়। এডওয়ার্ড সাইদ একদিকে 'ফিলিস্তিন' নামক আরবদেশের একজন বাশিন্দা, অন্যদিকে মার্কিন দেশের খ্যাতিমান অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী, সর্বোপরি উত্তর-আবয়বিক সমালোচনাতত্ত্বের ঘরানায় তাঁর চলাফেরা ও লেখালেখি: এই সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তার বক্তব্য বিচার করা যায় না ব'লে তাঁর বহুশ্রুত বইটি নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠেছে।

"অরিয়েন্টালিজম" বইটিকে ওইসব বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করা জরুরি। একটা কথা বলা হয় যে, এডওয়ার্ড সাইদ তৃতীয় বিশ্বের একান্ত আপনজন, কাজেই পশ্চিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে উক্ত বইয়ের মতো তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্র হাতে থাকা দরকার প্রতিরোধবাদী সাংস্কৃতিক তত্ত্বের জন্যে এবই একমাত্র ভূমিকা পালন করতে পারে—এইরকম চিন্তা ছেলেমানুষী। বাংলাভাষায় যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন, তাদের কেউ কেউ ওরকমই ভাবছেন: কেউ কেউ বার হবার এক যুগ পর বইটি পড়েছেন; কেউ কেউ সাইদের বইয়ের উপাত্ত-উপকরণকে যাচাই বাছাই করেও দেখেননি; কেউ কেউ একজীবনে হয়তো এ-বইটিই পড়ে উঠতে পেরেছেন—গ্রামসি, ফুকো, দেরিদার নামও তাঁদের অজ্ঞাত। এটি তাঁদের দোষ বা গুণ নয়, ফুকো-সাইদ ছাড়াও বুদ্ধির চর্চায় অসুবিধে নেই, এবং সাইদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রে পেতে পারি। কিন্তু সেটা প্রসঙ্গ নয়, আমাদের ভাবা দরকার "অরিয়েন্টালিজম" বইয়ের বিরুদ্ধে তর্কটা কি, এবং তার ভিত্তি কোথায়? সাইদের বইতে ব্যাপক আরগুমেন্ট, এবং চ্যালেঞ্জ আছে: অরিয়েন্ট ও অকসিডেন্ট, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাইদের বইয়ের দুই পরস্পর-বিরোধী প্রতিপক্ষ। সাইদের

টেকস্টে 'প্রাচ্য' যেন হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে, পশ্চিমকে জব্দ করতে চেয়েছে নানাভাবে: অনেকখানি সাহস ও ক্ষোভের সঙ্গে পশ্চিমের আবহমান অস্ত্র একটানে ছিঁড়ে আলগা করে নিতে চেয়েছে।

সমস্যা হলো যেসব যুক্তি দিয়ে সাইদ পশ্চিমকে জব্দ করেছেন, তার কোনো কোনোটি দমিতের পক্ষে উত্তেজক হলেও তথ্যভিত্তিহীন; কিংবা তথ্যনিষ্ঠ হলেও উগ্র ও একমাত্রিক, মনোহর হলেও সারবত্তা অল্প। সবচেয়ে বড়ো কথা, অরিয়েন্টালিজমের খারাপ দিকগুলো নির্দেশ করেই তিনি ক্ষান্ত, এক ডিসকোর্সের বিরোধিতা করে অন্য ডিসকোর্স প্রস্তাব করেননি সাইদ। অরিয়েন্টালিজম বইয়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এডওয়ার্ড সাইদ বলেছেন: অরিয়েন্টালিজম প্রজেক্টের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা এবং কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়া আর কিছু তিনি করেন নি। সেক্ষেত্রে তাঁর বইটি একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াশীলতার বেশি কিছু উপহার দিতে পারে না। সাইদের 'অরিয়েন্টালিজম' যে কিছু প্রশ্ন আর কয়েকটা বিতর্কেই শেষ, তা তাঁর পরবর্তী "কালচার এন্ড ইমপেরিয়ালিজম" (১৯৯৩) বই থেকে সুস্পষ্ট। শেষে ও বইয়ের কোনো কোনো আলোচনায় নিজস্বতার যে দাবি তিনি করেছেন, তা বুদ্ধিবৃত্তিক সততার প্রতিকূল। 'অরিয়েন্টালিজম' বইয়ের সব কথাও তাঁর নয়। অন্যের কথাকে নিজের বলে চালানোর দোষ সাইদের একটা অভ্যেস, এবং সেই অভ্যেস ও অসততা যখন এজাজ আহমদের মতো যোগ্য সমালোচক অনুপুঙ্খভাবে দেখান, আমরা বিব্রত না হয়ে পারি না।

এখানে এজাজ আহমদের কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রয়োজন। এজাজ আহমদ বলেন, "অরিয়েন্টালিজম"-এর মতো আক্রমণাত্মক ও নাস্তিবাদী বই লেখার ব্যক্তিগত কারণও রয়েছে। এডওয়ার্ড সাইদ ফিলিস্তিনী, এবং বিদেশবাসী; স্বভাবত তিনি আমেরিকার প্রতি ক্রুদ্ধ, এবং সেই ক্রোধ তাঁর টেকস্টের সর্বাঙ্গে উৎকীর্ণ। তিনি ফিলিস্তিনী, এবং ফিলিস্তিন নামক দেশ ও তার রক্তপাত সাইদকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেজন্যে তাঁর বক্তব্যে একটা ঝাঁজ আছে, বিক্ষোভ ও রাগ আছে, ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট; এইসব মিলিয়ে তাঁর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ, এবং রোজকার হুমকি, আতংক ও ভয়—এক কথায় এই বায়োগ্রাফি তার লেখার প্রতি আলাদা দরদ তৈরি করেছে সবার। তবে কেবল ঝুঁকি নয়, আছে সম্মানও, বিশেষ পরিবেশে বিশেষ ধরনের বক্তব্য দেবার সম্মান। আততায়ীর গুলি ভেদ করে যেতে পারে তাঁর হৃৎপিন্ড, এই কিংবদন্তী ও গুজব তাঁর টেকস্টে আলাদা জোর তৈরি করেছে। তবে কেন তিনি 'অরিয়েন্টালিজমে'র মতো বই লিখলেন, তার কারণ ভিন্ন। এজাজ আহমদ বলেন, এডওয়ার্ড সাইদ 'তুলনামূলক ইউরোপিয় সাহিত্যে'র বিশেষজ্ঞ, আর এই ক্ষেত্রটি মূলত তিন ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত: একজনের নাম এরিখ আয়েরবাখ, একজন কার্টিয়াস, একজন স্পাইটযার। তিনজনই জর্মন, এবং এঁরা ক্ষেত্রটিতে রক্ষণশীল মার্গীয় মানবিকবাদের মোহর এঁকে দিয়েছেন। বিশেষত এরিখ আয়েরবাখ; এজাজ আহমদের ভাষায়, 'সাইদের কাউন্টার-ক্লাসিকের অনুল্লিখিত প্রতিনায়ক'। পশ্চিমের টেকস্টকে উল্টোদিক থেকে পড়বার কারণও এই আয়েরবাখ; আয়েরবাখ যা লিখেছেন সাইদ বিপরীত দিক থেকে তা ভাবতে ও লিখতে চান। আথেনিয় ড্রামা থেকে অরিয়েন্টালিজমের শুরু; এই অদ্ভুত প্রতিপাদ্য সাইদকে

প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এজন্যে যে, তাঁর অদৃশ্য প্রতিনায়ক আয়েরবাখও আরম্ভ করেছেন হোমার দিয়ে; আর যেহেতু দান্তে আয়েরবাখের বৃত্তান্তের প্রধান এক নায়ক, তাই অরিয়েন্টালিজমের অনেকাংশ দান্তের বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যায় ব্যয় করতে হয় সাইদকে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের একটা পর্বে দু'জনের মিলও আছে। সাইদ বার বার বলেন যে বইটির কথা, তার নাম "মাইমেসিস"; যেটা আয়েরবাখ লিখেছিলেন যখন তিনি ফ্যাসিবাদের উদ্বাস্তু হয়ে জর্মনি থেকে দূরে নির্বাসনে ইস্তাম্বুল পড়ে আছেন, এবং লিখলেন "মাইমেসিস"; আয়েরবাখের হাতের কাছে বইপত্র নেই, ধ্রুপদী ও রোমান্স ভাষার লাইব্রেরি নেই, যখন গণহত্যা নারীহত্যা শিশুহত্যা চলছে। আয়েরবাখ 'মাইমেসিস' লিখলেন, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারহীন এক পরিবেশে; বারবার তার মনে হয়েছে, ইউরোপীয় সাহিত্যের যে মানবিকবাদী চৈতন্যের কথা তিনি বলছেন—সে ঐতিহ্য হয়তো অচিরেই ভস্মস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু সাইদের সঙ্গে "মাইমেসিসে"র সম্পর্ক কি? আছে। একটি সম্পর্কের কথা আগে বলেছি; অন্যটি হলো, আয়েরবাখের মাস্টারপীস রচিত হয় দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত পরিবেশে, আর এডওয়ার্ড সাইদের "অরিয়েন্টালিজম"ও ফিলিস্তিনের বাইরে বসে লেখা! এবং সন্দেহ নেই এটা সাইদের বেশ উচ্চাশী রচনা। তদুপরি আয়েরবাখ ইউরোপিয় জ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, যার বিরুদ্ধে 'অরিয়েন্টালিজম' প্রণীত। ইউরোপিয় মানবতাবাদ ও পশ্চিমের উপনিবেশবাদ যেহেতু এক, সাইদের দৃষ্টিতে, তাই প্রতিনায়ক হিসেবে বারবার আয়েরবাখের নাম ভেসে উঠেছে তাঁর ভাবনায়।

সাইদের বিশ্বাস, এস্কিলাস থেকে এডওয়ার্ড লেইন পর্যন্ত অরিয়েন্টালিজমের যে প্রবাহ, তার কেন্দ্রে অভিন্ন ধারণা পুনরাবৃত্ত: প্রাচ্যকে অধস্তন ও হীনমন্যরূপে দেখার ও দেখানোর ধারাবাহিক প্রবণতা। সেজন্যে আলোকপর্বকেও সাইদ প্রাচ্যতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের 'মাস্টার সাইন' মনে করেন, সেজন্যে মার্গীয় মানবতাবাদ ও ঔপনিবেশিক প্রজেক্টে অপ্রতিরোধ্য সংগতি আর সংযোগ খুঁজে পান তিনি।

এডওয়ার্ড সাইদ 'অরিয়েন্টালিজম' কে 'ডিসকোর্স' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; গ্রন্থের প্রথম দিকে তিনি বলেছেন: 'অরিয়েন্টালিজম' একটা ডিসকোর্স, এবং ডিসকোর্সের এই ধারণা আমি নিয়েছি ফুকোর বিখ্যাত দুটো বই থেকে—'দি আর্কেওলজি অফ নলেজ' এবং 'ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ'। সাইদ বলতে চান, অরিয়েন্টালিজমকে ডিসকোর্স হিসেবে না দেখলে বোঝা যাবে না পশ্চিমের সংস্কৃতি কিভাবে কেন কোন প্রক্রিয়ায় অরিয়েন্টালিজমের মতো একটা সুশৃংখল জ্ঞানকান্ডের জন্ম দিয়ে গেলো এবং কিভাবে অতঃপর পশ্চিমের মর্জিমতো নির্মিত ও উপস্থাপিত হলো 'অরিয়েন্ট'-এর একেকটা টাইপ, রূপ, আদল। উত্তর-আলোকপর্বে, এই ডিসকোর্সের মাধ্যমে, পশ্চিম রাজনৈতিকভাবে, সমাজতাত্ত্বিকভাবে, সামরিকভাবে, মতাদর্শিকভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে ও কাল্পনিকভাবে 'অরিয়েন্ট' নামক বস্তুটিকে সৃষ্টি করেছে।

মিশেল ফুকোর 'ডিসকোর্স' তত্ত্ব দ্বারা তো বটেই, এমনিতেও, এডওয়ার্ড সাইদ প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন ফুকো থেকে। ফুকোর বিভিন্ন পরিভাষা অনবরত উদ্ধৃত হয় সাইদের বইতে: রেগুলারিটি, ডিসকার্সিভ ফিল্ড, রিপ্রেজেন্টেশন, আর্কাইভ, এপিসটেমিক ডিফারেন্স, ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা হলো, ফুকো পশ্চিমের বুর্জোয়া জ্ঞানতাত্ত্বিক

ডিসকোর্সের যে মানচিত্র বানান, সাইদের সঙ্গে তার মিল নেই। ফুকো যে পশ্চিমী জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলেন, তা খুব ঐতিহাসিক, এবং তার নির্দিষ্ট কালপর্ব আছে। মোটের ওপর তা সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু। অন্যদিকে ডিসকোর্সের ধুয়ো তুলে সাইদ 'অরিয়েন্টালিজম'কে সরিয়ে নিয়ে যান আরো অনেক অনেক আগে সুদূর গ্রীসে, আথেনীয় নাটকে, দান্তের রচনায়। সেই সুদূর অতীতে আর যাই হোক, 'অরিয়েন্টালিজম' নামক বস্তু উৎপন্ন হতে পারেনা।

মিশেল ফুকো সপ্তদশ শতকের পূর্বে 'ডিসকোর্সের' উপস্থিতি স্বীকার করেন না; তাঁর মতে, সপ্তদশ শতকের পূর্বে ডিসকোর্স ছিলো না, ছিলো উত্তর-মধ্যযুগীয় যুক্তিশীলতা, যার উদ্ভব আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিকায়ন, অর্থনৈতিক উৎপাদন, যুক্তিপ্রত্যক্ষ পরিকল্পনার পটভূমিকায়। অথচ এডওয়ার্ড সাইদ, ফুকোর শিষ্যত্ব মেনেও বললেন, অরিয়েন্টালিজম-ডিসকোর্সের সূচনা ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ইউরোকেন্দ্রিকতার আবির্ভাব গ্রীক ট্রাজেডির রিচ্যুয়াল মঞ্চে। এমনকি ভারত বিষয়ে কার্ল মার্কসের ভাবনাকেও এডওয়ার্ড সাইদ অরিয়েন্টালিস্ট ডিসকোর্সের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি মনে করেন। এইরকম অভিনব সিদ্ধান্তের কারণ, এজাজ আহমদের মতে, 'ডিসকোর্স' কথাটির অর্থনাশ, এবং 'ডিসকোর্স' ও 'ক্যানন' এর ভেদলুপ্তি। 'ডিসকোর্স' আর 'ক্যাননিকাল ট্রাডিশন' কখনোই এক নয়, অথচ সাইদ দুটোকে 'এক' করে ছেড়েছেন। ফুকোর ভাষ্যে 'ফর্ম' ও 'বাউন্ডারি', 'ডিসকোর্স' ও 'ক্যানন', 'সন্দর্ভ-রূপায়তি' ও 'ব্যক্তিগত অভিমত', 'বহস' ও 'প্রতিষ্ঠান'—সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাইদ এমনকি দুটো বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী : (এক) অখন্ড ইউরোপীয়/পশ্চিমী আইডেনটিটি বলে একটা জিনিশ প্রথমাবধি পশ্চিমের আছে, সেই অখন্ড আইডেনটিটি দিয়ে তাদের ইতিহাসের সূচনা, এবং সেই আইডেনটিটি তাদের চিন্তা ও টেকস্টকে নিয়ন্ত্রন করেছে; (দুই) এই ইউরোপিয় আইডেনটিটির অখন্ড ইতিহাস ও ইতিহাসের চিন্তা প্রাচীন গ্রীস থেকে উনবিংশ শতাব্দী, এমনকি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, প্রবাহিত; পশ্চিমের-শুরু-থেকে বিদ্যমান বিশ্বাসব্যবস্থা ও মূল্যবোধ আজ-অবধি অভিন্নরূপে সক্রিয়; (তিন) পশ্চিমের মহাপুস্তকগুলো অই অখন্ড চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব। ফলে, এই ক্যাননিকাল ঐতিহ্যে বিশ্বাসী সাইদের পক্ষে গ্রীক নাট্যকার এস্কিলাসের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের যোগনির্ণয় সহজ হয়ে ওঠে। রেনেসাঁস-উত্তর কালে এই ধারাক্রম ও অখন্ডতা যে ভেঙ্গে পড়েছিলো সম্পূর্ণ, সাইদ তা কেয়ার করেন না। সারকথা হলো, ফুকো থেকে 'ডিসকোর্স' কথাটি নিলেও সাইদ মূলত 'ঐতিহ্য'কে 'ডিসকোর্সে'র স্থানে বসিয়েছেন; 'ক্রমিক পর্বায়ন' ফুকোর 'ডিসকোর্সের' বিকল্প হয়ে উঠেছে। ইউরোপের এই 'ঐতিহ্য' (গ্রেট বুকসের ঐতিহাসিকতা)— আয়েরবাখ ও সাইদ দু'জনের সমগ্র মনোলোকে ব্যাপ্ত; একজন ওতে খুঁজে পান মার্গীয় মানবিকবাদের অফুরন্ত ভাবোপকরণ, অন্যজন তাতে কেবলি দেখেন হিউম্যানিজমের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদ, ক্ষমতার আন্তর্বয়ন, ঔপনিবেশিকতা ও ইউরোকেন্দ্রিক প্রভুত্বের চিহ্নমালা।

সাইদের "অরিয়েন্টালিজম" (১৯৭০) বই দিয়ে যাঁর পড়াশোনার হাতেখড়ি, তাঁর দৃষ্টিতে এবইটিকে মনে হবে একান্তই মৌলিক এক রচনা কিন্তু পাঠ-পরিধি আরেকটু বাড়ালে বোঝা যায়, বিভিন্নদিক থেকে মনোহর হলেও এবই খুব মৌলিক নয়। সবচেয়ে

বড়ো কথা, যেসব বিষয়ের বিপক্ষে সাইদ ক্রমাগত কথা বলেছেন, সাইদের বক্তব্য ও বক্তব্যের উপকরণ ওসব বিষয়ের পক্ষেই গেছে। দেরিদাও পশ্চিমের সমালোচনা করতে গিয়ে সাইদ বারবার 'টেক্সচ্যুয়ালিটি'র বিরোধিতা করেন, কিন্তু সাইদ নিজে কিন্তু অতিরিক্তরকম 'টেক্সচ্যুয়াল'। টেকসচ্যুয়ালিটি ও টেকসচ্যুয়াল সংস্কারের কারণে তিনি 'ঔপনিবেশিক' ও 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' এই দুই বিষয়কে 'টেকস্টে'র দাঁড়িপাল্লায় মাপতে চেয়েছেন। ফলে এরকম অদ্ভুত কথাও তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, সময়ের দিক থেকে যারা কলোনির কালপর্বে পড়েন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কলোনিয়াল; আর যারা উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ের, তাদের মনস্বিতা পোস্ট-কলোনিয়াল। আরেকটি বড়ো আপত্তি হলো, 'পশ্চিমে'র টেকস্টে 'অরিয়েন্ট'র যে রূপ, সেই রূপটাকে সাইদ খুব বড়ো করে দেখেন— এই 'টেকচ্যুয়াল অরিয়েন্ট'কে প্রাচ্যবাসী কিভাবে প্রতিহত প্রত্যাখ্যান ও পরিবর্জন করে আত্মসন্ধান ও জিজ্ঞাসায় উপনীত হলো, তার বৃত্তান্ত বা ইতিহাস সাইদের বইতে নেই। নেই, এবং আমাদের মনে হয়, থাকতে পারতো না; কেননা সাইদের সবকিছু টেকস্ট-নির্ভর, একমাত্রিক, এবং টেকস্টের বাইরের ইতিহাসে মনোযোগ দিলে "অরিয়েন্টালিজম" বইটির একস্বর আগ্রাসী অভিঘাত নষ্ট হতো।

মৌলিকতার প্রসঙ্গ একটু আগে তুলেছিলাম, সেটা বলি। যিনি কেবলি সাইদের বইটি পড়েছেন, তাঁর চোখে বইটির ইমেজ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা যদি যত্ন করে যুদ্ধোত্তর ইউরো-মার্কিন-ফরাশি বুদ্ধিবৃত্তির খোঁজ নিই, দেখবো সাইদের অনেক আগেই এই ধরনের সমালোচনা-সাহিত্য পশ্চিমে সৃষ্টি হয়েছে। পাউল নিযানের 'দি ওয়াচ ডগ', সিজায়ারের 'ডিসকোর্স অন কলোনিয়ালিজম', ফ্রানৎস ফ্যাননের 'ব্ল্যাক স্কিনস, হোয়াইট মাস্কস', কাল্ডওয়েলের 'নোটস অন এ ডায়িং কালচার', কেইট মিলেটের 'সেক্সচুয়াল পলিটিক্স', কিংবা নোয়াম চমস্কির লেখাসমূহ বিবেচনায় রাখলে পর বোঝা যায়, মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তির শেকড়-বাকড় ঠিক কোথায়। পশ্চিমের লেখকদের রচনায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী মতাদর্শের অনুসন্ধান বহু পূর্বেই দেখা দিয়েছিলো। ষাটের দশকে এই ধরনের সমালোচনা ছিলো সাধারণ ব্যাপার; এ প্রসঙ্গে যোনা রাসকিনের 'দি মিথলজি অফ ইমপেরিয়ালিজম' বইটির কথা ঝট করে মনে পড়বে। আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো, সাইদ তাঁর বইতে একবারও উল্লেখ করেননি কলোনি-পর্বে লাতিন আমেরিকায়, এমনকি ভারতবর্ষে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সমালোচনায় যে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই প্রসঙ্গ। সাইদ 'উপনিবেশ'কে খারিজ করতে গিয়ে উপনিবেশ-পর্বের শিল্পী-মনস্বীদের সকল স্বাদেশিক সাংস্কৃতিক অর্জনকেও তুচ্ছ করেছেন। এইটে সাইদের বই ও তাঁর প্রতিপাদ্যের বড়ো এক অসঙ্গতি। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধি সংগ্রামসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যমও সাইদের চোখে 'ঔপনিবেশিক' ঠেকেছে।

তবে এডওয়ার্ড সাইদ যে মৌলিকতার দাবি করেন নি, সেটা ভালো হয়েছে। সাইদ লিখেছেন, তাঁর কথাবার্তাগুলো তাঁর আগে অনেকে বলেছেন— যেমন এ. এল. তিবাভি (১৯৬১, ১৯৬৬) আবদুল্লাহ লারোউ (১৯৭৬, ১৯৭৭) আনওয়ার আবদুল মালেক (১৯৬৩, ১৯৬৯) তালাল আসাদ (১৯৭৩) এস. এইচ. আলাতাস (১৯৭৭ ক, ১৯৭৭ খ), ফ্যানন (১৯৬৯, ১৯৭০) সিজায়ার (১৯৭২) পানিক্কার (১৯৫৯) ও রোমিলা থাপার

(১৯৭৫, ১৯৭৮)। তবে রবার্ট আরভিন যদি "অরিয়েন্টালিজম" বইয়ের সমালোচনায় সাইদের অনুল্লিখিত উত্তমর্ণদের কথা অতো কড়াভাবে না বলতেন, এই নামগুলো তিনি যুক্ত করতেন কিনা সন্দেহ আছে। তবে রোমিলা থাপার কিংবা কে. এম. পানিকারের উল্লেখ হঠাৎ করে বিসদৃশ আর অস্বাভাবিক মনে হয়। ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ বলতে সাইদ কি তবে কেবল এদেরই বোঝেন? তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতা উদ্বেগজনক।

সাইদ পুনঃপুনঃ বলেন পশ্চিমের 'এসেনশিয়ালিজমে'র কথা, অর্থাৎ পশ্চিম 'প্রাচ্য' বিষয়ে কিছু কিছু ধারণা কেবলি আরোপ করে, জোর করে বসিয়ে দেয়, অংশকে সমগ্র করে তোলে। এই দোষ পশ্চিমের চেয়ে সাইদের বেশি; কেননা তিনিও পশ্চিম বিষয়ে ওরকম 'এসেনশিয়ালিজম' তৈরি করেছেন— আরববিদ গিব-এর সঙ্গে কলোনির শাসক ক্রোমার, এডওয়ার্ড লেইনের সঙ্গে বালফোর, সুফীতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ম্যাসিগননের সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জার, এক পংক্তিতে স্থান পায় সাইদের বইতে। এ আসলে মিল নয়, গোঁজা মিল; এজাজ আহমদের ভাষায় 'অডিসিটি অফ কমবিনেশন'।

সাইদের চোখে পশ্চিমের জ্ঞান এজন্যে বাতিল যে, এই জ্ঞান আসলে 'ব্যাড নলেজ', পশ্চিমের জ্ঞানের লক্ষ্য 'প্রাচ্যের তুলনায় তারা কতোটা ভিন্ন', এবং ভিন্ন বলে 'উন্নত ও আলাদা'— তা প্রচার করা। পশ্চিমের আইডেনটি প্রাচ্যের তুলনায় ভিন্ন হওয়ার আইডেনটিটি, এটাই অরিয়েন্টালিজমের জন্ম দিয়েছে—এই হলো সাইদের মূল কথা। মূল কথাটি খুব ছোট আর সংক্ষিপ্ত বলে, সাইদের বইতে পুনরাবৃত্তির অক্লান্ত জোয়ার দেখা যায়।

ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদকে সাইদ মনে করেছেন 'ডিসকোর্সের' এক সমস্যা; অর্থাৎ উপনিবেশের সঙ্গে পুঁজি-সঞ্চয়নের যোগটাকে তিনি মূল্য দেন নি। এতেও তাঁর পাঠকেন্দ্রিক টেক্সচ্যুয়াল, পুঁথিবাদী, মনোভঙ্গি স্পষ্ট। তার চেয়েও বড়ো কথা, উত্তরাধুনিকদের মতো সাইদও মনে করেন, 'রিপ্রেজেন্টেশন' এক অসম্ভব ব্যাপার; সেই সঙ্গে ধরে নেন, পশ্চিম যখনই প্রচ্যের কথা বলবে, কিংবা লিখবে, তাতে 'প্রাচ্য' হীনতর হতে বাধ্য। প্রশ্ন হলো, রিপ্রেজেন্টেশন যদি অসাধ্য হয় তাহলে "অরিয়েন্টালিজম" বই লেখার দরকার কি? আর কেবল পশ্চিমই কি 'প্রাচ্য'কে হীনমন্য করে? প্রাচ্যও কি নিজেকে হীনমন্য করে তোলে না?

এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বিশ্বের পক্ষ্যাবলম্বন নয়। সাইদ খ্যাতিমান অধ্যাপক ও সমালোচক, এককথায় পশ্চিমের স্কলার; "অরিয়েন্টালিজম" বইয়ের গুণগুলোও সেই সূত্রে অর্জিত। এডওয়ার্ড সাইদের ভাষা বিশেষভাবে নিজস্ব, আবেগময়, সঞ্চারী। ভাষার এই নিজস্বতা সাইদকে বিশিষ্ট করেছে, এবং তাঁর বইটিকে অন্যরকম একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য নিয়ে তর্ক আছে, এবং থাকবে; কিন্তু সাইদের শৈলী ও কারুকাজ অপূর্ব।

জাক দেরিদা

আধুনিক পৃথিবীর মননজগতে সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন জাক দেরিদা। দেরিদার লেখাপত্র যুগপৎ হুমকি, দর্শনের মুক্ত বিকল্প, ত্রাস এবং ভরসা। দেরিদা পশ্চিমের অভ্যস্ত ও আবহমান চিন্তাপদ্ধতির যে সমালোচনা করেছেন, তা উন্নত বিশ্বের সেরা ভাবুকদেরও বিচলিত না করে পারেনি। 'চিন্তা'কে তিনি নিষেধাজ্ঞাহীন ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত করেছেন, আর বিপরীতে ভেবেছেন কেন্দ্রহীন, সজীব, অর্গলচ্যুত, স্বাধীন ভাববিশ্বের কথা। সেজন্যে দেরিদা একইসঙ্গে ত্রাস ও আতংক, ভরসা ও বরাভয়: ত্রাসের ভিতর দিয়ে তাঁর যাত্রা, এবং ওভাবেই তিনি মানবভাবনার উন্মুক্ত ডাঙায় পৌছুতে চান। এরই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, দেরিদার হস্তক্ষেপে আটলান্টিকের দুইপারের মনস্বিতা, বিগত দশকগুলোতে, অর্থপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হতে পেরেছে।

জাক দেরিদার চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি শুধুমাত্র সরল বাংলায় তাঁর বিরাট চিন্তাবিশ্বের একটা অকিঞ্চিৎকর পরিচিতি খাড়া করতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, আমার মাধ্যম সরল বাংলা গদ্য, অথচ আমার বিষয় জটিল জাক দেরিদা (মিশেল ফুকোও দেরিদাকে 'জটিল লেখক' বলেছেন)। তারপরও দেরিদাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার, কেননা বিভিন্ন বাংলা নিবন্ধ ও কলামে দেরিদার নামোল্লেখ আমার চোখে পড়েছে, কোথাও কোথাও চকিত এবং দু-চার বাক্যের ভাষ্যও দেখেছি: কখনো কখনো দেরিদা, কিংবা তাঁর মতো কারু কারু নামের তালিকা ও নামসজ্জা, এবং সেই সঙ্গে, নিবন্ধকারের সরল আমোদ ও তৃপ্তি নজর এড়ায়নি।

দেরিদার উত্থানপর্বে চিন্তার দৃশ্যপট এরকম : প্রবীণ মনস্বী লুইস আলথুসার বিকল; রোঁলা বার্থ, জাক লাঁকা ও মিশেল ফুকো মৃত; ষাটের ছাত্র আন্দোলনের পরিণতিতে যে আলোড়ন জেগেছিলো ফরাশি মনোলোকে, তা নিস্তেজ ও নিরুত্তাপ। এইরকম শূন্যতা ও নিস্তব্ধতার ভেতর জাক দেরিদার আবির্ভাব। গোড়া থেকেই দেরিদার চিন্তার ধরন আলাদা, সেজন্যে দেরিদার কাজ কেবল নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে গেলো ইংরেজিভাষী বিরাট দিগন্তে। মার্কিন দেশের সমালোচকেরা এখন ভাবতেই পারেন না যে, দেরিদাকে বাদ দিয়ে কোনো বই লেখা সম্ভব। তবে গভীরতায় তারতম্য আছে, উচ্ছ্বাস ও কান্ডজ্ঞান সর্বত্র মেলেনি; অন্যদিকে মৌলিকতা ও কৌশল একটা অপরটার বিকল্প হয়ে উঠেছে। সবাই বুদ্ধিবৃত্তিক সততা থেকে দেরিদার টেকস্টে ঢুকেছেন, সেটাও মনে হয়না ফলে দেরিদাকে কেন্দ্র করে ফ্যাশন ও দেখানোপনা, ফুটনোটপ্রীতি ও ফুটনোটস্ফীতি, স্বেচ্ছাচার ও আরোপন তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কিছুতেই ভুলে গেলে চলবেনা, জাক দেরিদা মূলত দার্শনিক এবং দর্শনের শিক্ষক ('দি ট্রায়াল' যে আবোল তাবোল কিছু নয়, এবং কাফকা যে জুরিসপ্রুডেন্সে ডক্টরেট[১], একথা কি আমরা সবসময় মনে রাখি?) কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমেরিকায় তাঁর প্রভাব

পড়েছে অন্যত্র—সাহিত্য সমালোচনায়। এটা এইজন্যে সমস্যা যে মার্কিন সমালোচকদের কেউ কেউ দর্শনে অভিজ্ঞ হলেও তাদের কাজের ক্ষেত্র মূলত সাহিত্য বা সংস্কৃতি বা সমালোচনা। দেরিদার দর্শনব্যাখ্যা সাহিত্যে সরিয়ে আনার ফলে অনেক ধরনের সরলীকরণ হয়েছে, তা মানতে হবে। সরলীকরণের ফলে দেরিদার দিকে ঝোঁক প্রবল হয়েছে অধিকাংশের, এবং দেখা দিয়েছে অগভীরতা, অরাজক স্বতঃস্ফূর্তি। বলা বাহুল্য, এর একটাও দেরিদার বাঞ্ছিত ছিলোনা। মার্কিনীরা তো দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন'কে এমন বস্তু করে তুলেছে যে, মনে হবে, এর প্রয়োগ যে কোনো হাতে যে কোনো ক্ষেত্রে সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। একই ঘটনা ব্রিটেনেও ঘটেছে; বার্নার্ড বারগনজি নামক এক ব্রিটিশ অধ্যাপক লিখেছেন, দেরিদার চিন্তাগুলো শৃংখলার সঙ্গে উপস্থাপনের প্রয়াস পর্যন্তও ইংল্যান্ডের বিদ্যাঙ্গনসমূহে দেখা যায় না।

দেরিদার সমর্থক এবং দেরিদার বিরোধি—দু'পক্ষই দেরিদার সরলীকরণ করেছেন। ইন্টারপ্রেটেশনের ক্ষেত্রে দেরিদা একটা শব্দ ব্যবহার করেন 'প্লে'; ডিকনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ-উন্মোচনকে তিনি নাম দেন 'অনন্তরঙ্গ' ; এই দুটো শব্দকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে দেরিদার সরলীকরণ করেছেন সমর্থক বা বিরোধিরা। ষাটের দশকে (১৯৬৬) আমেরিকায় একটা প্রবন্ধ[২] পড়েন দেরিদা 'মানববিদ্যায় গ্রন্থন, চিহ্ন ও খেলা'; সেই প্রবন্ধে দেরিদা টেকস্টের দুটো ব্যাখ্যার কথা বলেন: (ক) এমন ব্যাখ্যা যা উৎসের দিকে ধাবিত, যার লক্ষ্য নিহিতার্থসন্ধান ও সত্যাবিষ্কার; (খ) এমন ব্যাখ্যা যা উৎসবিমুখ, নিহিতার্থবিমুখ, সত্যবিমুখ—এই ব্যাখ্যা উন্মুক্ত, বয়ানের গ্রন্থনকলায় সীমাবদ্ধ, এবং কোনো মহৎ তাৎপর্যের খোঁজাখুঁজি এতে নেই। মার্কিন সমালোচকেরা এসব কথাকে আক্ষরিক অর্থে লুফে নেন, এবং তারপর সর্বত্র ডিকনস্ট্রাকশনের অর্থ ও অনর্থ বিচিত্ররূপে দেখা দিতে শুরু করে।

বিরোধিদের চোখে দেরিদার ইমেজ সম্পূর্ণরূপে নাস্তিখচিত; তাঁরা বলেন, দেরিদা অসাধারণ প্রতিভাবান ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার হলেও মূলত নাস্তিবাদী। দেরিদার নাস্তিবাদকে তাঁরা নাম দেন 'মহৎ প্রতিভার ট্রাজেডি'।[৩] বিরোধিরা দেরিদার বিপুল লেখাজোখাকে এড়িয়ে কেবল তাঁর কয়েকটি কথাকে বারবার উদ্ধৃত করেন, যেমন : 'দেয়ার ইজ নো সাচ থিং এজ পারসেপশন' (বোধ ও উপলব্ধি ব'লে কিছু নেই); 'রাইটিং ইজ প্রায়র টু স্পিচ, (' কথন' নয়, 'লিখন'ই গুরুত্বপূর্ণ); 'দেয়ার ইজ নাথিং আউটসাইড দা টেকস্ট' (টেকস্টই সব, তার বাইরে কিছু নেই)। এগুলোকেই সমর্থক এবং বিরোধিরা, পক্ষে এবং বিপক্ষে, ব্যবহার করেন। দেরিদার 'প্লে' কথাটিকে বুঝবার চেষ্টা হয়েছে 'ইন্টারপ্রেটেশন উইদাউট কনক্লুশন' বলে; অর্থাৎ যে-ব্যাখ্যায় কোনো মীমাংসা নেই সেটাই দেরিদার 'প্লে'। এর ফলে একদিকে দর্শনের টেকস্টকে সাহিত্যের টেকস্টরূপে পাঠ করার রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে সেই টেকস্টে উৎকণ্ঠিতভাবে খোঁজা হয়েছে দুর্বোধ্যতা, অন্তর্বিরোধ, প্যাঁচ। তবে এসব ক্ষেত্রে দেরিদার নিজের দায় একেবারেই নেই তা বলা মুশকিল: সাহিত্য ও দর্শনের সীমানা পেরোতে তিনি নিজেও প্রলুব্ধ করেছেন। যেমন দেরিদার একটা লেখার নাম 'দি পোস্টকার্ড,' একে কি দর্শন বলা যাবে? এ কি দর্শনের ছদ্মবেশে নিরীক্ষামূলক সাহিত্য নয়?[৪] দেরিদার 'টেক্সচুয়ালিটি' যে 'রিয়ালিটি'কে হজম করে ফেলে, সেটাও এখন স্বীকৃত।

দেরিদার বিনাশবাদও অনেকের আকর্ষণের উৎস। দেরিদার নির্মাণ-উন্মোচনকে এদের মনে হয়েছে আকর্ষণীয় অর্থনাশী প্রক্রিয়া, এবং সে অর্থে দেরিদা দর্শনবিরোধি দার্শনিক। অন্যপক্ষ তাঁকে ভেবেছেন 'ট্রু ফিলসফার' হিশেবে। তাঁদের মতে, দেরিদা এমন একজন দার্শনিক যিনি দর্শনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার বৃত্তে কাজ করেছেন, যদিও তাঁর ভাষা এবং পদ্ধতি ভিন্ন, যদিও তাঁর কৌশল অভিনব এবং আলাদা। দেরিদাকে যাঁরা 'সত্য দার্শনিক' মনে করেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য: বার্নার্ড হ্যারিসন, পিটার ডিউস ও ক্রিস্টোফার নরিস[৫]। মার্কিনীরাই মূলত দেরিদাকে 'অর্থনাশী' ইমেজে দেখতে উৎসুক, তারাই প্রবল পরাক্রমে দর্শন ও সাহিত্যের সীমারেখা অগ্রাহ্য করেছেন, তারাই দেরিদার অর্থনাশকতার কিংবদন্তী তৈরি করেছেন এবং সেটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করেছেন।

জেফ্রি হার্টমান দেরিদার মার্কিন ভাষ্যকার; হার্টমান দেরিদাকে ব্যবহার করেন সর্বত্র, কখনো স্বীকার করেন, কখনো অস্বীকার: কখনো অভিযুক্ত করেন, কখনো অভিনন্দিত। হার্টমানের উল্লেখযোগ্য বই—'সেভিং দা টেকস্ট : লিটারেচর/দেরিদা/ফিলসফি'। এ বইতে হার্টম্যানের দেরিদার সম্পর্ক দ্বন্দ্বময়: একদিকে দেরিদাকে অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে প্রতিরোধ। হার্টমানের সঙ্গে লেখার এই এক ভঙ্গি, এটা যেন তিনি এড়াতে চান না বা পারেন না। হার্টমান সচেতনভাবে দর্শন, সাহিত্য ও সমালোচনার সমস্ত সীমারেখা এলোমেলো করেছেন। অনেকসময় তাঁর বই ফিকশনের মতো লাগে। বইয়ের লেখকের মতো পাঠকও যেন তিনি নিজে, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কোনো ইচ্ছা যার নেই।

এ্যালান মেগিলও[৭] বই লিখেছেন দেরিদা বিষয়ে; কিন্তু হার্টম্যানের চেয়ে মেগিল অনেক বেশি সিরিয়াস। তাঁর বইয়ের নাম : 'প্রফেটস অফ এক্সট্রিমিটি— নীটশে, হাইডেগার, ফুকো, দেরিদা'। মেগিল দেরিদাকে ভেবেছেন নীৎশের আধুনিকতম সম্প্রসারণ; সেজন্যে দেরিদাকে তিনি 'দার্শনিক' না বলে, বলেন 'দর্শনশিল্পী'[৮]। নীৎশে এই জগতকে একটা শিল্পকর্মরূপে কল্পনা করেছিলেন; দেরিদার প্রথমদিককার কাজে চোখ বুলালেও দেখা যায় ফরাশি মালার্মে, বার্তিল্লি, সোলারস, ব্লানশটের মতো কল্পনাশীল লেখকেরা তাঁকে আমূল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এঁদের লেখা পাঠকালে সাহিত্য ব্যাপারটা দেরিদার মনে প্রশ্ন তোলে। মেগিল বলতে চান, থিসিস-এন্টিথিসিস-সিনথিসিসের পর চতুর্থ মাত্রা যোগ করেছেন দেরিদা, যার নাম 'ডিকনস্ট্রাকশন'[৯]। মালার্মে এবং নীৎশের কাছে দেরিদার ঋণ অনিঃশেষ, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে মেগিল তা আমাদের মনে করিয়ে দেন। দেরিদা ও নীৎশে দু'জনেই দর্শনের শিল্পী, দেরিদা দর্শনের চেয়ে বেশি সৃষ্টি করেছেন শিল্প; মেগিল[১০] দেরিদার 'গ্লাস' নামের রচনাকে জেমস জয়েসের 'ফিনেগানস ওয়েকে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, আরগুমেন্টের চেয়ে শব্দের খেলা ও অবাধ ভাবানুষঙ্গ দেরিদার বেশি প্রিয়। দেরিদা বা নীৎশে-কে মেগিল 'দর্শনশিল্পী' বলছেন কেন? মেগিল বলতে চান, সনাতন দর্শনের কাজ ছিলো সত্যকথন ও সত্যসন্ধান, আর দর্শনশিল্পের লক্ষ্য সত্য নয়, বাস্তবতার ব্যাখ্যা; সে ব্যাখ্যা যতোটা কাল্পনিক ততোটা দার্শনিক নয়। দর্শনশিল্পীরা আমাদের বোধের জগতে তোলপাড় তুলতে চান; নীৎশে একভাবে, দেরিদা আরেকভাবে। মেগিলের ভাষ্যে 'দর্শনশিল্পী' হয়ে ওঠেন 'চরমতার

নবী'। দর্শনশিল্পীদের কাজ একেকটা দর্পণের মতো, তারা আমাদেরই মুখচ্ছবি তাতে তুলে ধরেন; আমরা দেখি মুখচ্ছবিগুলো বদলে যাচ্ছে দর্পণে, কিন্তু সেই বদলের ব্যাকরণ অজ্ঞাত থাকে না।

জাক দেরিদা আসলে বিভিন্ন মুখোশ ব্যবহার করে গেছেন ক্রমাগত; তাঁর মুখোশকেই অনেকে ভেবেছেন মুখ। দেরিদার সমালোচনাকে সেজন্যেই হালকাভাবে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেরিদা যে মোটেও 'জোকার' নন, (যেরকম মেগিল বলতে চেয়েছেন) তা তাঁর একটা সাক্ষাৎকার থেকেও বোঝা যায়। ১৯৮৪ সালে আইমরে সালুসিনস্কিকে[১১] দেয়া এক সাক্ষাৎকারে দেরিদা বলেন :

> 'আমি নিশ্চয়ই এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকালতি করবো না, যা সমাজবিচ্ছিন্ন। কেননা আমরা জানি, ছাত্রদের পড়াতে হবে, এবং সেই পড়া অবশ্যই হবে পেশামুখী। প্রফেশনালাইজেশনের কিছু কিছু ব্যাপার অগ্রহণযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় যা শেখাবে তার সঙ্গে প্রফেশনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। শিক্ষার মধ্যে দিয়েই ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক তৈরি হবে, এবং আমরা চাইবো যাতে এইসব বিষয়ে বিদ্যার্থীদের মনে জিজ্ঞাসাও জাগে, যাতে তাদের মধ্যে প্রশ্ন করার অভ্যেস দেখা দেয়; ক্রিটিকাল পদ্ধতিতে নয় হয়তো, কিন্তু ডিকনস্ট্রাকটিভ পদ্ধতিতে। কাজেই এভাবে শিক্ষার মাধ্যমে দুটো দায়িত্ব পালিত হতে পারে, এবং এ দুটো পরস্পরবিরোধী নয়। আমার নিজের কথাই ধরি : আমি ছাত্রদের শেখাই, এবং সেটা পেশামুখী শিক্ষা; একইসঙ্গে আবার দেখিয়ে দিই প্রফেশনালাইজেশনের কি সমস্যা, কোথায় সমস্যা।'

এইসব কথা শুনে বা পড়ে কি মনে হয়? দেরিদার সারকথা কি নাস্তিবাদ? কেবলি নাস্তিবাদ? কেবলি বিরাট-বৃহৎ একটা 'না'? ডিকনস্ট্রাকশন কি নিছক তামাশা? দেরিদা কি সেই অর্থেই 'প্লে' শব্দটি ব্যবহার করেন, যেমন একদা আর্নল্ড বলতেন 'ফ্রি প্লে অফ দি মাইন্ড'?

তবে দেরিদাকে সিরিয়াসভাবে যারা 'দার্শনিক' মনে করেন, তাঁরা তাঁকে হয় গ্রহণ করেন, অথবা বর্জন। যেমন জন সিরেল[১২]; তিনি দেরিদাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনের পক্ষপাতী। সিরেল তো একটা লেখায় দেরিদার সঙ্গে দারুণ এক ঝগড়াও বাঁধিয়েছেন। সিরেলের মতে, দেরিদা তাতেই জোর দেন যা 'অবধারিত মিথ্যা'। দেরিদাও পাল্টা মন্তব্যে বলেন, সিরেল বলতেই পারেন এ ধরনের কথা, কেননা তিনি খুব সরল আর সীমাবদ্ধ। সিরেলও পুনরায় আক্রমণ করেন দেরিদাকে, জোনাথন কুলারের 'অন ডিকনস্ট্রাকশন' গ্রন্থের রিভিয়্যুতে; বলেন, দেরিদার এই মত একেবারেই ভ্রান্ত যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সবসময় 'লেখা'র ওপর 'কথা'কে গুরুত্ব দিয়েছে। সিরেল ব্যঙ্গ করে এ-ও বলেন, দেরিদার লেখার যা ভঙ্গি, তা দিয়ে যে কোনো কিছু যে-কোনোভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায়। দেরিদা তো বারবার এটাই বলতে চান, 'বাচন' হলো মূলত 'লিখন', এবং 'কথা' গৌণ, 'লেখা' প্রধান; আর এ ধরনের মন্তব্য অনেকটা এইরকম, 'ধনী' হলো মূলত 'গরিব', 'সত্য' হলো মূলত 'মিথ্যা', 'সাধু' হলো মূলত 'শয়তান' ইত্যাদি।

ক্রিস্টোফার নরিস জন সিরেলের মতো নন; নরিস একেবারেই দার্শনিক ভাষায় দেরিদা সম্পর্কে লিখেছেন। ক্রিস্টোফার যদিও ইংরেজির শিক্ষক, তবু তাঁর দার্শনিক আলোচনা এবং আলোচনার দার্শনিকতা যথেষ্ট ওজনদার। নরিস সিরেলের বিপরীত; তাঁর মতে দেরিদা সত্যিকার একজন দার্শনিক, যিনি অসামান্য প্রতিভায় দর্শনের প্রধান প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। নরিসের দেরিদা-পাঠ একেবারেই ভিন্ন; তাঁর মতে, মার্কিন সমালোচকেরা দেরিদার ইমেজটাকেই বদলে ফেলেছেন; দেরিদা তো একজন 'জেনুইন ফিলসফার', অন্তত 'আর্টিস্ট ফিলসফার'; দেরিদা আর যাই হোন, অযৌক্তিক কেউ নন, যদিও মার্কিনীদের কাছে যুক্তিশীল দেরিদার চেয়ে যুক্তিহীন দেরিদা অধিকতর প্রিয়। নরিস মুগ্ধ হন দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন ও অর্থবোধের বহুবাচনিকতায়, বয়ান-পাঠ এবং দ্যোতক-দ্যোতিতের মুক্ত উল্লম্ফনে, 'লেখক' নামক পুরাণের চরম অব্যবস্থায়। নরিসের মতে দেরিদা দেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে প্লেটো থেকে 'হুর্সেল' পর্যন্ত দার্শনিকেরা 'রূপক' আর 'যুক্তি'র তফাত বোঝেন নি, কিভাবে তাঁরা 'রেটরিক'-কে 'রিজন' বলে ভুল করেছেন। কিন্তু তাই বলে দেরিদা সব 'ধারণা'কে 'রূপক' বলেন নি; তিনি আসলে যুক্তির নিয়মের ভেতর যে সীমাবদ্ধতা আছে বা থাকে, সেটাকেই ভাবনার বিষয় করে তুলতে চান[১৩]। যুক্তি সীমাবদ্ধ, যুক্তির নিয়মও সীমাবদ্ধ; ডিকনস্ট্রাকশন এই সীমাবদ্ধতার সূত্রগুলো উন্মোচন করতে চায়। যুক্তির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার অর্থ পশ্চিমের দর্শনের সমালোচনা এবং পশ্চিমের আলোকপর্বের বিরোধিতা; এইভাবে দেখলে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন বোঝা যাবে, অন্যভাবে নয়।

ক্রিস্টোফার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল দেরিদার প্রতি; সহানুভূতির কারণে তিনি দেরিদার টেকস্টের অনেক গভীর-ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। নরিসের 'ডিকনস্ট্রাকশন : থিওরি এন্ড প্রাকটিস' পড়লে বোঝা যায়, কতো আবেগ আর যত্নের সঙ্গে; কতো অন্তরঙ্গভাবে, দেরিদার প্রকল্পের রাশি-রাশি দরোজা-জানলার সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। নরিসকে তাই দেরিদার বিশ্বস্ত শিষ্যই মনে হয়: কেননা দেরিদার টেকস্টের হাজার জটিলতা ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তিনি খুঁজে বেড়ান ওই বয়ানের সেই জিনিশ, যাকে বাংলায় আমরা 'মর্মবাণী' বলি। নীৎশে ও দেরিদার লেখা থেকে এই 'মর্মবাণী' উদ্ধার করেছেন ক্রিস্টোফার নরিস।

তবে দেরিদা বিষয়ক আলোচনা এ ক'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আরো অনেকে দেরিদা বিষয়ে লিখেছেন এবং লিখছেন। আমেরিকায় দেরিদার ভক্তদের হিশেব রাখাও শক্ত। মিখাইল রায়ান 'ডিকনস্ট্রাকশনে'র সঙ্গে মার্কসিজমের যোগ সম্ভব কিনা ভেবেছেন; এডওয়ার্ড সাইদ একে নাম দিয়েছেন 'নাস্তিবাদী ধর্মতত্ত্ব', আর নিকোলাস ট্রেডেল 'ডিকনস্ট্রাকশন'কে ভেবেছেন 'নাগার্জুনী বৌদ্ধবাদের'[১৪] আরেক রূপ।

দেরিদা এই শতাব্দীর সেই চিন্তাবিদ, যিনি অর্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন সবসময়, অথচ তাঁর টেকস্টের অর্থসন্ধানে তাত্ত্বিকেরা অক্লান্ত; সবসময় 'মাস্টারি'র বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, অথচ তিনিই হয়ে উঠলেন উত্তরাধুনিক যুগের অনেক বড়ো মাস্টার।

দুই

এ তো গেলো সমালোচকদের বিভিন্ন মত কিংবা মন্তব্য। কিন্তু দেরিদার ডিসেমিনেশন-ডিফারেন্স বুঝবো কি করে? এমন তো হতেই পারেনা যে, পশ্চিমের ডিসকোর্স বিষয়ে দেরিদা কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, আর অমনি এদিক-ওদিক বিতর্ক বেঁধে গেছে। আসল কথা হলো, জাক দেরিদা পশ্চিমের পরমতত্ত্বের প্রচন্ড প্রতিপক্ষ; দেরিদার হস্তক্ষেপে পরমতত্ত্ব ও তার উত্তরাধিকার সংকটাপন্ন।

জাক দেরিদা পশ্চিমের দর্শনকে বিবেচনা করেছেন প্রাক্-গৃহীত, পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বচিন্তিত ধারণার সম্প্রসারণ হিশেবে; প্রাকগৃহীত ধারণার এই সম্প্রসারণকেই দেরিদা 'মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স' বলেন, অর্থাৎ উপস্থিতির পরাতত্ত্ব। অর্থাৎ জগত, সংসার, জীবনও টেক্স্ট আগে-থেকে-ধরে-নেওয়া ধারণার ভিত্তিতে চিন্তা ও বিচার করা। বলা বাহুল্য, দেরিদার দৃষ্টিতে একটি গ্রন্থ যেমন পাঠ করা যায়, এই 'পৃথিবী' এবং তার 'জীবন'ও একেকটা টেক্স্ট: গ্রন্থের টেক্স্ট যেমন পাঠ করা যায়, পৃথিবী বা জীবনের টেক্স্টও তেমনি পাঠ করা যায়। দেরিদার ভাবনা টেক্স্ট এবং তার পাঠ এবং পাঠের স্ট্রাটেজি নিয়ে। দেরিদা বলতে চান, বিশ্লেষক সীমাবদ্ধ থাকবেন টেক্স্টে, এবং টেক্স্টের বাইরে তাঁর যাওয়া চলবেনা, কেননা টেক্স্টের বাইরে কিছু নেই, যদি থাকেও সেটা টেক্স্ট নয়, অন্যকিছু, এই 'অন্যকিছু'কে তিনি মেটাফিজিক্স বা পরাতত্ত্ব বলেছেন। আমাদের পাঠাভ্যাস টেক্স্ট চালিত এবং টেক্স্ট-শাসিত নয়, বরং টেক্স্টচ্যুত অর্থাৎ পরাতাত্ত্বিক। পশ্চিমের দর্শনের দীর্ঘ বয়ানকলা এই পরাতত্ত্বের শাসনে চিরকাল চালিত হয়েছে। 'ডিকনস্ট্রাকশন' সেদিক থেকে টেক্স্টে ফেরার উদ্দীপক আহবান। কিন্তু 'টেক্স্ট'কে আমরা যদি মনে করি 'কনস্ট্রাকশন', তাহলে তার 'ডিকস্ট্রাকশন' কেন? এই জন্যে যে, কোনো টেক্স্টই 'কনস্ট্রাকশনে'র দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়, কারণ, দেরিদা বলেন, 'রিপ্রেজেন্টেশন' ব'লে যে-বস্তুর কথা আমরা শুনে এসেছি, সেটা এক অসম্পূর্ণ মানবিক উদ্যাম—কেননা টেক্স্টের 'রিপ্রেজেন্টেশন' কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না, এবং হওয়ার দরকারও নেই। সূর্যাস্তশতকী বিকলতায় অর্থের সেই 'গ্রান্ড অর্থরিটি' নষ্ট হয়ে গেছে। ডিকনস্ট্রাকশনের মধ্যে তাই অর্থের কোনো অঙ্গীকার নেই; ডিকনস্ট্রাকশন তাই টেক্স্টে ঢুকে পড়ার একটা আবেদন এবং অভিসন্ধি।

তবে নতুন দর্শন প্রস্তাব করার জন্যে, জাক দেরিদা, পশ্চিমের দর্শনের সমালোচনা করেন নি। 'জ্ঞান' 'ইতিহাস' 'চৈতন্য'—এগুলো পরাতাত্ত্বিক দর্শনের বিভিন্ন দরোজা-জানালা, দেরিদার মতে এগুলোর বাইরে যাওয়া একান্ত দরকার। দেরিদা নিজেই বাইরের পথে গেছেন, এবং বাইরে গিয়ে প্রথম সমালোচনা করেছেন হিউম্যানিজমের, এবং লিখেছেন 'দি এনডস্ অফ ম্যান'।[১৫] পরাতত্ত্বের বিনাশ ও দর্শনের মৃত্যুর পটভূমিকায় দেরিদার বিনির্মাণবাদী শোভাযাত্রা চিত্তাকর্ষক। দেরিদা কেন বলেন ডিফারেন্স এবং ডিকনস্ট্রাকশনের কথা? সমাধানের জন্যে? নিরাকরণের জন্যে? নিশ্চয় নয়। দেরিদা জানাতে চান, কেন একটা সমাধান প্রহেলিকা হয়ে ওঠে, কেন 'সমাধানের চেষ্টা' নিজেই একটা বড়ো সমস্যা।

হাইডেগার, দেরিদা ও ফুকোর মনোভঙ্গি তখনই বোঝা যাবে, যখন দেখবো এঁরা মূলত দার্শনিকদের রচিত ও অতিরঞ্জিত মানবতাবাদের কঠোর সমালোচনা করতে চেয়েছেন। 'হিউম্যানিজম-'এ প্রাধান্য থাকে 'ম্যান'—এর; 'ম্যান'— ব্যক্তি বা পুরুষই মানবতাবাদের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। সেজন্যে হিউম্যানিজমকে তাঁদের মনে হয়েছে 'ইন-হিউম্যান'। সেজন্যে কান্টকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে মানবতাবাদী ভাবতে পারেন নি, কেননা কান্টের সকল প্রত্যয়ের মূলেও আছে এই 'ম্যান'। কান্টের এই মানুষ (পুরুষ) কেন্দ্রিকতাকে ফুকো ব্যঙ্গ করে বলেছেন 'নৃতাত্ত্বিক' নিদ্রা'; তার কারণ 'মানুষ কি'—এই চিন্তা দিয়ে কান্টের দর্শন শুরু হয়েছে, আর এ হলো একধরনের নৃতাত্ত্বিক চিন্তা। তবে পোস্টস্ট্রাকচারালিস্টরা মানবতাবাদের সমালোচনা করতে পেরেছেন হাইডেগারের টেকস্ট ব্যবহার করে। হাইডেগারের সঙ্গে প্রবল একটা বিরোধ রয়েছে সার্ত্রের; হাইডেগার চেতনা ও মনুষ্যতার যে সমালোচনা করেছেন, উত্তরগ্রন্থনবাদীদের তা বেশ কাজে লেগেছে[১৬]।

গ্রান্ড থিওরি বা পরমতত্ত্বের লক্ষ্য ছিলো মানবতাবাদ; পরমতত্ত্বের দার্শনিকেরা অনবরত চেতনার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, এবং তাঁরা 'চেতনা'কে সকল বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে হাইডেগারের উত্তরসাধকেরা চেয়েছেন 'চেতনা'র স্থানে 'টেক্স্ট'কে বসাতে; তাঁদের কাছে মন্ময় চৈতন্যবাদের বিপরীতে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষিক সংগঠন ও সামাজিক অনুশীলন। হাইডেগার দার্শনিক মানবতাবাদের (সার্ত্র) সমালোচক, কারণ তা পরাতাত্ত্বিক, কারণ তার কেন্দ্রে আছে 'ম্যান' (ওম্যান নয়) তাছাড়া সার্ত্র এবং তাঁর অনুগামীরা চেতনাকে নির্ণায়ক মনে করেছেন এবং তাঁদের মনে হয়েছে : 'মানুষ ঈশ্বর হতে চায় এবং ঈশ্বর হতে পারে। এইসব ধারণা হাইডেগার ও উত্তরগ্রন্থনবাদীদের দৃষ্টিতে চরম মেটাফিজিক্যাল, তাই ব'লে এঁরা এন্টি হিউম্যানিস্ট নন। এঁদের বক্তব্য হলো প্রথাগত হিউম্যানিজম 'ম্যানকে' মাথায় তুলেছে, এইটেই ইনহিউম্যান। পুরুষপূজোর এই কেন্দ্র তাঁরা ভেঙ্গে দিতে চান। দেরিদা ফুকোর কাম্য, সাবজেকটিভিটির নির্মূলন; সে সাবজেকটিভিটি 'চৈতন্যে'র আকারে হোক কিংবা মানবতাবাদের চেহারায়, কিংবা প্রগতিবাদী বিশ্বাসে কিংবা ইতিহাসআশ্রয়ী কোনো উত্তরণবাদী ধারণায়। 'জ্ঞান' বস্তুটাকে দেরিদা সন্দেহ করেন। কেননা জ্ঞানের ভেতর ইমানুয়েল কান্টের মতো অতোটা আলো, ওরকম চৈতন্য, অমন প্রগতি, তিনি দেখেন না। সেজন্য দেরিদা নতুন জ্ঞান উপহার দেন না, জ্ঞানের একটি ভিন্ন আকরণ উপস্থিত করেন মাত্র। হেগেল বা কান্ট বা পরমতত্ত্বের অন্যান্য ভাবুকের তিনটি বিশ্বাস বোধ হয় ছিলো : (ক) চেতনার অনুকম্পায় মানুষ অনেকদূর এগোবে : (খ) জ্ঞান অবশ্যই আলোকময় ও প্রগতিশীল :(গ) মানুষ, তার চেতনা ও ইতিহাস প্রগতির দিকে ধাবমান। বলা বাহুল্য তিনটির একটিতেও দেরিদার আস্থা নেই[১৭]।

এতো কথার পরও, এইটে কিন্তু বোঝা গেলোনা দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন' আসলে কি? ডিকনস্ট্রাকশন ব্যাপারটাতেই দেরিদার চিন্তার গড়ন ধরা আছে। দেরিদা শুরু করেছেন স্যোসুর থেকেই। যদিও স্যোসুরকে ফেলে অনেকখানি দূরে তিনি দাঁড়িয়ে। স্যোসুরের স্ট্রাকচারালিজম (গ্রন্থন-আকরণবাদ) তাই প্রথমে আলোচনা করা দরকার। স্ট্রাকচারালিজম

তো এমনিতে বহুক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে; কেননা যেসব তত্ত্ব কোনো কিছুর সংগঠন নিয়ে কথা বলে, তাই স্ট্রাকচারলিজমের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই পর্বতের সংগঠন নিয়ে যারা চিন্তা করেন তারাও স্টাকচারালিস্ট। তবে সমালোচনার ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারালিজম এসেছে স্যোসুরের সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব থেকে। স্যোসুরের সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যারা ব্যবহার করেছেন তারা সাংগঠনিক সমালোচক স্যোসুর কথা বলেছেন ভাষার সংগঠন নিয়ে, আর সাংগঠনিক সমালোচকেরা কথা বলেছেন টেকস্টের সংগঠন বিষয়ে। স্যোসুর যে ভাষা-সিস্টেমের কথা বলেছেন, যেভাবে বিভিন্ন ভাষিক ও বাচনিক একক নির্দেশ করেছেন, সাংগঠনিক সমালোচকেরাও তেমনি টেকস্টের একক এবং এককগুলোর সমবায়ী প্রয়োজনার কথা বলেছেন[১৮], সাংগঠনিক সমালোচকেরা তিনটি বিষয়ে খুব মনোযোগী :

ক, এককগুলো কি?

খ, কোন সম্মিলনের ফলে এই এককগুলো অস্তিত্বমান?

গ, কেন এককগুলো একধরনের নিয়মে কার্যকর, অন্যধরনের নিয়মে নয়?

স্ট্রাকচারালিজমের বিকাশ ঘটে বিচিত্রভাবে, বিচিত্রদেশে। স্ট্রাকচারালিজমের পর দেরিদা কিংবা বার্থ প্রমুখের পোস্টস্ট্রাকচারালিজমের উদ্ভব থেকেও স্ট্রাকচারালিজমের শক্তি-প্রতিপত্তি আন্দাজ করা যায়।

স্ট্রাকচারালিজমের প্রথম ঘরানা 'জেনেভা স্কুল' নামে পরিচিত, এর প্রতিষ্ঠাতা সংগঠনবাদের আদিগুরু ফের্দিন দ্য স্যোসুর। স্যোসুরের 'কোর্স ইন জেনারেল লিংগুইস্টিকস' (১৯১৬) সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। জেনেভা স্কুল ভাষা বিষয়ে একটা মৌলিক এবং বিপ্লবাত্মক তত্ত্ব প্রস্তাব করে। বিষয়বস্তু হলো : এতোদিন পর্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিকেরা কেবল লক্ষ করেছেন ভাষা কিভাবে বদলায়, কিন্তু ভাষার সিস্টেম বিষয়ে তাদের কোনো উদ্ভাবনা নেই। জেনেভা স্কুল দেখালো ভাষার বিভিন্ন অংশ কিভাবে একত্রিত হয় এবং অতঃপর একটা সিস্টেম তৈরি করে। জেনেভা স্কুলের ভাষাতত্ত্ব ক্রমশ সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার মডেল হিশেবে গুরুত্ব পায়। জেনেভা স্কুলের স্ট্রাকচারালিজমের প্রভাবে রুশ-ফর্মালিজমের উদ্ভব ঘটে (স্মরণীয়, কারচেভসকিয জেনেভায় স্যোসুরের ছাত্র ছিলেন এবং মস্কোতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের নিকট স্যোসুরের ভাষাতত্ত্ব ছড়িয়ে দেন তিনি (১৯১৭))। রুশ ফর্মালিজম অংশত এভাবেই দেখা দেয়। বিশের দশকে গড়ে ওঠা মস্কো-লেনিনগ্রাদের রুশ রূপবাদের বক্তব্য ছিলো, ভাষা কিভাবে কাজ করে সাহিত্যে, কি ভাবে সাহিত্যের টেকস্ট ও তার ঐতিহ্য 'সিস্টেমে'র ভূমিকা পালন করে। রুশ ফর্মালিজম প্রসঙ্গে মনে পড়বে কয়েকটি বই এবং এগুলোর অবদানের কথা; আইশেনবাউমের 'দি থিউরি অফ দি ফরমাল মেথড' (১৯২৬)রোমান ইয়াকবসনের 'দি নিউ রাশ্যান পোয়েট্রি' (১৯২১), প্রপের 'মরফোলজি অফ দি ফোকটেল' (১৯২৮) শকশ্লভস্কির 'আর্ট এজ টেকনিক' (১৯১৭); তিনযানভের 'অন লিটারেরি এভোলিউশন' (১৯২৯)। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, রুশ-ফর্মালিজমের বিরাট ব্যাপ্তির মূলে ছিলেন রোমান ইয়াকবসন; মস্কোতে তাঁর 'দি নিউ রাশান পোয়েট্রি' (১৯২১) প্রকাশিত হয়, এরপর তিনি প্রাগে গিয়ে রুশভাষার ধ্বনিসংগঠন বিষয়ে বই লেখেন (১৯২৯), অতঃপর প্রাগ ত্যাগ [illegible] (১৯৩৯), এবং অবশেষে আমেরিকায় (১৯৪১)। আমেরিকাতে ইয়াকবসনের [illegible]

'সিক্স লেকচারস অন সাউন্ড এণ্ড মিনিং' (১৯৪২-১৯৪৩); অবশ্য এই বক্তৃতামালা ছাপা হয় অনেক পরে, ১৯৭৬ সালে।

স্যোসুরের সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অপরূপ বিকাশ ঘটেছে ইয়াকবসনের হাতে, এবং রুশ রূপবাদের মধ্যে দিয়ে। রোমান ইয়াকবসনের মতো প্রতিভাবান উত্তরসূরী না পেলে স্ট্রাকচারালিজমের অমন বিকাশ ঘটতে পারতো না; অন্তত লেভি-স্ত্রোসের মতো স্ট্রাকচারালিস্ট নৃবিজ্ঞানী পাওয়া যেতোনা। মনে রাখা দরকার ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস রোমান ইয়াকবসন থেকে ধ্বনিসংগঠনতত্ত্ব শিখেছিলেন, প্যারিসের ইকোলোতে এঁরা দুজনেই ছিলেন সহকর্মী।

কাজেই ১৯৪৫ সালে লেভি-স্ত্রোসের 'স্ট্রাকচারাল এনালাইসিস ইন লিংগুইস্টিকস এন্ড এনথ্রোপলজি'-র প্রকাশ বিস্ময়ের উদ্রেক করেনা। প্যারিসে স্যোসুর-ইয়াকবসনের ভাষা/ধ্বনিতত্ত্বের সাংগঠনিক বিশ্লেষণপদ্ধতি সংস্কৃতির বিভিন্ন ফর্ম বুঝবার জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় দুই দশক এর মতো সময়কাল (১৯৫০-৭০)। সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত কিছু বিখ্যাত বইয়ের নাম আলথুসারের 'লেনিন এন্ড ফিলসফি' (১৯৭১) রোঁলা বার্থের 'মিথলজিস' (১৯৫৭) মিশেল ফুকোর 'দি অর্ডার অফ থিংস' (১৯৬৬) জাক লাকাঁর 'ফাণ্ডামেন্টাল কনসেপ্টস অফ সাইকোএনালাইসিস' (রচনা ১৯৬৪ প্রকাশ ১৯৭৩), এবং ক্লোদ লেভি-স্ত্রোসের 'স্ট্রাকচারাল এন্থ্রোপলজি' (১৯৫৮)। কিন্তু স্ট্রাকচারালিস্ট সমালোচকেরা ক্রমশ লক্ষ করলেন যে ভাষা কিংবা সংস্কৃতির গ্রামার, কোড বা সংকেত সুস্থির নয়, অস্থির; এই উপলব্ধির ফলে তাঁরা স্টাকচারালিজম থেকে সরে যান, এবং এক বিকল্প বিশ্লেষণে উপনীত হন, যার নাম পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা উত্তর-আকরণবাদ। দার্শনিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই স্ট্রাকচারালিজম-বিরোধিতার সূত্রপাত, আর এর সূত্র হলো 'ইনসট্যাবিলিটি অফ কোডস' বা সংকেত-ব্যবস্থার অস্থিরতা। আমেরিকায় উত্তর-গ্রন্থনবাদ সংস্কৃতিতত্ত্ব ও সমালোচনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে, এবং কয়েকটি গ্রন্থকে মনে করা হয় এর তাত্ত্বিক প্রতিভূ : রোঁলা বার্থের 'এস /যেড' (১৯৭০) জাক দেরিদার 'অফ গ্রাম্মাটোলজি' (১৯৬৭) মিশেল ফুকোর 'এ হিস্ট্রি অব সেক্সচ্যুয়ালিটি' (১৯৭৬) ফ্রেডরিক জেমসনের 'দি পলিটিকাল আনকনশাস' (১৯১৮) জুলিয়া ক্রিস্তেভার 'রেভ্যুলউশন অফ পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ' (১৯৭৪) এবং এডওয়ার্ড সাইদের 'দি ওয়ার্ল্ড দি টেকস্ট এন্ড দি ক্রিটিক' (১৯৮৩)।

স্যোসুর লক্ষ করেছেন শব্দের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় 'ভাষা', এই শব্দকে তিনি নাম দেন 'সাইন' বা চিহ্ন ; অতপর স্যোসুরের দৃষ্টিতে ভাষার অর্থ দাঁড়ালো, 'সাইন-সিস্টেম' বা চিহ্ন-ব্যবস্থা। স্যোসুর 'চিহ্ন'-কে (সাইন) নির্দেশ করলেন দুটো বস্তুর সমন্বয়রূপে (ক) সাউণ্ড প্যাটার্ন অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দরূপ : এটা তার মতে সিগনিফাইয়ার বা বাচক (দ্যোতক); (খ) কনসেপ্ট বা ধারণা, অর্থাৎ ভাষাব্যবহারকারী শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে যে অর্থ ইঙ্গিত করে, এটা তাঁর মতে সিগনিফাইড বা বাচ্য (দ্যোতিত)। স্যোসুর ধরে নেন, বাচক-বাচ্যের যৌথ ভূমিকা রয়েছে ভাষার ক্ষেত্রে, কেননা দুটোই ভাষার সিস্টেমের অংশ। অতঃপর স্যোসুর সিগনিফাইয়ারের সিগনিফিকেন্স (বা বাচকের তাৎপর্য) কিভাবে তৈরি হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। স্যোসুরের মতে বাচকের তাৎপর্য বাচকের মাধ্যমে তৈরি হয়না , তৈরি হয় তার সঙ্গে ভিন্নতায়। অর্থাৎ একটা শব্দ কি, তা থেকে ঐ শব্দের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না ; ঐ শব্দটি কি নয়, তা থেকেই বোঝা যাবে ওটার তাৎপর্য । অর্থাৎ যদি বলি

'জল' হলো 'জল' তখন এর কোনো অর্থ হয়না। কিন্তু যখন জল শব্দকে অন্য শব্দ থেকে আলাদা করবো তখনি এর অর্থ উঠে আসবে। একইকথা সিগনিফাইডের (বাচ্য) ক্ষেত্রেও প্রয়োজন তাহলে দেখা যাচ্ছে : ভাষা হলো শব্দের শৃংখলা ও সমন্বয়; শব্দের আবার দুই ভাগ— বাচক ও বাচ্য ; বাচক-বাচ্যের সম্বিলিত রূপ যে 'শব্দ', সেটাই ভাষার চিহ্ন; কিন্তু চিহ্নের অর্থ ঐ চিহ্ন দিয়ে বোঝা যায় না, বোঝা যায় অন্য চিহ্নেরও সঙ্গে তার পার্থক্যও বৈপরীত্যে। রোমান ইয়াকবসন স্যোসুরের ধারণা ব্যবহার করেছেন ধ্বনির বৈপরীত্য বুঝবার ক্ষেত্রে (সিস্টেম অফ সাউন্ড কন্ট্রাস্টস), এবং এভাবেই তিনি উদ্ভাবন করেন ধ্বনিমূলের, ধারণা যেমন ইংরেজিতে তিনটি ধ্বনি আছে 'p' 'b' 'm' ; এই তিনটি ধ্বনি থেকে তিনটি ভিন্ন শব্দ তৈরি হয়: 'pat', 'bat', 'mat'। তিনটি শব্দের প্রথম তিনটি ধ্বনি একটা আরেকটার বিপরীত, এই বৈপরীত্য কে ইয়াকবসন বলেন 'ফাংশনাল কনট্রাস্ট', তাই এগুলো ইংরেজিভাষার ধ্বনিমূল। রোমান ইয়াকবসনের মতে, ধ্বনিমূলের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, একটা ধ্বনিমূলের সঙ্গে যদি অন্য ধ্বনিমূল বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ তৈরি হবে। ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস ইয়াকবসনের 'ফোনিমের' (Phoneme)ধারণা নিয়ে তৈরি করেন মিথেম (Mytheme)—মিথের বৈপরীত্যময় ও অর্থপূর্ণ উপকরণ[১৯]। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো লেভি-স্ত্রোসও মিথ-পুরাণের আকরণবাদী বিশ্লেষক; 'মিথ'কে তিনি দেখেছেন 'ভাষার বাক্যের' মতো। ভাষাবিজ্ঞানের মতো তিনি মিথের মূল উপকরণ নির্ণয় করেছেন। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিভিন্ন একক নির্দেশের জন্যে '—eme' ব্যবহার করেন, যেমন 'Morpheme'; এরই অনুসরণে উপন্যাসতাত্ত্বিক ফ্রেডরিক জেমসন মতাদর্শ সংগঠনের একক নির্দেশ করে নাম দেন 'Ideologeme'।[২০] গ্রন্থনবাদ দেখাতে চায় এই '—eme'সমূহ ব্যাকরণ (গ্রামার) অথবা সংকেত (কোর্ড)-এর বিভিন্ন সিস্টেম আকৃত ও দ্রবীভূত করে, এবং এই কোডগুলোর মাধ্যমে তৈরি হয় সাহিত্যের টেকস্ট। ফের্দিন দ্য স্যোসুর সংস্কৃতির যে সাইনসিস্টেম বা চিহ্ন-ব্যবস্থা পাঠের কথা বলেছিলেন, স্ট্রাকচারালিজম তারাই অনুগামী, এবং এভাবেই 'সেমিওলজি অফ কালচার' নামক ভিন্ন এক পাঠাঙ্গন গড়ে উঠেছে।

রোমান ইয়াকবসন বলেন, ধ্বনিমূলগুলো একটা অন্যটার থেকে স্বতন্ত্র হয় পরস্পরবিরুদ্ধ বৈপরীত্যের মাধ্যমে; যেমন /b/ ও /p/ দুটো আলাদা ধ্বনিমূল; কেননা /b/ হলো ঘোষ আর /p/ অঘোষধ্বনি ; প্রথমটিতে উচ্চারণযন্ত্র ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয়টিতে হয় না। পরস্পর-বিরুদ্ধ বৈপরীত্যের এই ধারণাকে সাংগঠনিক সমালোচকেরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন তার ফলে গড়ে ওঠে এধরনের আকল্প:

প্রকৃতি/ সংস্কৃতি
যুক্তি /পাগলামি
বাম /ডান
ভালো/মন্দ

কিন্তু স্ট্রাকচারালিজমের অনেক কিছ মেনে নিয়েও জাক দেরিদা এর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। দেরিদার প্রধান আপত্তি এধরনের আকল্প বা প্যারাডাইমে; এইরকম সরল ভাগ দেরিদার মতে অসম্পূর্ণ এবং আরোপিত। দেরিদা তাই আকরণবাদ বিরোধি। ডিকনস্ট্রাকশন একটা পোস্টস্ট্রাকচারাল বিকল্প। এডমান্ড হুর্সেল (১৭৫৯-

১৮৩৮)এবং মার্লো-পোন্তির ফেনমেনলজির (বস্তুরূপতত্ত্ব) অধিবিচার করতে গিয়ে দেরিদা বিনির্মাণবাদের সমালোচনা করেন। হুর্সেল ও মার্লো-পোন্তি বলতে চেয়েছেন মানুষের পক্ষে আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণ মুহূর্ত অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু দেরিদার মতে এই ধারণা আসলে সত্তার গভীর খুঁড়ে অর্থ-তালাশের সামিল, এবং পশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যে এধরনের অনুসন্ধান প্রাচীন, দীর্ঘ ও ধারাবাহিক। পশ্চিমের দার্শনিক অনুসন্ধান এভাবে অর্থ/তাৎপর্যের অনেকগুলো কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে রেখেছে, একেই দেরিদা বলেন সিস্টেমস অফ মেটাফিজিক্স বা পরাতাত্ত্বিক ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য অর্থের স্থায়ী, অবধারিত ও অপরিবর্তিত উৎস বা গন্তব্যের দিকে ধাবিত, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ভ্যালুড টার্মস', যেমন ঈশ্বর সত্য, যুক্তি, প্রকৃতি, মানুষ (পুরুষ), বচন। এধরনের অর্থনির্দেশের নেপথ্যে কার্যকর সত্যের-উৎস বিষয়ে একটা মৌলিক এবং স্থায়ী বিশ্বাস; দেরিদা ঈশ্বর-সত্য-প্রকৃতি-বিষয়ক এইসব বিশ্বাসকে নাম দেন লোগোসেন্টিক—অর্থাৎ অর্থকেন্দ্রিক /যুক্তিকেন্দ্রিক বিশ্বাস। দেরিদার মতে, এগুলো অপবিশ্বাস। স্যোসুর থেকে ধার করে দেরিদা বলেন, এইসব টার্মকে যেহেতু এইসব টার্ম দিয়েই বোঝা যায় না, বুঝতে হয় এদের বিপরীত টার্ম দিয়ে, কাজেই এইসব টার্মের স্থায়ী মুডের ওপর নির্ভরতা একেবারে অবাঞ্ছিত । কারণ 'ঈশ্বর' কি তা বুঝতে হলে আমাদের বলতে হয়—'ঈশ্বর সে যে শয়তান নয়'; কিংবা 'সত্য তাই যা মিথ্যা' নয়। এইভাবে অগ্রসর হয়ে দেরিদা লক্ষ করেন পশ্চিমের সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছে 'যুক্তি' 'প্রকৃতি' 'পুরুষ' 'তত্ত্ব') 'রিজন' 'ন্যাচার' 'ম্যান' থিওরি) বিপরীতে উপেক্ষিত হয়েছে 'উন্মাদনা' 'সংস্কৃতি' 'নারী' 'অনুশীলন' (ম্যাডনেস, কালচার, ওম্যান, প্রাকটিস)। দেখা যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে একধরনের বিষয় সর্বদা সুবিধেজনক অবস্থানে থেকেছে, অন্য বিষয়সমূহ হয়েছে লাঞ্ছিত ('যুক্তিকে শ্রদ্ধেয় ভাবা হয়েছে, কিন্তু 'উন্মাদনা' স্বীকৃত হয়নি)। একপ্রান্তকে এরকম সুবিধে প্রদান, এবং অন্যদিকটাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করাকে জাকদেরিদা পশ্চিমের চিন্তার ইতিহাসে বিরাট বড়ো ক্রাইম মনে করেন অথচ যেখানে শয়তান ছাড়া ঈশ্বর বোঝা যায় না, 'উন্মাদনা' ছাড়া 'যুক্তি' অবোধগম্য এবং 'নারী' বাদ দিয়ে 'পুরুষ' বোজা যায় না, সেখানে কেবল ঈশ্বর, পুরুষ, যুক্তি-কে মহান করে তোলার মানে কি? ডিকনস্ট্রাকশন তাই বলতে চায় পরিপূর্ণ অর্থ বলে কিছু নেই, অর্থের কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, বাচক-বাচ্যের আর্থ-বাঁধুনি অশিথিল নয়। পরিপূর্ণ অর্থসম্পন্ন এইসব টার্মকে ছিন্নভিন্ন করে দেরিদা আমাদের দেখান সেই বস্তু, যা বহুকাল অধস্তন প্রান্তিক পরিত্যক্ত ছিলো। অধস্তন বিষয়রাশির মধ্যে আছে : উন্মাদনা সংস্কৃতি নারী প্রাকটিস। সেজন্যে ডিকনস্ট্রাকশন একটা র‍্যাডিক্যাল ফ্রি প্লে— অর্থ নয় ভাষার মধ্যে সর্বত্র এবং সবসময় চলছে ডিফরেন্সের খেলা।

কিন্তু স্যোসুর থেকে দেরিদা কোথায় ভিন্ন? ভিন্ন এই জায়গায় যে, সাইন-সিস্টেমের কথা বলে স্যোসুর ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি শেষাবধি ভাষার প্রথাগত অর্থবোধের ধারণা মেনে নিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন ভাষাগত শব্দরাশির সিগনিফিকেশন বা দ্যোতনায় । অর্থাৎ একটা ভাষায় একেকটা শব্দ যে-অর্থকে গ্রাহ্য মেনে আসছে, স্যোসুরের দৃষ্টিতে তা মূল্যবান। আরো পরিষ্কার করে বলতে পারি: সাইন-সিস্টেমকে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য মনে করলেও, অর্থাৎ এক চিহ্নের সঙ্গে অন্য চিহ্নের বৈপরীত্য এবং বৈপরীত্যের ফলে বোধগম্যতার উদ্ভব—এই রকম বিশ্বাসে আস্থাস্থাপন করেও স্যোসুর 'সিগনিফাইড' কে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছেন। দেরিদার মতে, 'বাচক'

ভাষাবস্তু হলেও, 'বাচ্য' ভাষাবহির্ভূত (সাংস্কৃতিক, মতাদর্শিক, বা অন্যকিছু); অথচ স্যোসুর ভাষাবহির্ভূত জিনিশকে মূল্য দিয়েছেন, দ্যোতক-দ্যোতিত বাচক-বাচ্যের প্রথাগত পরস্পর-নির্ভরতাকে বাঞ্ছিত মনে করেছেন। দেরিদার মতে, এই প্রক্রিয়া পরাতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক স্যোসুরের আতাঁত গড়ে ওঠে, স্যোসুরের র‍্যাডিকাল ভাষাতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত র‍্যাডিক্যাল থাকেনা। দেরিদার কথা হলো, ভাষা বুঝতে হলে ভাষার মধ্যে থাকতে হবে, ভাষার বাইরে অর্থাৎ রেফারেন্সে যাওয়া যাবেনা। 'ঈশ্বর' যদি ভাষাবস্তু হয়, তাহলে 'শয়তান' আরেকটা ভাষাবস্তু— দুই টার্ম পরস্পরের বিপরীত, অতএব বোধগম্য; 'ঈশ্বর' অমুকতমুক, 'শয়তান' অমুকতমুক—এরকম ভাষাবর্হির্ভূত রেফারেন্স ভাষা/টেকস্টের ভেতর আনা যাবে না। স্যোসুরও ভাষাকে উল্লম্ফনধর্মী মনে করেছেন, কিন্তু দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন তার মারাত্মক উলম্ফনের কথা জানিয়ে দেয়।

স্যোসুরের প্রতি দেরিদার দ্বিতীয় আপত্তি হলো, স্যোসুরের ধারণা মানবভাষার প্রধান জিনিশ 'লিখন' নয় , 'বচন'; স্যোসুর ভেবেছেন 'লিখন', হলো 'বচনে'র অনুকরণ। দেরিদার মতে লিখনের ওপর বচনের প্রাধান্য, একটা বহু পুরনো অপবিশ্বাস । এই অপবিশ্বাস স্যোসুরের একার নয়, পশ্চিমের প্রায় সকল দার্শনিকের। কিন্তু 'বচনের ওপর' 'কথনে'র এই প্রাধান্যের কারণ কি? দেরিদার মতে এর কারণ, 'সত্তা'এবং 'উদ্দেশ্যে'র সঙ্গে কথনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অন্যদিকে লিখনের সঙ্গে ('দেরিদার' ভাষায় 'লিখন' হলো ভাষা, ভাষা হলো লিখন) 'সত্তা' বা উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই; কেননা লিখন /টেকস্ট উন্মুক্ত—লিখনের নেপথ্যে কোন' সত্তা' কি উদ্দেশ্যে কার্যকর, দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন তার সন্ধানকে অবাঞ্ছিত মনে করে।

জাক দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনের সঙ্গে জাক লাকাঁর অভিমতও মিলে যায়; লাকাও বলেন, 'দ্যোতকে'র বা বাচকের অর্থ সবসময়েই মুক্ত ও স্বাধীন ; তাকে ব্যাকরণের শাসন অথবা শব্দের নির্দিষ্টতা দিয়ে অন্তরীণ করা যাবেনা। এই মুক্ততা অনুমোদিত হলে এমন অর্থ দেখা দিতে পারে যা প্রাচীন পঠন ধারণাও করতে পারেনি (দেরিদা কাফকার 'দি ট্রায়ালে'র একটা অংশের যে পাঠনির্ণয় ও অর্থভেদ করেছেন, তা কেউ কেউ দেখে থাকবেন, সেই অংশটিতে আদালতের এক দারোয়ান এবং গ্রাম থেকে আসা এক দর্শনার্থীর আলাপ এবং প্রতীক্ষা যুগপৎ চলতে থাকে; এই অংশটির বিশ্লেষণে দেরিদা দেখান কাফকার আখ্যান কিভাবে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে চলে যায়। দারোয়ান ও দর্শনপ্রার্থীর আলাপ আচরণ ও কথাবার্তাকে দেরিদা অদ্ভুত ফ্রেমে বদলে দিয়েছেন)। সংকোচনবাদী অর্থতত্ত্বের বিরুদ্ধে দেরিদা একটা সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তুলবার পক্ষপাতী, এই প্রতিরোধ হায়ারারকি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটা লড়াই।

নির্মাণ-উন্মোচন-প্রকল্প বিভিন্ন পরিভাষার জন্য দিয়েছে, যেমন 'differance', 'dissemination', 're-marque', 'pli', 'hymen'। এছাড়া দেরিদার কতোগুলো তির্যক বাক্য ও বাক্যাংশ আছে যেমন 'মাইমেসিস উইদাউট অরিজিনাল,' 'মিরর উইদাউট সিলভারিং' : দেরিদার মাইমেসিসের কিন্তু কোনো মূলের নকল নয়; দেরিদার মাইমেসিস বিম্বহীন প্রতিবিম্বের মতো। দেরিদার কথাটি এমন : চিহ্ন পুনরাবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তা একই চিহ্নের পুনরাবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তন নয়। ডিকনস্ট্রাকশন অর্থসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো রেফারেন্স স্বীকার করেনা; তার মানে হলো, ভাষার চিহ্ন ভাষা দিয়েই বুঝতে হবে, এবং এর সঙ্গে কোনো অভাষিক বাস্তবতা (নন-লিংগুইষ্টিক রিয়ালিটি।

জড়ানো যাবেনা। জাক দেরিদা এইভাবে চিহ্নের ব্যক্তিত্ব প্রসারিত করে দেন, চিহ্ন হয়ে ওঠে সক্ষম এক ভাষাবস্তু। তাই অর্থের উদ্ভাবন ও তাৎপর্য নিয়ে যে গৌরববোধ এতোকাল চলে আসছিলো ,দেরিদা তাকে ম্লান করে দেন। শব্দের ওপর বিষয়ের প্রাধান্য লংঘন করে যান দেরিদা। 'ইমেজ', আর 'অরিজিন ' কি করে তখন আর তুলনীয় থাকে '? তুলনার মানদন্ডটিও মুহূর্তে অকেজো হয়ে যায়।

তিন

দেরিদা ফুকোর মধ্যে মিল অনেক থাকলেও বিরোধ একেবারে কম নয়। উভয়ের মধ্যে একটা ঝগড়া তো বেশ বিখ্যাত। প্লেটোকে দেরিদা অভিযুক্ত করেছিলেন লিখনের উপর কথন-কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে, মিশেল ফুকো দেরিদার মত মানেননি। একে 'খামোখা অভিযোগ' বলে তিনি উপহাস করেন। দেরিদার পরাদর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন মিশেল ফুকো । ফুকো বলেন, পরাদর্শন খারাপ কিছু নয়; কিন্তু দেরিদার পরাদর্শনের কোনো ব্যবহারিক উপযোগ নেই।

মিশেল ফুকো নিজেও মেটাফিলসফার; কিন্তু দেরিদার মতো তিনি দর্শনের ইতিহাসের পরাদার্শনিক ডিকনস্ট্রাকশন করেন নি। ফুকোর কাজ হলো বিভিন্ন বাস্তব উদ্যোগের কংক্রিট ইতিহাস, যার লক্ষ্য সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ । মিশেল ফুকো বলতে চান, টেক্সচ্যুয়াল ট্রুথের অন্ধতায় দেরিদা প্লেটোর সম্পর্কে যে সরলীকরণ করেছেন, তা একেবারেই ভ্রান্ত; কেননা প্লেটো 'লিখনে'র যে অধিবিচার করেছেন তা মূলত সত্য সম্পর্কে; বচন এবং লিখনের পার্থক্য বা প্রাধান্য বিষয়ে নয়। প্লেটোর আলাপ এই নিয়ে ছিলোনা যে, টেকস্ট লৈখিক না মৌখিক; প্লেটো ভাবতে চেয়েছেন, আলোচ্য ডিসকোর্সের সত্য-সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্ন ও সম্ভবপরতা বিষয়ে। ফুকোর মতে, কিছু ব্যাখ্যা এমন থাকে যা অন্য ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি মৌলিক, এবং তা মীমাংসামুখী । সেজন্যে প্লেটোর টেকস্টে লিখন, বচন ও সত্যের সম্পর্ক কখনোই পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরপ্রবিষ্ট, জীবনের শিল্পের সঙ্গে তা প্রবলভাবে যুক্ত। প্লেটোর কথা বলতে গিয়ে ফুকো আরো খানিকটা এগিয়ে যান, স্বভাবমতো। বলেন, শুরুতে জ্ঞানতত্ত্ব (এপিসটেমোলজি) কিংবা তাত্ত্বিক দর্শন এবং নৈতিক-সামাজিক ব্যবহারিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য ছিলোনা। 'সত্য' এবং ভালোত্ব অনেকদিন পর আলাদা হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়। দুটোর মধ্যে এই বিচ্ছেদ গড়ে উঠে আধুনিকপর্বের উন্মেষলগ্নে। ফুকো বলেন, প্লেটোর মনে লিখন এবং স্মৃতির সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, অন্য ঐতিহাসিক কারণে; মানুষ একসময় ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক ব্যবহারের জন্যে নোটবুক রাখতে শুরু করে, প্লেটো এই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কম্পিউটারের প্রবেশ যেরকম, ওই সময় নোটবুকের অভ্যেসও সেইরকম বিপ্লবাত্মক। উপরন্তু নোটবুক এবং লিখে রাখার অভ্যেস ও সময় প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপরন্তু, এই কৌশল এবং প্রযুক্তি আত্মজ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে ওতোপ্রোত হয়ে যায়। প্রাইভেট ও পাবলিক দুক্ষেত্রেই নোটবুকের ভূমিকা বাড়তে থাকে ক্রমশ, সরকার মহোদয়ের রেজিষ্টার রাখার মতো।

মিশেল ফুকো প্লেটোর বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে যুগপৎ ইতিহাস ও পাঠগত সাক্ষ্য নিয়ে চড়াও হয়েছেন জাক দেরিদার ওপর। 'ব্যাখ্যা' কেন শুধুমাত্র ডিফারেন্সের খেলা হতে পারেনা; কেন তা কেবল টেকস্টের বাক্য, শরীর ও অবয়বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে

পারেনা—মিশেল ফুকো তা বুঝিয়ে দেন। টেকস্ট কখনোই কেবল শব্দের সমাবেশ, শব্দের সম্পর্ক ও শব্দের পার্থক্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনা, কেননা টেকস্টে সবসময়েই অন্তরিত থাকে সামাজিক অনুশীলন ও প্রাকটিস। প্লেটোর বক্তব্যকেও তাই শব্দের আধারে দেখলে চলবে না, সেই বক্তব্যের ভেতর লুকানো ঐতিহাসিকতাও চোখের সামনে থাকা দরকার। ফুকো টেকস্টের সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রার ওপর জোর দেন, আর দেরিদা সীমাবদ্ধ থাকতে চান পাঠগত সমালোচনায়; দেরিদা তুলে ধরেন পঠনের বিচিত্র কারুকাজ, ফুকো দেখান ঐ কারুকাজ কিরকম সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যে বাঙময়।

জাক দেরিদার সমালোচনা এডওয়ার্ড সাইদও[২১] করেছেন, অনেকটা ফুকোর মতো। এডওয়ার্ড সাইদ লক্ষ করেছেন টেক্সচ্যুয়াল এনালাইসিস ও পাঠগত সমালোচনা জ্ঞানতাত্ত্বিক হচ্ছেনা; অর্থাৎ টেকস্টের যে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তর (এপিসটেমোলজিকাল স্টাটাস) আছে, বিনির্মাণবাদের ফ্যাশনে সমালোচকেরা তা ভুলতে বসেছেন। সেজন্যে ক্রিটিকাল কনশাসনেস এখন উধাও, তার স্থলে দেখা দিচ্ছে চাতুর্য, কৃৎ-কৌশল, রকমারী পদ্ধতি। এ ধরনের সমালোচনায় জ্ঞানের সম্ভাব্যতাও সম্ভবপরতাও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। টেকস্টের টেক্সচ্যুয়ালিটিতে 'জ্ঞান'-এর একক স্বীকার্য হচ্ছে না।

এডওয়ার্ড সাইদের মতে দেরিদা-ফুকোর চিন্তায় সাদৃশ্য সত্ত্বেও অনেক মৌলিক পার্থক্য আছে। দেরিদা টেকস্টের পাঠ এবং পঠন নিয়ে ভাবিত; তিনি মনে করেন, টেকস্টের ভেতর পাঠক যা পড়তে পায় এবং পাঠ্যবস্তু হিশেবে ওতে যা কিছু দ্রষ্টব্য, তার বেশি বক্তব্য নেই টেকস্টের। মিশেল ফুকোর মতে, টেকস্ট গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে, টেকস্ট ক্ষমতার একটা বিরাট উঠোন এবং ক্ষেত্র; যদিও সে ক্ষমতা অদৃশ্য কিংবা পরোক্ষ কিংবা অস্পষ্ট হতে পারে। দেরিদা কেবল টেকস্টের দিকে ডাকেন, আর ফুকো টেকস্টের ভিতরে এবং বাইরে আমাদের নিয়ে যান। তবে দেরিদা এবং ফুকো, দু'জনেই, টেকস্টের সেইসব অংশ আলোকিত করে তোলেন যা সহসা চোখে পড়ে না; দেরিদা-ফুকো টেকস্টের রহস্য, খেলা ও সংকেত আমাদের সামনে বিপুলভাবে আলোকিত করে দেন। দেরিদা লিখেছেন :

> 'সেই টেকস্ট টেকস্টই নয়, যেটা আড়াল করতে পারে না তার কম্পোজিশনের কানুন, তার খেলার নিয়ম; টেকস্ট সবসময়েই বোধের বাইরে থেকে যাবে। বোধের সমস্যা এই জন্যে নয় যে, টেকস্টের আইন/অনুশাসন খুব গোপন কিছু, বরং এজন্যে যে তা লিপিবদ্ধ হতে পারে না; এ জন্যে যে 'বোধ' বলে কিছু নেই।'

কিন্তু মিশেল ফুকো বলেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, টেকস্ট অনেক রহস্য লুকোয় বটে, কিন্তু তা খুলে দেখানো সম্ভব—হয়তো অন্য ফর্মে, কিন্তু সম্ভব; কেননা ক্ষমতার নেটওয়ার্কের মধ্যে টেকস্টের জন্ম, কেননা টেকস্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যচালিত। বিপরীতে দেরিদা একধরনের নাস্তিধর্মে (নেগেটিভ থিওলজি) আস্থাবান। তারপরও এ দু'জনের লেখা পশ্চিমের সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং বুদ্ধিবৃত্তির সার্বভৌম-ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছে এবং 'পদ্ধতি' নামক বাঁধাধরা ফিটফাট বস্তুটাকে বিড়ম্বিত করেছে

এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই দেরিদা মেটাফিজিক্স ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমালোচনা করেন: ফুকোর মধ্যেও এই মনোভঙ্গিই কাজ করে যখন তিনিও পাগলামির সঙ্গে সভ্যতার যোগ নিয়ে ভাবেন, সাংস্কৃতিক/জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভিন্ন পর্বের কথা বলেন এবং সমালোচনা করেন। ফুকোর মতে, ওইসব পর্বের মধ্যে দিয়ে একটা নিয়ন্ত্রক-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যে সংস্কৃতি আগ্রাসী ও সমগ্রতাবাদী, যে সমগ্রতাবাদ বৈধতার বিচিত্র প্রকরণের জনয়িতা। জ্ঞান ও সংস্কৃতির সেইসব বৈধ, স্থায়ী, নিরুপদ্রব কেন্দ্রগুলোকে দেরিদা ও ফুকো পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করে নিতে উদ্যোগী।

এডওয়ার্ড সাইদ বলেন : দেরিদা বা ফুকো দু'জনের কেউই সাহিত্যসমালোচক নন, কিন্তু তাদের প্রভাব সাহিত্য সমালোচনায় পড়েছে বেশি। দেরিদা দার্শনিক, আর ফুকো দার্শনিক-ঐতিহাসিক। দেরিদা-ফুকোর কাজের পদ্ধতি ও উপকরণ আধা-দার্শনিক, আধা-সাহিত্যিক, আধা-বৈজ্ঞানিক, আধা-ঐতিহাসিক। দু'জনের কাজের কেন্দ্রেই একটা মৌলিক অনির্দিষ্টতা আছে ,এই অনির্দিষ্টতা সাইদকে সন্তুষ্ট করেনি। দেরিদা একদিকে 'বিকল্প টেকস্টে'র কথা বলেন, ফুকো বলেন 'ডাবল রাইটিং'-এর কথা। 'ডাবল রাইটিং' হলো : প্রথমে টেকস্টের (ডিসকোর্স, আর্কাইভ, বিবেচনা, মত) বিবরণ দিতে হবে, তারপর তৈরি করতে হবে নতুন টেকস্ট। 'দি অর্ডার অফ থিংস' কিংবা 'এ হিস্ট্রি অফ সেক্সচ্যুয়ালিটি' যাঁরা পড়েছেন, ফুকোর কাজের পদ্ধতি তাদের জানা আছে। পুরনো টেকস্ট খুঁড়ে ফুকো অনেক জীবাশ্ম জড়ো করেন, তারপর রক্তে-মাংসে নতুন চেহারা ও শরীরে তাকে উত্থাপন করেন। দেরিদা এবং ফুকোর কাজের লক্ষ্য পার্থক্য-নির্দেশ, এবং তার মধ্যে এইটে দেখানো যে, কিভাবে এক টেকস্ট থেকে আদল নেয় আরেক টেকস্ট, এবং আলাদা হয়ে যায়।

মিশেল ফুকোর প্রধান বক্তব্য : ডিসকোর্স তৈরি করে ডিসিপ্লিন, সেই ডিসিপ্লিন ধীরে ধীরে একটা বৈধতা ও সামগ্রিকতায় পৌঁছয়; যখন পৌঁছয় তখন 'ব্যক্তিগত' বলে কিছু থাকে না, তখন এমনকি মানবশরীরও ক্ষমতাযন্ত্রে প্রবেশ করে, এবং তার আচরণও ডিসিপ্লিনড ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ডিসকোর্স ও ডিসিপ্লিন, কিংবা ডিসকোর্সের ডিসিপ্লিনকে এইভাবে না বুঝলে, ফুকো যে 'নিয়মিতকরণ-ব্যবস্থা'র (সিস্টেমস অফ রেগুলারিটিস) কথা বলেন, তা বোঝা যাবে না। এ কারণেই তো ফুকো ঘোষণা করেন, বিজ্ঞান কিংবা তার ইতিহাস 'বৈজ্ঞানিক' নামক বিশেষ ব্যক্তিটির বিশেষ নাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করা সম্ভব, কেননা 'বিজ্ঞান'ও ডিসকোর্স-বহির্ভূত নয়। যাকে বলা হয় 'ইনডিভিজুয়াল সাবজেক্ট' ফুকো তা খারিজ করতে উদ্যত, ফুকোর সঙ্গে এই জায়গায় দেরিদা বেশ মিলে যান। তবে সাইদের মতে ফুকো জোর দেন নিয়ম আর অনুশাসনের প্রতি, সেইজন্যে 'ঐতিহাসিক পরিবর্তনে'র ব্যাখ্যায় ফুকোর মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

জাক দেরিদা মনে করেন পশ্চিমের দর্শনলেখকেরা পরাতত্ত্বের চাপের মধ্যে কাজ করেছেন: এই চাপ দেখেছেন তিনি প্লেটোর মধ্যে, দেকার্তের মধ্যে, হেগেল-কান্ট-রুশো-হাইডেগার, এমনকি, লেভি-স্ত্রোসের মধ্যে। পরাতত্ত্বের চাপের অর্থ 'উপস্থিতি'র দখল, এবং 'উপস্থিতি'র বোধ, অর্থাৎ প্রথমেই একটা কিছু 'উপস্থিত' মেনে তারপর অগ্রসর হওয়া। পশ্চিমের দর্শন এই 'উপস্থিতি'কে অসম্ভব মান্য করেছে। তাই টেকস্টের

ভেতর তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা, সিদ্ধান্তহীনতা ও বৈপরীত্য—একদিকে পরাতাত্ত্বিক উপস্থিতির প্রেশার, অন্যদিকে লেখকের অবোধ্য ইনোসেন্স। কিন্তু টেকস্টের এই সিদ্ধান্তহীনতা বিষয়ে লেখক নিজে সচেতন কিনা, দেরিদা বলতে চান নি। দেরিদা দূরে থাকতে চান 'রচয়িতা' থেকে, কিন্তু সবসময় তা সম্ভব হয় না, কখনো কখনো বেশ সমস্যায় পড়েন। 'অফ গ্রামাটোলজি'তে দেরিদার সেইরকম একটা মুহূর্ত চোখে পড়ে: রুশোর 'এসে অন দি অরিজিন অফ দি ল্যাংগুয়েজেস' পাঠ করার সময় জটিলতা ঘটে। রুশোর এই লেখাটি (এরকম আরো কিছু লেখা রুশোর আছে) তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়: এই লেখাগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেরিদা যেন আর টেক্সচ্যুয়াল, কেবলি টেক্সচ্যুয়াল, থাকতে পারছেন না; যেন দরকার পড়ে যাচ্ছে 'রুশো' নামক অজ্ঞাতনামা লেখকের জীবনী বা জীবনের তথ্য; দেরিদার যেন জানা প্রয়োজন এই লেখাসমূহে রুশোর আসল উদ্দেশ্য কি ছিলো? রুশো নিজে এই লেখাগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন? নাকি দেননি?

'অফ গ্রামাটোলজি'র এই অংশটুকু পড়তে গিয়ে এডওয়ার্ড সাইদ প্রশ্ন করেন, দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন এইখানে এসে কি চরিত্রচ্যুত হয়ে পড়েনি? রুশোর টেকস্ট কি এখানে গৌণ নয়? দেরিদা কি তাঁর অপছন্দনীয় উৎস/শেকড়ের দিকে উন্মুখ হননি এখানে? তাঁর চৈতন্যে কি হানা দেয়নি রুশোর মুখ, রুশোর জীবন, রুশোর পুরাণ? দেরিদার কি মনে পড়ে যায়নি: রুশো ছিলেন অমুক শতাব্দীর তমুক দার্শনিক, তিনি এতো এতো বছর বেঁচেছিলেন, সেটা প্রায় আঠারো শতকের কথা, আঠারো শতকের চিন্তাধারা ছিলো এই........ইত্যাদি ইত্যাদি'? ডিকনস্ট্রাকশনের সীমাবদ্ধতা সাইদ ধরে ধরে দেখান : বলেন, কেন একধরনের টেকস্ট তিনি আলোচনা করেন, অন্য ধরনের টেকস্ট এড়িয়ে যান; 'ডিকনস্ট্রাকশন' নামক 'সামরিক অভিযান' (মিলিটারি অপারেশন) কেন কেবলি সকল টেকস্টকে সংঘাতময়-অমীমাংসিত করে দেখায়, কিংবা প্রাণপাত করে খোঁজা হয় ওইসব সংঘাত ও অনির্দিষ্টতা; কেন দেরিদা কেবল ছোটো আখ্যানের টেকস্ট বেছে নেন, এবং তাকে কেবলি সংশয়, সন্দেহ, তদন্তের চোখে দেখেন; সবচেয়ে বড়ো কথা, দেরিদা কেন এড়িয়ে যান 'ন্যারেটিভ' বা আখ্যান? সেটা কি এজন্যে নয় যে, কথাশিল্পীর আখ্যান নিজেই নিজের ডিকনস্ট্রাকশন করে চলে?

সাইদের মতে, 'ডিকনস্ট্রাকশন' টেকস্টের যে বদল ও বিকল্পের কথা বলে, আধুনিক আখ্যানগুলোতে তা অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে: যেমন স্টার্ন, প্রুস্ত, কনরাড—এমনকি সার্ভেন্তিসের উপন্যাস; আধুনিক কথাশিল্পীদের এই কৌশল কোনো গোপন ব্যাপার নয়; এই কৌশল কেবল প্রত্যক্ষই নয়, এটা ওসব আখ্যানের মূল বৈশিষ্ট্যও। এই কৌশল পরীক্ষা করে দেখলে 'ডিকনস্ট্রাকশন'কে নতুন মনে হবে না। সাইদের মতে, 'রাইটিং' বা 'লিখন' নিয়ে দেরিদার যে উচ্ছ্বাস, তার প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক উপন্যাসমালা; এবং অন্যসব 'কায' থেকে 'লিখন' যে ভিন্ন হতে পারলো, তার কারণ 'আখ্যান-আঙ্গিকে'র ঐতিহাসিক, অনন্য ও বিপ্লবাত্মক বিকাশ।

দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনের যে অপপ্রভাব আমেরিকা এবং অন্যত্র পড়েছে, এডওয়ার্ড সাইদ তা-ও নির্দেশ করেন। ডিকনস্ট্রাকশনের প্রভাবে সমালোচনা আজ জ্ঞান থেকে, যুক্তি থেকে, বোধ-উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন; 'সমালোচনা' ইতিহাস, বিষয় ও পরিস্থিতি থেকে

বিযুক্ত হয়ে, ক্রমশ, যুক্তিহীন অভিপ্রায়হীন, সর্বোপরি সমালোচনহীন, হয়ে উঠেছে এরে সাইদের মতে, পশ্চিমের শক্তিশালী দর্শন ও চিন্তার ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করা জাক দেরিদার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব; পশ্চিমের দর্শনে পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিকায়ন দেরিদাকে এই চ্যালেঞ্জে উদ্বুদ্ধ করেছে। পুনরাবৃত্তির এই দীর্ঘ, অভ্যস্ত ও সমালোচনাহীন সমালোচনার পরিস্থিতি থেকে দেরিদার কাজ যেভাবে আমাদের বার করে আনে, তা এই শতাব্দীর মনস্বিতায় বিরল। তুলনামূলক সমালোচনার ভুবনে জাক দেরিদা যে দিগন্তের সন্ধান দিয়ে যান, তা বিস্মিত না করে পারে না।

---

১. Ihab Hassan, *The Dismemberment of Orpheus/Toward a Postmodern Literature*. The University of Wisconsin press, 2nd edition, 1982, p. 112.

২. Jacques Derrida, 'Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences', in *"Writing and Difference"* tr. Alan Bass, Chicago, 1978.

৩. Raymond Tallis, *"Not Saussure: A Critique of Post-Saussurean Literary Theory"*, 1988, p. 226.

৪. Bernard Bergonzi, 'Who is Derrida, What is He? 'in', *"Exploding English/Criticism*, Theory, Culture" Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 132.

৫. Peter Dews, *Logics of Disintegration: Post-Structuralist Thought and the Claims of Critical Theory*. 1987.

Christopher Norris, *Deconstruction, Theory and practice*. 1982.

—The *Contest of Faculties: Philosophy and Theory After Deconstruction*. 1985.

—*Derrida*. 1987.

৬. Geoffrey Hartman, *Saving the Text: Literature/ Derrida/ Philosophy*. Baltimore, 1981.

৭. Allan Megill, *Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida* Berkeley, 1985.

৮. Ibid. p. 333

৯. Ibid. p. 345.

১০. Ibid. p. 330

১১ Imre Salusinsky, *Criticism in Society*. 1987 p. 17-18

১২. John Searle, *Newyork Review of Books*. 27 Oct. 1983.

১৩. Christopher Norris, *Derrida*. 1987, p. 169-70.

১৪. Nicolas Tredell, *'Post-theory'* PNR, No. 41, 1984.

১৫ Jacques Derrida, *Margins of Philosophy*. tr. Alan Bass, Chicago, 1981.

১৬. Quentin Skinner, *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*, (ed). Cambridge University Press, Reprint, 1991, p. 46-47.

১৭. David Hay, 'Jacques Derrida' in *'The Return of Grand Theory'* 1991, p. 48-49.

১৮. Alan Durant and Nigel Fabb, *Literary Studies in Action*, Routledge: London and Newyork, Reprint, 1992, p. 42.

১৯. C. Levi-Strauss, *Structural Anthropology*. Hormondsworth, penguin, 1972, p. 211.

২০. Fredric Jameson, *The Political Unconscious*, Methuen: London, 1981, p. 76.

২১. Edward W. Said, *The World, the Text, and the Critic*. Faber & Faber: London and Boston, 1984, p. 178-226.

মিশেল ফুকো

অযুক্তি ও উন্মাদনার প্রতি পক্ষপাত আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে নতুন নয়; যদিও অযুক্তির সাংগঠনিক স্ফুরণ, এবং আধুনিকতার শক্তিমান প্রতিপক্ষরূপে তার প্রতিষ্ঠা, অবশ্যই অভিনব। আধুনিকতার সূচনালগ্নে রক্ষণশীল প্রাচীনতার সঙ্গে তার একটা কলহ ছিলো, কিন্তু আধুনিকতার সংসারে আধুনিকতার বিরোধিতা কৌতূহলসঞ্চারী। এই বিরোধকে কেউ কেউ বলেছেন 'উত্তরাধুনিকতা', কেউ বলেছেন 'আধুনিকতার আত্মসমীক্ষা'; কিন্তু একটি বা দুটি শব্দে এটা ব্যাখ্যা করা যাবেনা। মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, জঁা-ফ্রাঁসোয়া লিওতার, তারো আগে বাতিল্লি তারো আগে নীৎশে, এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটান, এবং অতঃপর, দার্শনিক উদ্যম ও প্রতিভায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'উত্তরাধুনিকতা' আধুনিকতার বিকল্প নয়, বিরোধিতা; 'অযুক্তি' যুক্তির বিকল্প নয়, বিরোধিতা। তবে বিরোধিতামাত্রই মূল্যবান নয়, বিরোধিতার ফলে একটা কিছু গৃহীত অথবা বাতিল হয় না। কিন্তু বিরোধিতাই যখন দার্শনিক প্রকল্পে বিকশিত ও রূপান্তরিত ও বিধিবদ্ধ— তখন তা শক্তিমত্তা স্বীকার্য, এবং তার অভ্যুদয় মান্য হয়ে ওঠে।

আধুনিকতার বিরুদ্ধে মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা কিংবা ফ্রাঁসোয়া লিওতারের এই বিরোধিতা আকস্মিক নয়, ঐতিহাসিক; এর পেছনে ষাটদশকের ফরাশি ছাত্রআন্দোলনের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। ছাত্রআন্দোলন ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকায় বুদ্ধিবৃত্তির মোড় ফেরায়, চিন্তার ছক ও অভ্যাসে বহুরকম বদল আনে। পরিবর্তিত বুদ্ধিবৃত্তি যদিও একপথে চলেনি, ফ্রান্সের জার্মানির কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাও একরকম নয়, তবু কতোগুলো সাদৃশ্য স্পষ্ট। কেবল ফরাশি বুদ্ধিবৃত্তির কথা যদি ধরি, দেখা যাবে, মিশেল ফুকো, দেরিদা কিংবা লিওতারের ভাবনাচিন্তা মে ১৯৬৮র ছাত্রবিপ্লবের প্রত্যক্ষ পরিণতি। সে বিষয়ে ভাবুকদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও আছে। সেদিক থেকে উত্তরাধুনিক বুদ্ধিবৃত্তি রাজনৈতিকও বটে, অতএব এই পটভূমি প্রথমে একটুখানি বলে নেওয়া দরকার।

মে ১৯৬৮-র ফরাশি ছাত্রআন্দোলনের একটা কারণ সমকালীন ফ্রান্সের রাজনৈতিক হতাশা। ক্ষমতাসীন ডি গ্যালে-র সরকার বামপন্থী এবং অন্যান্যরা পছন্দ করছিলোনা, অথচ বাঞ্ছিত কোনো বিকল্পও নেই। বিকল্পের অনুপস্থিতি থেকে থেকে হতাশা, সেই হতাশার প্রচন্ড অভিব্যক্তি ছাত্রবিক্ষোভ। তবে সেই বিক্ষোভ ছিলো এমন, যা ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার ভেতর ছিলোন।

ষাটদশকে অবশ্য সারাপৃথিবীতে ছাত্রআন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, একে সেই সময়ের 'ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড ফেনোমেনন' বলা যায়।[১] ফিদেল কাস্ত্রো, চে-গুয়েভারার মতো রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম আগ্রাসন, ইত্যাদি মিলিয়ে ছাত্রজাগরণ তখন তুঙ্গে। তার মধ্যে ষাটদশকে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দু'দশকের তুলনায়, বেড়ে যায় অনেক। চল্লিশের দশকে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা ছিলো ষাট হাজার, ষাটের দশকে তা

স্ফীত হয়ে দু'লাখে পৌঁছয়। ছাত্রবৃদ্ধির অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রদের সুবিধে দিতে পারেনি। বেকারত্ব, চাকরিবাজারের দুরবস্থা,এসব তো ছিলোই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিলো তখনো রক্ষণশীল, প্রাচীন, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনে বন্দী। এই সময়ে দেখা দেয় ভিয়েতনামের যুদ্ধ, এই যুদ্ধ যেন ছাত্রসমাজের বৃহৎঐক্যের সেতু। আটষট্টির মার্চ-নাগাদ ফ্রান্সের আমেরিকান অফিসের সামনে নিক্ষিপ্ত হয় বোমা; ছাত্রবিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে ওঠে সরবোনের অন্তর্ভুক্ত নানট্যির নতুন ক্যাম্পাস। ২৮ মার্চ এবং পয়লা এপ্রিল নানট্যির বিশ্ববিদ্যালয় বিকল হয়ে পড়ে, ৩ মে থেকে নানট্যিতে শিক্ষাদান স্থগিত হয়ে যায়। নানট্যির আন্দোলন স্থানান্তরিত হয় মূল সরবোনে প্যারিসের একেবারে কেন্দ্রে। বাম ও ডানপন্থী ছাত্রদের মধ্যে ভায়োলেন্ট সংঘাতের আশংকায় সরবোনের কর্তৃপক্ষও ক্লাশ স্থগিত ঘোষণা করেন, পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশী হস্তক্ষেপ ছাত্রদের আরো উত্তেজিত করে, কয়েকজন গ্রেফতার হলে ছাত্রেরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়; সংঘর্ষে ছাত্র-পুলিশ মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা অনেক। ছ'শো লোক গ্রেফতার হয়, পরবর্তী দশ দিন ধরে এই তান্ডব চলতে থাকে। আটক ছাত্রদের মুক্তি, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার, এবং পুনরায় ক্লাশ শুরুর দাবিতে ছাত্রেরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। কিন্তু ডি গ্যালে-র সরকার উল্টো চারশো ছাত্র গ্রেফতার করে, সরবোন অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষিত হয়। তবে এই সংকটমুহূর্তে ছাত্র-শ্রমিকের অভাবনীয় ও অবিস্মরণীয় ঐক্য সরকারী কৌশল সফল হতে দেয়নি। ১৩ মে ট্রেড ইউনিয়ন হরতাল ডাকে, এবং সেদিন প্যারিসে সাড়ে সাত লাখ ছাত্র ও শ্রমিকের ঐতিহাসিক মিলিত শোভাযাত্রা বার হয়। ছাত্র-শ্রমিকের ঐক্য আটষট্টির ফরাশি ছাত্র-আন্দোলনকে ভিন্ন এক মহিমা দিয়েছে। দশ লাখের মতো শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। শ্রমিকদের আন্দোলন প্যারিসে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ফ্রান্সের প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিক্ষোভ এতই স্বতস্ফূর্ত ছিলো যে, এতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের দরকার হয়নি। ছাত্র-শ্রমিকের মিলিত আন্দোলনে সমর্থন ছিলো চিকিৎসক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রমুখ সমস্ত স্তরের সকল মানুষের।

তবে বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এর বিপক্ষে ছিলেন। রেমন্ড অ্যারনের মতো বুদ্ধিজীবী একে স্রেফ 'উন্মত্ততা' 'খেয়ালখুশি' বলে উড়িয়ে দেন। অ্যারনের মতে, এই আন্দোলন কোন দিক থেকে বিপ্লবাত্মক নয়। মনে রাখা দরকার, ছাত্রদের বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যে ছিলো: 'বুদ্ধিবৃত্তি নিপাত যাক, বাস্তবে ফেরো' 'বি রিয়ালিস্টিক, ডিমান্ড দা ইমপসিবল' ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ একে বললেন 'সংস্কৃতিবিমুখ বর্বরতা',[২] কেউ বললেন, 'ফ্যাসিবাদী নৈরাজ্য'।

বুর্জোয়া মেশিনসমাজ, আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, অর্থনীতিচালিত হৃদয়হীন পরিবেশের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিরূপতার পরিণতি ফরাশি ছাত্র আন্দোলন। এর ফলে ফরাশি শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন আসে, সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা লাগে সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিতে। তার চেয়েও বড়ো কথা, ছাত্র আন্দোলনের এই পটভূমি বাদ দিয়ে ফুকো, দেরিদা, লিওতার বা উত্তরগ্রন্থনবাদী চিন্তাধারা যে বোঝা যাবেনা সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

উত্তরাধুনিকতা ও পোস্টস্ট্রাকচারালিজম আসলে মানবিক যুক্তিশীলতার প্রশ্নটি আবার বড়ো করে তুলেছে[৩]। এর ফলে দেখা দিয়েছে নতুন একটা আলাপ, বিচার এবং তর্ক;

আলাপ, কিন্তু সমঝোতা নয়: বিচার, কিন্তু মীমাংসা নয়। তবু এরই ভেতর আকারিত হয়ে চলেছে যুক্তিশীলতার নতুন বোধ ও উপলব্ধি: কোনো কণ্ঠ কাউকে ছাড়িয়ে যাবেনা—সবার টেক্‌স্টেই আছে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি, অনুমান, এবং অন্তর্দৃষ্টি[৪]। এরই মধ্যে ঐক্যও আছে একটা, তাহলো 'টেক্‌স্ট' নামক বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব। পোস্টমডার্ন মুহূর্তে লেখার চেয়ে পাঠের চ্যালেঞ্জটা বেশি, একদিকে এটা দার্শনিকতার ক্ষেত্রে একটা হুমকি, অন্যদিকে এই পাঠবিপ্লব বোধজগতেও পরিবর্তন এনেছে। তবে 'মানবিক যুক্তিশীলতা'র প্রশ্নটি পুনরুত্থিত হবার কারণ, 'হিউম্যানিজম' নামক শব্দ ও প্রকল্প বিষয়ে একালের ভাবুকদের বিতৃষ্ণা; কেননা ওটি বর্তমানে একটা 'নোংরা' শব্দে পরিণত[৫]। উল্টো এখন এটাই মনে করা হয় যে, আধুনিক পৃথিবীর যা কিছু ভ্রান্ত, তার নাম 'মানবতাবাদ'। 'হিউম্যানিজম'কে তাই কেউ কেউ বলেছেন 'কিংডম অফ ডার্কনেস' বা 'আঁধার-রাজ্য'।

হিউম্যানিজমের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সম্ভবত, মার্টিন হাইডেগার। হিউম্যানিজমের অন্তঃসার কেন নাস্তিবাদ, বা নাস্তিবাদী হতে বাধ্য, হাইডেগার দেখিয়েছেন। তিনি দেখান মানবতাবাদের হাত ধরে সেই নাস্তিবাদ কেন আজকের প্রয়োগবিজ্ঞানের যুগে আমাদের নিয়তি হয়ে ওঠে। তিনি বারবার হিউম্যানিজম-প্রপঞ্চের অস্পষ্টতা থেকে 'মুক্ত মৌলিক চিন্তায়'[৬] ফেরার কথা ভেবেছেন। তাঁর 'সত্তা'-সম্পর্কিত চিন্তা সেই ভাবনার পরিণতি। হাইডেগারের পর পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা হিউম্যানিজমের ঘোর কাটাতে চেয়েছেন: যদিও হিউম্যানিজম বিষয়ে ওরা সকলে একরকম কথা বলেননি। মানবতাবাদ থেকে 'মানুষ'-এ সরে আসার গল্প বলেছেন মিশেল ফুকো তাঁর 'দি অর্ডার অফ থিংস'-এ, এবইয়ের শেষপৃষ্ঠার শেষতম অনুচ্ছেদে ফুকোর অলংকারশোভিত বিবরণটি এরকম:[৭]

> 'ঈশ্বরের মৃত্যু নয়, কিংবা সেই মৃত্যু বিষয়ে মানুষের সচেতনতা নয়—নীৎশে বলেছেন একবারেই ভিন্ন একটা গল্প: তিনি ঈশ্বর-হত্যা ও হত্যাকারীর সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এ আর কিছু নয়, অট্টহাসিতে ফেটে পড়া।.......জ্ঞানের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে আমরা বুঝেছি যে, 'মানুষ' নামক বিষয় ও ভুবনটি একেবারেই সাম্প্রতিককালের আবিষ্কার। সম্ভবত সেটাও সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।'

এই পটভূমিতেই জাক দেরিদা 'সক্রিয় বিস্মরণশীল' (এ্যাকটিভ ফরগেটিং) নৃত্যের[৮] কথা বলেন, কেননা ওরকম বিস্মরণ ও ওই নৃত্যের মাধ্যমে ছুঁড়ে ফেলা যাবে 'মানবতাবাদ' নামক বিষয় ও ধারণা। তবে উত্তরাধুনিক চিন্তায় গ্রহণ-বর্জন বড়ো কথা নয়, বড়ো হলো তাতে সাড়া দেয়া: কেননা 'সাড়া' অন্যকে বুঝবার প্রথম শর্ত। এই সাড়া ঝুঁকিহীন নয়, কেননা নতুন আহবানে নিজের বিশ্বাসটুকু আর নির্দ্বন্দ্ব বা নির্মল থাকে না।

মিশেল ফুকো সেইরকম পোস্টমডার্ন ভাবুক, যাঁর চিন্তায় 'সাড়া' দেওয়া অনিবার্য। গ্রহণ বা বর্জন নয়, প্রশ্ন হলো সাড়া ও শ্রবণের। উত্তরাধুনিকেরা যেভাবে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করেছেন, ফুকো তা করেন নি: কিন্তু ফুকোর ইতিহাসপাঠ ভিন্ন। অতীত আর বর্তমানের সেতু রচনা ফুকোর লক্ষ্য নয়। ফুকো ইতিহাসের পারম্পর্য দেখতে চাননি, উল্টো। তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ইতিহাসের উল্লম্ফন, এবং তার জ্ঞানতাত্ত্বিক

বিচ্ছেদমুহূর্ত, গ্যাপ ও দূরত্ব। জ্ঞান ও ডিসকার্সিভ প্রাকটিসের মধ্যে কিভাবে তফাত তৈরি হয়, এবং বাড়তে থাকে, ফুকো তার মনোজ্ঞ আলেখ্য রচনা করেছেন। এইসব কথা হেঁয়ালির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু ফুকোর অন্তরঙ্গ একবার হতে পারলে কিছুই আর হেঁয়ালি থাকবেনা। ফুকো ইতিহাস লিখেছেন বটে, কিন্তু বেশ অন্যরকম; হেইডেন হোয়াইট তাই একে 'হিস্ট্রি' না বলে 'এ্যান্টি-হিস্ট্রি' বলেছেন।[৯]

মিশেল ফুকো নিয়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, তিনি কিছুতেই কোনো 'বর্গে' ধরা দেন না। ফুকো আসলে কি লিখেছেন? ইতিহাস? সমাজতত্ত্ব? দর্শন? কথকতা? মিশেল ফুকোর কাজ লাফিয়ে পার হয়ে গেছে সকল বৃত্তের সীমা, অন্যদিকে সকল ডিসকোর্সের শোভা ও সৌন্দর্য, তীক্ষ্ণতা ও লাবণি এসে মিশেছে তাঁর বয়ানকলায়। যেন তিনি ইতিহাসবিরোধি ঐতিহাসিক, যেনবা দর্শনবিরোধি দার্শনিক। ফুকো বারবার কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে আসেন সবাইকে, নির্দিষ্ট ফর্মের জ্ঞানের সম্ভবপরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, চকিতে এমন সব মুহূর্ত উদ্ভাসিত করে তোলেন যা পশ্চিম কখনো ভাবেনি; ফুকো জানিয়ে দেন নতুন নতুন প্রশ্ন, মুখোমুখি করেন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের, সর্বোপরি লিখতে এবং লেখাতে চান 'বর্তমানের ইতিহাস': অতীতের নয়, ভবিষ্যতেরও নয়, বর্তমানের। কেন? এজন্যে যে, বর্তমানকেই আমরা বুঝিনা; অতীত আমাদের জ্ঞাত (আমাদের মতো করে জ্ঞাত), ভবিষ্যত বিষয়ে আমাদের স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্ন আছে, কিন্তু বর্তমান বড়ো অস্পষ্ট। ফুকো তাই শৃংখলা, শাস্তির ধারাক্রম, আধুনিকায়ন, বৈধায়ন ও বিধিবদ্ধকরণের যুগান্তরগুলো আলোকিত করেন, যাতে আমাদের বসবাসের বর্তমান, আমাদের আজকের মুহূর্তটা, ধরা পড়ে কিংবা বোধগম্য হয়। আধুনিক পৃথিবীর অতীত-ভবিষ্যত নয়, বর্তমান, ক্রমশ স্ফটিকায়িত হতে থাকে ফুকোর দর্পণে। আধুনিক পৃথিবীতে 'জ্ঞান' কিভাবে তৈরি হলো এবং বিস্তৃত হলো, ফুকোর লেখাতেই তার আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে এ-ও সত্য, ফুকো যতো প্রশ্ন তোলেন ততোটা জবাব দেন না[১০]। ফুকোর প্রেরণায় আমরাও তৈরি করে নিই নতুন নতুন প্রশ্ন: জ্ঞান, ক্ষমতা, যুক্তি, স্বাধীনতা—সব বিষয়ে[১১]। ইতিহাস সেজন্যে ফুকোর কাজের একটা বড়ো উপকরণ; তবে, দর্শনের ইতিহাসে ফুকোর উৎসাহ নেই, তিনি দেখাতে চান 'ইতিহাস' কি করে 'দর্শন'কে সম্ভবপর করে তুলেছে।[১২]

মিশেল ফুকোর লেখা ও লেখার ভাষা দেরিদার মতো নয়। ফুকো সহজ ভাষায় লেখেন, এবং তাঁর কাজের বিষয়-আশয় চেনা-জানা থাকলে তাঁর লেখা ফিকশনের মতো মজাদার। ফিকশন বলবার কারণ টেকস্টের উদ্দেশ্যশূন্যতা, বলতে পারি সচেতন উদ্দেশ্যহীনতা। উদ্দেশ্যবাদী টেকস্ট বরাবরই ফুকোর অপছন্দ। ফুকো বিরাট বিরাট দর্শন অথবা ইতিহাসের সমস্যার সমাধানে অনুৎসাহী, যদিও সমাধান যে নেই তা কিন্তু নয়; তবে প্রথম থেকে একটাই ফুকোর বাসনা: আধুনিক সমাজ তার জনগোষ্ঠিকে কিভাবে জ্ঞানের দাবি ও মানববিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমে শৃংখলাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ করে, তার কার্যকারণসূত্র উদ্‌ঘাটন করা। চিকিৎসাশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, অপরাধবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলন সমাজনিয়ন্ত্রণে যে কার্যকর ভূমিকা রাখে ফুকো সাবলীলভাবে আমাদের তা বুঝিয়ে দেন।

" দি প্যাশন অফ মিশেল ফুকো" (নিউ ইয়র্ক ১৯৯৩) বইতে জেমস মিলার ফুকোর কাজ ও ফুকোর জীবনকে অপরূপ সম্পর্কে যুক্ত করে দেখেছেন। জীবনীকার মিলার প্রমাণ

করেছেন, ফুকোর কাজ ফুকোর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। নীৎশের একটা কথা ছিলো : 'প্রত্যেকে যা, তাই তার হওয়া উচিত'। ফুকোর জীবন ও কাজের পরস্পরিত পাঠ নীৎশের অজেয় উক্তি আক্ষরিক অর্থেই 'সত্য' করে তোলে। মিশেল ফুকোর সারাজীবনের সংগ্রাম নিজের নিজস্বকে অধিকার করার সংগ্রাম; তা ছাড়া তাঁর জীবন যাপনের বৈচিত্র্য যেমন বোঝা যায় না, তাঁর আপাত বিশৃংখল কাজের ডিসিপ্লিনও ধরা যায় না। জীবন বিষয়ে অদ্ভুত সব বাসনা ছিলো ফুকোর, একটিমাত্র জীবনে সেই বাসনা তিনি চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন। ফুকোর টেক্সট এবং তাঁর যাপিত জীবনের মধ্যে মিল আছে বিরাট। ফুকোর রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিভিন্নরকম বদল আছে, কিন্তু ফুকোর 'জীবনী' এড়িয়ে তাঁর বিশ্বাসের পরিস্থিতি আন্দাজ করা কঠিন হতে পারে।

ফুকোর কাজ ও অভিজ্ঞতা যে পরস্পরিত, তার মস্ত প্রমাণ ফুকোর টেক্সট ও জীবনের আশ্চর্য সঙ্গতি ও অনুবৃত্তি। ফুকো অভিজ্ঞ মানুষ, এবং অভিজ্ঞতাবাদী লেখক। ফুকো নিজেই অসম্ভব গুরুত্ব দেন অভিজ্ঞতার ওপর, কেননা, তাঁর ভাষায়, অভিজ্ঞতা সবসময়েই একটা চিন্তাযোগ্য ব্যাপার; তার মতে: অভিজ্ঞতা তৈরি হয় 'সত্যের খেলা'র (গেম অফ ট্রুথ) মধ্যে দিয়ে। কিন্তু 'সত্যের খেলা' কথাটি আসছে কেন? এ জন্যে যে, ফুকোর মতে, 'সত্য' মানবিক কাজকর্মের একটা অংশ, জীবনেরই একটা 'ফর্ম' হচ্ছে সত্য; কিন্তু সত্যের নিয়মগুলো নির্দিষ্ট নয়; সবার জন্যে সত্যের সমান আবেদন নেই। তারই সঙ্গে আছে আবার সত্যের বহুরকম খেলা—কখনো তা বৈজ্ঞানিক, কখনো রাজনৈতিক, কখনো কাব্যিক, কখনো মনস্তাত্ত্বিক। 'অভিজ্ঞতা' সবসময়েই চিন্তার ইতিহাসের কেন্দ্রে: কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সমকালে পরীক্ষিত হয় না, তার জন্যে চলতে থাকে অপেক্ষা, এবং একসময় যাচাই বাছাই হয় সব, নতুন নতুন প্রশ্ন ওঠে, কৌতূহল জাগে, বিভিন্ন শোধন, জিজীবিষা আর শ্রমের মাধ্যমে তা পুনর্জাত হয়, এবং নবরূপ পায়: আর তখনি গড়ে ওঠে তাজা বোধ, সপ্রাণ উপলব্ধি, সেই সঙ্গে চলে একই জিনিসের অন্তহীন অধিবিচার: মিশেল ফুকো চিন্তার ইতিহাসকে এইভাবে দেখেছেন।

ফুকো বলেন, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র আর অনুশীলনের পরিসরে তফাত থাকে; অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অসীম আর সমস্যাসংকুল, কিন্তু অনুশীলনে বেঁধে দেওয়া যায় সীমানা। সত্যের কোনো না কোনো 'খেলা' নিয়ে চ্যালেঞ্জ চলে, তাছাড়া ওর ভেতর বদলের স্বপ্ন-দর্শনও সম্ভব, কেননা মানুষ স্বপ্ন দেখে, কেননা খেলার কানুন মানুষ কখনো কখনো বদলাতে চায়। 'দি বার্থ অফ দি ক্লিনিক' এবং 'দি অর্ডার অফ থিংস' গ্রন্থদ্বয়ে মিশেল ফুকো সত্যের বিভিন্ন 'গেম' পাঠ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ক্লিনিকাল এনাটমি, অর্থনীতি, ভূ-তত্ত্ব, বনবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্ব আলাদা আলাদা ডিসকোর্স হিশেবে সংহত হলো এবং কিভাবে তা থেকে উদ্ভূত হলো বোধের নতুন নতুন ধরন, তৈরি হলো উপলব্ধির নতুন নতুন নিয়ম, জন্ম নিলো প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান। জীবনের শেষ পর্বের দুটো লেখায়—'দি ইউজ অফ প্লেযার' এবং 'দি কেয়ার অফ দি সেলফ'—ফুকো দেখান কিভাবে সোক্রাতেস থেকে সেনেকা পর্যন্ত সকল দার্শনিক নিজেদের ব্যক্তিগত সত্যস্বরূপ বিস্তৃত করেছেন, নিজ নিজ জীবনে ফলিয়ে তুলেছেন শৃংখলা ও সৌন্দর্য।

'ম্যাডনেস এন্ড সিভিলাইজেশন' বইতে ফুকো নীৎশের পদাঙ্ক ধরে যাত্রা করেছেন। যা কিছু আমরা এড়িয়ে যাই, যাকে মনে হয় অযুক্তি অথবা উন্মাদনা, যা অব্যাখ্যাত, যা হেঁয়ালি—সেইসব মানবব্যাপারকে ফুকো বুঝবার চেষ্টা করেছেন সাদ, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, ব্রেঁতো, জর্জ বাতিল্লির জীবন ও টেকস্টের অনুকম্পায়। ফুকোর মনে হয়েছে, এমন ব্যাপার জীবনে নিশ্চিত ঘটে, যা লিখে ফেলা যায় না, কারণ তা লেখকের অস্তিত্বের মূলে থাকে, এবং তা হলো অভিজ্ঞতার স্তর, এবং তা জীবনের একেকটা ত্যাগ ছাড়া কিছু নয়। ফুকোকে জেমস মিলার তাই চিহ্নিত করেছেন 'স্বদেশে পরবাসী' বলে: কেননা যদিও ফুকো বক্তৃতা বিবৃতি, সামাজিক কাজ, এটা-ওটা করেছেন, তবু নিজের নির্জনে ফুকো ছিলেন 'অভিজ্ঞতা' নামক নাটকের আশ্চর্য কুশীলব: স্বপ্ন দেখা, উন্মাদনা, অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি, বিরংসা, ড্রাগ, ভোগান্তি, জৈবতার সহযোগ ও সম্মিলনে জীবনের একেকটা পাঠে পৌঁছুতে চেয়েছেন তিনি।

মিশেল ফুকো নিজের কাজ সম্পর্কে তিনটি মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন:

(এক) কোনো একটা মাত্র পদ্ধতি দিয়ে আমার কাজ বোঝা যাবে না। কারণ, আমার টেকস্টের কোনো ধারাবাহিক সুশৃংখল তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।

(দুই) এমন একটি লেখাও আমি লিখিনি, যা অংশত হলেও, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয়নি। এই অভিজ্ঞতার ভেতর মৃত্যু, যৌনতা, উন্মাদনা—অর্থাৎ সবরকম অপরাধবৃত্তি আছে।

(তিন) তবে অভিজ্ঞতাজাত হলেও, টেকস্টে তার রূপান্তর ঘটেছে। রূপান্তরের পর, অবশেষে, এমন রূপ নিয়েছে, যার মধ্যে সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব, স্বাভাবিক ও কাম্য।

মিশেল ফুকোর আত্মজীবনের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। বিখ্যাত মার্কসিস্ট ভাবুক লুইস আলথুসার ছিলেন ফুকোর শিক্ষক; বিশ বছর বয়সে গুরুর নির্দেশে ফুকো ফরাশি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টিতে তিনি ছিলেন চার বছর (১৯৫০-৫৪); কিন্তু দলীয় রাজনীতি ফুকোর পোষায়নি। চার বছরের মাথায় ছাড়লেন দল, বললেন: 'আমি একজন সমকামী মানুষ, আমার পক্ষে এ ধরনের রাজনীতি অসম্ভব: তাছাড়া আমি দেখেছি কমিউনিস্টরাও বুর্জোয়াদের মতো বিভিন্ন মূল্যবোধে বেশ বিশ্বাস করে।' একই মূল্যবোধ তিনি দেখেছেন সুইডেনে, কম্যুনিস্ট প্যোলান্ডে (১৯৫৫ ও ১৯৫৮ সালের মধ্যে এই দুই দেশে তিনি ছিলেন)। জার্মানিতে এক বছর কাটিয়ে ১৯৬০ সালে দেশে ফিরলেন ফুকো, খানিকটা বদলে গেছেন যেন, একেবারে মূর্তিমান অধ্যাপক। এ সময় ফুকোর সঙ্গে ডানিয়েল ডেফার্ট নামক এক জঙ্গী তরুণ বিপ্লবীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে তিনি বাতিল্লি, আর্তো, ক্লসওভস্কি, ব্লানশট সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, যৌনতা-উন্মাত্ততা-স্বপ্ন-পাগলামি বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, তার সঙ্গে ফুকোর ব্যক্তিগত জীবনের নিশ্চিত একটা যোগাযোগ আছে।

পঞ্চাশের দশকে দলীয় রাজনীতি তিনি ছেড়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতি তাঁকে ছাড়েনি। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। ফুকো তখন তিউনিশে থাকেন, তিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। মার্চ ১৯৬৮-তে হাঙ্গামা শুরু হয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফুকোর মনে হলো 'এ যেন বইয়ের বাইরে ও বিরুদ্ধে জীবনের অদ্ভুত ও অসম্ভব জেগে ওঠা'।

ছাত্রদের. এই সংঘাত তাঁর দৃষ্টিতে, 'অস্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ'। বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসবাদ পড়াচ্ছিলেন তিনি, গুরু আলথুসারের মার্কসবাদ: হাঙ্গামার তোড়ে কোথায় তা ভেসে গেলো। ফুকো বিদ্রোহী ছাত্রদের সাহায্য করেন, অনেক ছাত্রকে গ্রেফতারি এড়ানোর সুযোগ করে দেন। এর দশ বছর পরে, ১৯৭৮ সালে, তিনি স্বীকার করেছেন: প্রত্যক্ষ এই রাজনীতি নতুন উপলব্ধি এনে দেয় তাঁর মধ্যে। তিউনিশে (মার্চ ১৯৬৮) যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা দেখেছিলেন ফুকো, তার চেয়েও ভয়াবহ একই সময়ের ফরাশি ছাত্র আন্দোলন (মে ১৯৬৮), যার কথা আগে বলেছি। ফুকোর তরুণ বন্ধু ডানিয়েল ডেফার্টও ফরাশি ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। দুই ভিন্ন দেশের ছাত্র আন্দোলন ফুকোকে অনেকখানি বদলে দেয়; তিউনিশের ঘটনার কয়েক মাস পর তিনি দেশে ফেরেন, এবং র‍্যাডিকাল রাজনীতিতে জড়িয়ে যান। পাঁচ পাঁচটি বছর ফুকো রাজনীতি করেছেন। একদা যৌনতাকে জীবনের মধ্যে দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি, এবার তারই মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করলেন রাজনীতির পাঠ।

মিশেল ফুকো মোটেও লেভি-স্ত্রোসের মতো নন। লেভি-স্ত্রোসের সামাজিক জীবন ব'লে কিছু ছিলো না। তিনি সবরকম সামাজিক/রাজনৈতিক সম্পৃক্তি এড়িয়ে চলতেন। লেভি-স্ত্রোস নিজেই বলেছেন, 'আমার কোনো সামাজিক জীবন নেই। নেই কোনো বন্ধু-বান্ধব। আমার সময়ের অর্ধেক কাটে ল্যাবরেটরিতে, অর্ধেক অফিসে'।[১৩] জাঁ-পল সার্ত্র যখন সন্ত্রাস ও বামপন্থা নিয়ে ঘোরতর তর্ক করছেন আলবেয়ার কামু, রেমন্ড অ্যারন ও মার্লো-পোন্তির সঙ্গে, লেভি-স্ত্রোস তখন 'আদিম ধর্ম' সম্পর্কে ক্লাশঘরে বক্তৃতায় মগ্ন। ১৯৬৯ সালে সার্ত্র যখন আলজিরিয়ার যুদ্ধের প্রতিবাদে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন, লেভি-স্ত্রোস তখন কলেজ দ্য ফ্রান্সে প্রথম নৃ-বিজ্ঞানী হিশেবে নিয়োগ পেয়ে আনন্দিত। আটষট্টির ছাত্র বিদ্রোহ (মে ১৯৬৮) সার্ত্রকে টেনে আনে রাস্তায়, বিপরীতে লেভি-স্ত্রোস সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত। মধ্য-সত্তর-এ সার্ত্র যখন বামপন্থী সাংবাদিক-নিগ্রহের বিপক্ষে প্রচন্ডভাবে বলছেন, লেভি-স্ত্রোস তখন সানন্দে গ্রহণ করছেন রক্ষণশীল ফরাশি আকাদেমির সদস্যপদ। মিশেল ফুকো, সার্ত্রের মতো অতোটা না হলেও, লেভি-স্ত্রোসের চেয়ে অনেকগুণ বেশি র‍্যাডিকাল ছিলেন।

মিশেল ফুকো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন, মিছিলে গেছেন, পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন, উত্তেজক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন, একাধিকবার গ্রেফতারও হয়েছেন। ফুকো সাহসীও ছিলেন খুব, শারীরিক সামর্থ্যও ছিলো। ফুকোর রাজনৈতিক দলের নাম 'জি. পি' : আটষট্টির শেষের দিকে এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন এক তরুণ সশস্ত্র বিপ্লবী বেনি লেভি। আটষট্টির মে মাসে যেসব লোকেরা আন্দোলন করেছিলো তাদের অনেকে এসে এ দলে যোগ দেয়: তাদের কেউ কেউ নৈরাজ্যবাদী, কেউ কেউ আল্ট্রা-মার্কসিস্ট। জি. পি. বড়ো কোনো রাজনৈতিক দল ছিলোনা বটে, কিন্তু বেশ সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিলো। মে আটষট্টির আন্দোলন ও অঙ্গীকারকে অগ্রসর করে নেওয়া ছিলো জি. পি. র লক্ষ্য। মিশেল ফুকো, ডানিয়েল ডেফার্ট ও জি. পি.র সদস্যরা মিলে কয়েদীদের কারাবিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করেন; ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ফ্রান্সে যে ক'টা কারাবিদ্রোহ হয়, তার নেপথ্যে, কোনো না কোনোভাবে, এরা সক্রিয় ছিলেন।

সত্তরের প্রথমদিকে (১৯৭০-৭২) ফুকোর কথাবার্তা, আক্ষরিক অর্থেই, আমূলবাদী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে এক ফরাশি ম্যাগাজিনে ফুকো বলেন: পশ্চিমের সভ্যতায় যা কিছু ক্ষমতার বাসনাকে রোধ করে, তারই নাম 'হিউম্যানিজম'। তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য, ফুকো বলেন, ক্ষমতার ইচ্ছা ও বাসনার বিষয়টাকে বদলে দেয়া। ফুকো বলেন: সমাজের ঐক্য, সমাজের সংহতি, সমাজের একাত্মতা ইত্যাদি যেসব কথা বাজারে চালু, তার সবই ধ্বংস করে দেয়া দরকার। বিভিন্নভাবে তা হতে পারে, যেমন ট্যাবুর উৎখাত, লৈঙ্গিক সীমালংঘন, 'সেক্স'-এর ভেদলুপ্তি—এককথায় আধুনিক সভ্যতা যা যা বাদ দিতে বলে, তাকে গ্রহণ শুধু নয়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা[১৪]। 'জি. পি.' ছিলো অনেকটা ইতালির 'রেড বিগ্রেড' কিংবা জর্মনির 'বেডার-মেইনহফ' সংঘের মতো: সন্ত্রাস, অপহরণ, নৈরাজ্য—কোনোটাই 'জি. পি.'-র অপছন্দ ছিলো না। একবার (১৯৭২) এক অফিসারকে অপহরণ করে জি. পি. (নিজেদের এক কর্মীর মৃত্যুর বদলা হিশেবে); কিন্তু চারদিকে, বিশেষত মার্কসিস্ট মহলে, সমালোচনা শুরু হলে ছেড়ে দেয়। তবে রাজনীতিতে সন্ত্রাস কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে জি পি র আভ্যন্তর মতভেদ ছিলো বিস্তর। ফুকো জি. পি. র নৈরাজ্যবাদের অসমর্থক ছিলেন না, ফরাশি বিপ্লবের সেপ্টেম্বর-ম্যাসাকারকেও ফুকো সমর্থন করেছেন। এ সময়ের ফুকোকে মনে হবে ফ্যাসিবাদের সমর্থক; নাৎসী দার্শনিকেরা যে রকম ডায়োনেসীয় বিদ্রোহের ফ্যান্টাসি তৈরি করেছিলেন, তিনিও তেমনি মেনে নেন ত্রাসতন্ত্র, অ-ব্যবস্থা, নৈরাজ্যবাদ।

জীবনের শেষপর্বে মিশেল ফুকোর চিন্তা অন্যাখাতে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। আমেরিকার 'গাই লিবারেশন' ফুকোকে অনুপ্রাণিত করে, এবং তিনি মানুষের শরীর ও তার ব্যবহার ও তার আনন্দ নিয়ে ব্যাপকভাবে ভাবতে শুরু করেন। ফুকোর বিশ্লেষণে শরীরও রাজনৈতিক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত; রাজনীতির এই নতুন প্রকরণ তিনি ফ্রান্সে নয়, আমেরিকায়, আবিষ্কার করেন। ১৯৭৫ সালের পর থেকে রাজনীতি বিষয়ে ফুকো ফ্রান্সে যেসব কথাবার্তা বলেন, তা আগের চেয়ে অনেক বেশি শোভন ও সম্ভ্রান্ত; তাতে আগের মতো ঝাঁজ, তীব্রতা এবং তেজ নেই। শালীন বিবেচকের মতো ফুকোর কথাবার্তা: সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, ভিয়েতনামের মানুষদের সমর্থন করেছেন, পোল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষাবলম্বন করেছেন। জেমস মিলার রসিকতা করে লিখেছেন, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে ধরনের বক্তৃতা বিবৃতি ছাপে, ফুকোর কথাবার্তা সেইরকম হয়ে উঠেছিলো প্রায়। শ্রেণীকক্ষেও ফুকো বেশ লিবারাল। তারপরও, প্রথাগত অর্থে লিবারাল হওয়া অসম্ভব ছিলো তাঁর পক্ষে। অন্যদিকে, এসময়, বিপ্লব কিভাবে অন্তর্ঘাতী হয়, কিভাবে তা নিজের বিরুদ্ধে চলে যায়, ১৯৭৮ সালের 'ইরান বিপ্লবের' উদাহরণ থেকে ফুকো তা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। সবসময়ে তিনি ভেবেছেন জীবনযাপনের নতুনত্ব নিয়ে; লিবরালিজম তাঁকে বেশিদিন মাতিয়ে রাখতে পারেনি; কান্টের বিশ্বজনীনতায় তিনি আগাগোড়া সংশয়ী; অবশেষে, নতুন জীবনের খোঁজ পেলেন তিনি আমেরিকার 'গাই পলিটিক্স'-এ। 'গাই লিবারেশন মুভমেন্ট'কে তাঁর মনে হয়েছে 'পলিটিক্স অফ দি সেলফ', এবং এই রাজনীতিকে তিনি ভেবেছেন নতুনরকম জীবনের একটা বর্ণাঢ্য উপক্রমণিকা।

মিশেল ফুকো মনে প্রাণে অভিজ্ঞতাবাদী লেখক। ফুকো বিশ্বাস করেন, আইডিয়া ও অস্তিত্বের আন্তঃনির্ভরতা ছাড়া দর্শনের জন্ম হয়না। জীবনের প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার বিস্তার কাম্য, কিন্তু শর্ত হচ্ছে নিরীক্ষা, অন্তহীন নিরীক্ষা। সেই নিরীক্ষা ফুকো করেছেন, এবং তাঁর কথা হলো, প্রতি পদক্ষেপেই এটা দরকার; মানুষ ভাববে, এবং ভাবনার সঙ্গে তার যুদ্ধ হবে; নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাতকে ফুকো খুব গুরুত্ব দেন। সেজন্যে এক ডিনারে (মার্চ ১৯৮৩) হেবারমাস যখন, হাইডেগারের নাজী-ইনভলভমেন্ট নিয়ে তর্ক তোলেন, ফুকো মোটেও উৎসাহবোধ করেন না। নিরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোথাও পৌছুনো যায় না, এটাই ফুকো বলতে চান।

দুই

"শুদ্ধ যুক্তির অধিবিচার" বইয়ের ভূমিকায় ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন, 'আমাদের সময়টা মূলত সমালোচনার, আমরা সমালোচনা যুগের বাশিন্দা; সমালোচনা, কেবল সমালোচনার কাছেই, আমাদের সবকিছু বন্ধক রাখতে হবে।' আধুনিকতার পরিণতিতে সেই সমালোচনা কতো তীব্র, তীক্ষ্ণ ও তির্যক হয়েছে মিশেল ফুকোর লেখা তার অভ্রান্ত উদাহরণ। ইতিপূর্বে বলেছি, ফুকো প্রশ্ন করেন বেশি, জবাব দেন কম; কান্ট যে দার্শনিক প্রশ্নমুখরতার কথা বলেছেন, কান্টের বিরোধি হয়েও ফুকোর টেকস্ট প্রশ্ন আর প্রশ্ন আর প্রশ্নে মুখর। কিন্তু ফুকোর লেখা বারবারই নিজেকে অতিক্রম করে গেছে, ভাবনার বদল, ঝোঁক, আকস্মিকতা ও নতুনত্ব ফুকোকে একস্থানে স্থির রাখেনি। তার সঙ্গে রয়েছে নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান—ক্রমাগত এবং অফুরন্ত। ফুকো এজন্যে একদিকে বিব্রত, অন্যদিকে হতাশ করেন। তাঁর টেকস্টের উল্লম্ফনে বিব্রত হতে হয়; তাছাড়া সারসংক্ষেপে ফুকোর টেকস্ট কখনো ধরা দেয় না। পড়ার সময় যখনি মনে হয় এই বোধ হয় তিনি বলতে চান, কিংবা এইমাত্র তাঁকে বোঝা গেলো—তখনি, তার পরের শব্দ কিংবা বাক্যেই, দেখা যাবে মিশেল ফুকো চিন্তার অন্য সড়ক ধরেছেন।

ফুকো আলোকপর্বের অধিবিচার করেছেন (ক্রিটীক অফ এনলাইটেনমেন্ট), এবং 'এনলাইটেনমেন্ট ব্লাকমেইলে'র তিনি ঘোর বিরোধি।[১৫] তবে এ বিরোধিতা কোনো সরল সংঘর্ষ নয়; সরল 'হ্যাঁ' বা নির্বোধ 'না' নয়। উত্তর-মার্কসবাদীরা যাকে 'ক্রিটীক' বলেন, এ হলো তাই। ফুকোর 'পাগলামির ইতিহাস' নামের বইখানা এই প্রকল্পের আকর্ষণীয় উৎপ্রেক্ষা।

যদিও দেরিদা মেলা তর্ক করেছেন যুক্তির ভাষায় কি করে উন্মাদনার বৃত্তান্ত লেখা সম্ভব,[১৬] তবু এ বিষয়ে সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থরচনা ফুকোরই সাজে। পাগলামির ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে দেরিদা যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছেন, ফুকো তা জানতেন; কিন্তু দেরিদার নিষ্ঠুর ডিকনস্ট্রাকশন পড়ে মনে হয় 'লেখা' জিনিশটাই ক্ষতিকর ব্যাপার। ক্ষতিকর এ জন্যে যে, 'লেখা' দিয়ে যেন কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাগলামি নিজে যদি নিজের ইতিহাস লেখে, সেইটেই হবে, দেরিদার মতে, তার আসল ইতিহাস। যুক্তির ঐতিহ্যোদ্ভুত ভাষায় পাগলামির ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে কিনা, ম্যাডনেস আর সাইকিয়াট্রি এক হয়ে উঠছে কিনা—ফুকো সচেতন ছিলেন। পাগলামির ইতিহাস মূলত আধুনিকতার ঐতিহ্যের একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদ গুরুত্বপূর্ণ এ

জন্যে যে, আধুনিকতার মানচিত্রে উন্মাদনা, অযুক্তি, পাগলামি ও অ-ব্যবস্থা গ্রাহ্য হয়নি। অথচ পাগলামির দীর্ঘ একটা ধারাক্রম ও উত্তরাধিকার আছে, মানবসভ্যতায় 'পাগলামি' নামক মানবিক অভিজ্ঞতার মূল্য নগণ্য নয়। কিন্তু এই উপেক্ষার মূলে আছে আলোকপর্বের অনুশাসন ও প্রতিপত্তি, ফুকোর ভাষায় 'ব্লাকমেইল অফ এনলাইটেনমেন্ট'। এই বিদ্রূপের একটা টার্গেট, অন্তত, হেবারমাস। হেবারমাস জবাবে বললেন, ফুকোর অর্ন্তদৃষ্টি অসাধারণ হলেও অধিকাংশসময় তাঁকে 'পারফরমারে'র মতো লাগে। দেরিদা-ফুকোর পারফরমারশোভন বৈপরীত্যকে হেবারমাস ভীষণ অসুবিধেজনক মনে করেন। হেবারমাসের মতে, যে কোনো বিষয়ের অধিবিচার হতেই পারে, কিন্তু সেই বিচারের একটা সুস্পষ্ট ভিত্তি লাগবে। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে কোন উদ্দেশ্যে কি বলতে চাই, সেটা বাদ দিয়ে 'বিচার' চলতে পারে না। অথচ মিশেল ফুকো যাবতীয় ভিত্তি, মান, আদর্শের বিরুদ্ধে; যে-কোনো ধরনের 'অবস্থান'কে ফুকো সন্দেহ করেন। তিনি বলেন, আধুনিক সমাজের ডিসকোর্সগুলো ওরকম অবস্থাননির্ভর বলেই তাতে একটিমাত্র প্রান্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, অন্য প্রান্ত মর্যাদা পায়নি। আধুনিক সমাজে এভাবেই তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকায়ন—শাস্তি, প্রথা, নিয়ম, আইন, আচার, রীতি-নীতি বিশ্বাসের স্বাভাবিকায়ন; আধুনিক সমাজে এভাবে নিষ্ঠুরতার নিয়মতন্ত্র ও স্বাভাবিকতা তৈরি হয়েছে। সেজন্যেই ফুকো যুক্তি/ভিত্তি/অবস্থানকে এতোটা অগ্রাহ্য করেছেন; সেজন্যে হেবারমাসের চোখে যা দোষ, সেটাই ফুকোর বিশেষত্ব: আধুনিক সমাজের যুক্তিশীল শাস্তি, নির্যাতন ও শৃংখলের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের পর 'নরমেটিভ ফাউন্ডেশনে' আস্থা রাখা ফুকোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ 'নরমেটিভ ফাউন্ডেশনে'র মাধ্যমে তৈরি হয় স্বাভাবিকতা, কিংবা স্বাভাবিকায়ন; তৈরি হয় ঝকঝকে সুশৃংখল সমাজ; যে সমাজ যতো ঝকঝকে, এবং সুশৃংখল, সে সমাজে নির্যাতন ততো বেশি, কেননা নির্যাতন সেখানে শৃংখলাবদ্ধ, বিচিত্র, কুশলী। ফুকোর কথা হলো: বিচারের (ক্রিটীক) ক্ষেত্রে ভিত্তিকে এতোটা মূল্য দেওয়ার দরকার নেই, তাকে বাদ দিয়েও বিচার দেখা দিতে পারে, এবং সনাতন পদ্ধতির না হয়েও সেই বিচারের মূল্য যথেষ্ট।

মিশেল ফুকো 'বর্তমান' নিয়ে ভেবেছেন, 'বর্তমান' নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি অতীত পর্যটন করেছেন, বর্তমান তার তুলনার কতো আলাদা তা নির্দেশ করার জন্যে। 'বর্তমান'কে সকল চিন্তার কেন্দ্র মনে করেন ফুকো; এবং তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বর্তমানের বৃত্তান্ত। ফুকো তাঁর সকল লেখায় ভবিষ্যতের আবেদন বিষয়ে নীরব কিংবা নিস্পৃহ। কারণ, 'ভবিষ্যত' নামক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আশাবাদ, স্বপ্ন, সম্ভাবনা, এবং এগুলোর কোনো দরকার নেই। এনলাইটেনমেন্টের ভাবনালোকে এই আশাবাদ ছিলো প্রবল; মানুষ কি জানবে বা জানা দরকার; মানুষ কি করবে বা করা দরকার; মানুষ কি স্বপ্ন দেখবে এবং কেন দেখবে—ইত্যাদি তার মূল প্রসঙ্গ।[১৭] ফুকোর মতে, 'আধুনিকতা' কোনো ঐতিহাসিক সময়, মুহূর্ত, বা পর্ব নয়, আধুনিকতা একটা 'মুড', যে 'মুড' প্রবলভাবে যুক্ত সমকালের বাস্তবতার সঙ্গে। আধুনিকতার 'মুড'-এ সমকালের মুহূর্ত ও সমকালের বর্তমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আধুনিকতার নায়কের নাম

'বর্তমান'। আধুনিকতার বর্তমান যেমন সত্য, এবং বাস্তব, তেমনি তার সঙ্গে মিশে থাকে কল্পনারও অনেক অংশ; 'কল্পনা' বর্তমানকে নতুনরূপে রচনা করে, তাকে বদলায়, তাতে রূপান্তর আনে। মিশেল ফুকো বলেন, বোদলেয়ারের দৃষ্টিতে 'আধুনিক' মানুষ সে নয়, যে নিজেকে আবিষ্কার করতে উৎকণ্ঠ, যে তার লুকানো সত্য খুঁজে পেতে উদগ্রীব; বরং সে-ই বোদলেয়ারের আধুনিক মানুষ, যে নিজেকে আবিষ্কার নয়, উদ্ভাবন করতে চায়; নিজেকে 'প্রডিউস' করার মতো বিরাট দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।[১৮] ফুকোর মতে, মানুষের এমন কোনো 'গোপন অন্তঃসার' বা হিডেন এসেন্স নেই, যা খুঁজে বার করতে হবে; অমন অন্তঃসার কখনোই থাকেনা যা মানুষকে মুক্ত করবে, স্বাধীনতা দেবে, স্বপ্ন দেখাবে। কি লুকিয়ে আছে, তার জন্যে ব্যগ্রতা অবান্তর;' মানুষের দরকার, নিজেকে অনবরত উদ্ভাবন করে চলা। একে যদি ফুকোর দর্শন বলি—বলতেই হবে—দেখা যাবে তা অগ্রজদের দর্শন থেকে কতো আলাদা, এবং কতো বিপরীত। গভীরতার বদলে সাম্প্রতিকতা, স্বপ্নের বদলে অবিশ্বাস, নিমজ্জনের বদলে চৈতন্য, এবং অন্তঃসারবাদের বিপরীতে উদ্ভাবনশীলতা ফুকোর টেকস্টের চরিত্রনির্দেশক প্রান্ত।

'এনলাইটেনমেন্ট ব্ল্যাকমেইলে'র কঠোর সমালোচনা করেছেন ফুকো; তবে 'এনলাইটেনমেন্ট' ও 'হিউম্যানিজমে'র মধ্যে যে তফাত আছে, ফুকো তা স্বীকার করেন। 'হিউম্যানিজম' বলতে ফুকো বুঝেছেন এমন বিষয়, যা মানুষকে ধর্মের মোড়কে, কখনো রাজনীতির মোড়কে, কখনো বিজ্ঞানের মোড়কে দেখার চেষ্টা করেছে।[১৯] খ্রিস্টিয় মানবতাবাদ থেকে নাজী হিউম্যানিজম পর্যন্ত মানবতাবাদের অনেক রূপবদল রঙবদল আছে। কিন্তু হিউম্যানিজম ও এনলাইটেনমেন্ট এক জিনিশ নয়। কেননা 'এনলাইটেনমেন্ট', অধিবিচারের (ক্রিটীক) একটা পদ্ধতিও বটে, যে অধিবিচার আমাদের বিকাশের এক ব্যাকরণ তুলে ধরে; সন্দেহ নেই এই অধিবিচার ও ব্যাকরণ মানবতাবাদী সূত্রের সম্পূর্ণ উল্টো।[২০] অবশ্য 'অধিবিচার' বা 'সমালোচনা' বলতে ফুকো কি বোঝেন বা বোঝাতে চান, সেইটে আগে পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ফুকোর মতে, সমালোচনা এমন কোনো অনুসন্ধান বা অনুশীলন নয়, যা প্রাক্তন কোনো 'স্ট্রাকচারে'র খোঁজে উদগ্র হবে; এমন কোনো 'স্ট্রাকচার' যা দৃঢ়, সংহত, বিশ্বজনীন। 'সমালোচনা' বলতে বহুকাল ধরে যা বোঝানো হচ্ছিলো, অর্থাৎ বিশ্বজনীন মূল্যসম্পন্ন স্ট্রাকচার-সন্ধান, ফুকোর মতে তা অচল।

'সমালোচনা' যে এক ধরনের অনুসন্ধান, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই সন্ধান 'উত্তরণধর্মী' নয়; 'উত্তরণে'র সঙ্গে সমালোচনার সম্পর্ক নেই। চমৎকার একটা বাক্যে সমালোচনার সংজ্ঞা দেন তিনি, বলেন: সমালোচনা এমন জিনিশ, যা 'নকশা'র দিক থেকে জেনিয়েলজিকাল বা কুলুজিমূলক, পদ্ধতির দিক থেকে আর্কেওলজিকাল বা প্রত্নতাত্ত্বিক। আমি বা আমরা যা, কিংবা যেরকম, কিংবা যেসবের সঙ্গে আমি বা আমরা যুক্ত বা বন্দী বা বিধ্বস্ত, তার সঙ্গে অনবরত বিচ্ছেদ গড়ে তোলার নাম 'সমালোচনা'। নিরীক্ষা ছাড়া এ কাজ অসম্ভব, তাই সমালোচনার সঙ্গে নিরীক্ষা নিবিড়ভাবে যুক্ত। ফুকোর এইসব কথা হঠাৎ হেঁয়ালির মতো বোধ হলেও, নিজের রচনায় ফুকো এই কাজগুলোই করে গেছেন।

ফুকোর তত্ত্বকে উদাহরণের মধ্যে দিয়ে বুঝতে হলে তার 'দি অর্ডার অফ থিংস' 'দি আর্কেওলজি অফ নলেজ' 'ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ' ইত্যাদি খুলে বসা দরকার। যে সমালোচনা পরিবর্তনকে, সম্ভবপর, এমনকি বাঞ্ছিত, করে তুলতে পারে না, সে সমালোচনা ব্যর্থ। আমরা সব সময়েই পরিবর্তনের সম্ভাবনার ভেতর আছি, এবং আমরা সবসময়ে নতুনভাবে শুরু করছি; সেজন্যে সমালোচনা কোনো তত্ত্ব নয়, কানুন নয়, ফরমাশি ফর্মূলাবিজ্ঞান বা চিরন্তন জ্ঞান নয়, বরং এটা একটা মনোভাব, কিংবা মনোভঙ্গি, একটা 'এথস', একই সঙ্গে এটা আমাদের ওপর আরোপিত ইতিহাসবেড়ির বিরুদ্ধতা; সেই সঙ্গে এর ভেতর র'য়ে গেছে ইতিহাসের আবেষ্টনী ছেড়ে এগোনোর অজেয় এক্সপেরিমেন্ট।[২১] তবে 'সমালোচনা' সম্পর্কে ফুকোর এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট বিতর্কিত। তার একটা কারণ, সহজ কথায়, ফুকো কোনো মানদন্ডকেই গ্রাহ্য করেন না; অথচ 'মান পরিপ্রেক্ষণী' (নরমেটিভ পারসপেকটিভ) ছাড়া সমালোচনা দাঁড়াতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, 'ফুকো' সমালোচনা সম্পর্কে যতোই যা বলুন, তাঁর সমালোচনার ভেতর অন্তর্দৃষ্টিগুণের সঙ্গে উদ্ধারপথও একটা আছে; তাঁর বই পড়ে আমাদের হয়ে ওঠার বৃত্তান্তটা জানতে পারি, তাতে ইতিহাসের এমন সব সংকেতও আছে, যা যুগ যুগ ধরে লুকানো ছিলো; তবে, এটা সত্য, যে, ফুকোর অবস্থান বড়োই অস্থির, অসংলগ্ন, বৈপরীত্যময়। য়ুর্গেন হেবারমাস ফুকোর কঠোর সমালোচকদের একজন; তিনি বলেন, মিশেল ফুকো তাঁর 'ম্যাডনেস এন্ড সিভিলাইজেশন' থেকে শেষতম 'হিস্ট্রি অফ সেক্সচ্যুয়ালিটি' পর্যন্ত যে-বিচার বিবেচনার নমুনা দেখিয়েছেন, তা শেষাবধি 'বিষয়ের দর্শন ও দার্শনিকতায় অন্তরীণ'। হেবারমাস বলেন, তাঁর রচনায় বিশেষ কোনো মানদন্ড অনুসৃত না হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত তা নিজের বিরুদ্ধেই গেছে। সকল যুক্তিশীল মানদন্ডকে তিনি প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন, বিকল্পের সকল সম্ভাবনা দমিত করে; এ কারণে তৈরি হয়েছে বৈপরীত্য, আত্মবিরোধ ও অন্তর্বিরোধ, যুক্তির সঙ্গে যুক্তির অসদ্ভাব।[২৩] ফুকোর জেনিয়েলজি বা কুলুজিবিদ্যা একটা বিভ্রমাত্মক শাস্ত্রে পরিণত। ফুকোর কোনো অবস্থান নেই, কোথাও তিনি স্থির নন; তিনি যা করেছেন, হেবারমাসের মতে, তা 'নান্দনিক আধুনিকতার আবেগ' [২৪]।

ফুকো-বিরোধিরা যা বলেন, তার সারকথা হলো: 'সমালোচনা' ও অধিবিচার' (ক্রিটিসিজম এন্ড ক্রিটীক) বলতে যা বোঝায়, ফুকোর টেকস্ট তার কিছুই আমাদের দেয়না। তিনি 'মানদন্ডে'র অসমর্থক, বিকল্পের উত্থাপন ছাড়াই তিনি সবকিছু অস্বীকার করেন; তদুপরি তাঁকে যতোটা আধুনিকতাবাদী ও নান্দনিক মনে হয়, ততোটা সমালোচক মনে হয় না। ফুকো বিষয়ে এইসব অভিযোগে সত্যের অংশ একেবারে কম নয়, উপরন্তু তাঁর টেকস্ট নিজে সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু যেকথাটা বিরোধিরা খেয়াল করেননি, তা হলো ফুকোর টেকস্টের (সমালোচনার) অভিনব বাচনকলা, অর্থাৎ রেটরিক। ফুকোর লেখায় সবাই কেবল আরগুমেন্ট খুঁজেছেন, এবং আরগুমেন্টের ভিত্তিতে তাকে গ্রাহ্য বা বাতিল করেছেন। কিন্তু একবারো খতিয়ে দেখেননি, এই

'আরগুমেন্ট' নিয়ে ফুকোর নিজের কোনো উৎসাহ আছে কিনা? যদি না থাকে, তাহলে ফুকোর 'আরগুমেন্ট' নিয়ে এতো বিতন্ডা কেন? ফুকো একটা কিছু অস্বীকার করে একটা কিছুর প্রতিষ্ঠা চান না; বিকল্পের কথাও তিনি বলেন না, কিন্তু সমালোচক তিনি, নিঃসন্দেহে, এবং সত্যি হলো তিনি সমালোচক শুধু নন, সমালোচনাশাস্ত্রের স্রষ্টা। কিন্তু সমালোচনা বলতে যা বোঝানো হতো, তাতে ফুকোর রুচি নেই; নেই বলেই অমন আরগুমেন্ট, যুক্তিতর্ক, প্রস্তাব নিয়ে তিনি মুখর হননা। তবে ফুকোর সমালোচনার অবশ্যই একটা পদ্ধতি আছে, সেটা একান্তই তাঁর, নিজস্ব, বিস্ময়উৎপাদক রেটরিক। ফুকো কঠিন কঠিন শব্দ লেখেন না, কিন্তু তাঁর টেকস্ট অলংকারপূর্ণ; অলংকারের মৌলিক প্রয়োগ ফুকোর সমালোচনাকে সহজেই আলাদা করে তোলে। এই আলংকারিক কৌশল না বুঝলে, তাঁর সমালোচনার চরিত্র বোঝা যাবে না। আরগুমেন্ট নয়, তাঁর বাগ্মিতাই পাঠকদের স্তব্ধ করে; আধুনিক দর্শনের ওপর যেসব সংস্কারের ভূত চেপেছে, ফুকো তার ঘোর ভাঙাতে চান, এবং ভাঙিয়ে দেনও, তবে খানিকটা ভিন্নভাবে: এক আরগুমেন্টের বিপরীতে অন্য আরগুমেন্ট হাজির করে নয়, বরং বিশেষ ধরনের ভাষা-ব্যবস্থা, কৌশল ও অলংকারপ্রয়োগের মাধ্যমে; নিজস্ব ভাষাটেকনিকের মাধ্যমে ফুকো লক্ষ্যভেদ করেন। ফুকো আজকের মুহূর্তটিকে বুঝতে চান, অন্য সব মুহূর্ত থেকে তাকে আলাদা করে; চমৎকারভাবে সে কাজ তিনি করেও ফেলেন, কিন্তু আরগুমেন্ট তাঁর দরকার হয় না। নীৎশের লেখার স্টাইলও এইরকম, সক্রেটিসেরও। এভাবে দেখলে পর বোঝা যায়, কেন 'স্ট্রাটেজি' 'ট্যাকটিকস' 'পাওয়ার রেজিম' 'অর্ডার' 'ইকনমি অফ বডি' 'এনথ্রোপলজিক্যাল স্লিপ' ইত্যাদি রূপক ব্যবহার করেন ফুকো। এ ধরনের আরো শব্দ তাঁর আছে, এবং এসব শব্দ ও রূপকের মাধ্যমে আমাদের সময়ের বোধ অদ্ভুতভাবে ধরিয়ে দেন ফুকো।[২৫] কয়েকটি বিষয় নিয়ে তিনি আলংকারিক ভাষায় কথা বলেছেন, যেমন 'বিষয়' (সাবজেক্ট) 'সত্য' (ট্রুথ) 'স্বাধীনতা' (ফ্রিডম)। এসব চাবিধারণার (কী কনসেপ্ট) বিশ্লেষণে ফুকো সচেতনভাবে অলংকার প্রয়োগ করেছেন, কেননা তিনি চান এইসব বিষয়ে আমাদের প্রথাগত উপলব্ধি, বোধ এবং ব্যাখ্যানের রেওয়াজ যেন পরিবর্তিত হয়। স্রেফ আরগুমেন্ট দিয়ে এই কাজ করা যেতো না।[২৬]

আধুনিক সমাজ বিভিন্নভাবে 'সিডিউস' করে, আধুনিক সমাজের নাম দেন তিনি 'ডিসিপ্লিনারি সোসাইটি'। ডিসিপ্লিনারি সোসাইটি অন্যায় ও নিষ্ঠুরতাকেও এমন ঢং আর আবরণে উপস্থিত করে যে, তাকে আর অন্যায় কিংবা নিষ্ঠুরতা মনে হয় না। ফুকো জেলখানার জন্মের (বার্থ অফ প্রিজন) ইতিহাস লেখেন, যেটা আসলে ডিসিপ্লিনারি সোসাইটির উদ্ভবের ইতিহাস। কিন্তু কেন লেখেন তিনি এইসব? কেন এসব বিষয় বেছে নেন তিনি? তাঁর ভেতর কি তবে মুক্তির ইউটোপিয়া কাজ করে গেছে ভেতরে ভেতরে? আধুনিক সমাজে পীড়ণ আছে বহুরকম; ফুকো দেখান পীড়নের কুলুজি ও বংশলতিকা, শাখা-প্রশাখা, তার বৈধতা, বিধিবদ্ধতা ও আধুনিকতার রূপবৈচিত্র্য। তাঁর প্রজেক্টের সবটাই বিনাশী, এমন বলা যায় না।

ফুকো বলতে চান, সমাধান মাত্রই ভালো, এরকম ভাবা মূঢ়তা। আমাদের কালের সমস্যা আমাদেরই, অন্যকালের অন্য দর্শনের অন্য মুহূর্তের 'সমাধান' দিয়ে তার লাভ নেই। 'গ্রীক দর্শনে বহু সমস্যার আকর্ষণীয় সমাধান আছে' একথার জবাবে ফুকো বলেন:[২৭]

> '....না তা ঠিক নয়, তাছাড়া বিকল্প খোঁজায় আমার উৎসাহ নেই; অন্য জনগোষ্ঠীর অন্য মানুষের অন্য মুহূর্তের সমস্যার সমাধানে আমাদের সমস্যার সমাধান থাকা অসম্ভব। আপনারা লক্ষ করবেন, আমি কোনো সমাধানের ইতিহাস লিখিনা, সে জন্যে 'বিকল্প' নামক শব্দটা কখনোই আমার পছন্দ হয়নি। আমি 'সমস্যা' নামক সমস্যার কুলুজি খুঁটিয়ে দেখতে চাই। সব জিনিশ খারাপ, এটা আমি বলিনি; আমি বলতে চেয়েছি: 'সব জিনিস ভয়ঙ্কর'। 'ভয়ঙ্কর' এবং 'খারাপ' দুটো আলাদা কথা। সব যদি ভয়ঙ্কর হয়, তাহলে, মানতেই হবে, আমাদের কিছু কর্তব্য আছে'

তবে তো ফুকো কেবল নাস্তিবাদী নন, দায়িত্বের কথাও তিনি বলেন। রিচার্ড বার্নস্টাইন লক্ষ করেছেন, ইংরেজিভাষীদের উদ্দেশে ফুকো যখন সাক্ষাৎকার দেন, তাঁর কথাবার্তা খুব সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু ফরাশি সাক্ষাৎকারে উল্টো। ফরাশিতে তাঁকে মনে হয় জাজ্জ্বল্যমান নীৎশে, অথবা তাঁর উত্তরসাধক। তারপরও ফুকোর সমর্থক বা বিরোধি, দু-পক্ষই তাকে সরলীকরণ করেছেন; মার্কিন শিষ্যরা তাকে বানিয়েছেন 'র‍্যাডিকাল ডেমক্র্যাট', বিরোধিরা 'সেলফ নিহিলিস্ট'। তাছাড়া ফুকোর বিষয়গুলোকে অতিরিক্ত সরল করে ফেলা হয়েছে। ফুকো একটা কথা ফিরে ফিরে বলেন, 'উইল টু ট্রুথ' (অর্থাৎ সিরিয়াস জ্ঞানস্পৃহা: উইল টু সিরিয়াস নলেজ) এটাকে সমালোচকেরা একেবারে শাদামাটা করে ছেড়েছেন; তারা বুঝতে চাননি ফুকোর অন্বেষা কতোটা গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ।[২৮] ফুকো বলেন, বিদ্যার পর বিদ্যা তৈরি হয়েছে শতাব্দীতে শতাব্দীতে, এই বিদ্যার ফ্রেমে গড়ে উঠেছে আধুনিক সমাজ, অনুশীলন ও জীবনধারা; তার অন্তরবাহিরের কার্যক্রম ও প্রাকটিস; সেই জীবন অতঃপর তার অনুশীলনকে জেনেছে বৈধ ও বিচারোর্ধ, মীমাংসিত ও স্বাভাবিক। বিরাট দক্ষতার সঙ্গে এই ব্যাপারটা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, বোঝাতে বোঝাতে স্বাভাবিক (আধুনিক) সমাজের আতংকগুলো চিহ্নিত করেন; আধুনিকতা বিষয়ক সংশয়ও এভাবে তিনি তৈরি করেন।

মিশেল ফুকোর 'ক্ষমতা' সংক্রান্ত তত্ত্ব আলোচিত হতে পারে। ফুকো ক্ষমতা বা 'পাওয়ার'কে কেবল রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন নি, কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও নয়। 'ক্ষমতা'কে তিনি ভেবেছেন 'বহুবাচনিক', এবং সৃষ্টিশীল, এবং অনেকসময় ব্যাখ্যা ভাষ্যের অতীত। ক্ষমতার একটা সার্বভৌমিক রূপ আছে, আরেকটা রূপ ব্যক্তিগত; কিন্তু ক্ষমতার এমন অনেক রূপ আছে, যা অদৃশ্য। ফুকো ক্ষমতার স্বভাব ও তার চরিত্রের কুলুজি পরীক্ষা করে দেখতে চান। ক্ষমতার প্রকৃতি খুব জটিল ও দুর্গম; কেবল কোনো 'কেন্দ্র' থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয় না, ক্ষমতার উৎস কেবলি 'রাষ্ট্র' নয়, ক্ষমতার আরো বহু অন্তরালবর্তী মাত্রা আছে। ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা কঠিন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে ফুকোর উৎসাহ কম, তিনি ক্ষমতার অন্য প্রকরণ ও ক্ষেত্র তদন্ত করেছেন। রাষ্ট্র নয়, সমাজশরীরে ক্ষমতার বিচিত্র গতিবিধি অবলোকনের চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা

ব্যবহার করে, আবার একই সঙ্গে সে ক্ষমতার কয়েদী: এই ডায়নামিকসটা ফুকো বুঝতে চান। ক্ষমতা বিষয়ে চিন্তাভাবনা পৃথিবীতে নতুন নয়, কিন্তু ক্ষমতার ডায়নামিকস, তার লুকোচাপা গতিবিধি, সদর্থ ও সৃষ্টিশীলতা, তিনিই প্রথম বিচার করেছেন। স্টুয়ার্ট হাল[২৯] একে যতোই পুরনো বোতলে নতুন মদ বলুন, সেটা সত্য নয়।

ফুকোর দুটো বই 'ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ' ও 'এ হিষ্ট্রি অফ সেক্সচুয়ালিটি' তাঁর ক্ষমতাবিষয়ক তত্ত্বকে কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তার আগে মার্কসবাদের সঙ্গে ফুকোর সম্পর্ক যাচাই করা দরকার। প্রথম প্রথম ফুকো ভাবতেন, মার্কসবাদ জ্ঞানতত্ত্বে কোনো বিরাট পরিবর্তন আনেনি, অর্থাৎ এমন কোনো পরিবর্তন মার্কসবাদে নেই, যার কারণে তাকে উনিশ শতকী জ্ঞানবৃত্ত থেকে আলাদা বা বেগানা মনে হতে পারে। জ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট বিকাশপর্বে মার্কসবাদের উদ্ভব, এ কথা তিনি 'দি অর্ডার অফ থিংস'-এ বলতে চেয়েছেন: বলেছেন, যে-জ্ঞানতাত্ত্বিক আয়োজন তৈরি হয়ে আসছিলো আগে থেকে, তার মধ্যেই মার্কসবাদের জন্ম। জ্ঞানবৃত্তে মার্কসবাদ কোনো প্রকৃত বিচ্ছেদের সূচনা করেনি।[৩০] কিন্তু মাত্র এক বছর পর ফুকোর উপলব্ধি: রাজনৈতিক অর্থনীতির ভিত্তিতে মার্কসবাদ সম্পূর্ণ নতুন ডিসকারসিভ প্রাকটিসের জন্ম দিয়েছে।[৩১] বাচকতামূলক অনুশীলনের জন্ম দিলেও, ফুকোর মতে, মার্কসবাদ, রিকার্ডোর বিশ্লেষণে খুব বেশি রূপান্তর ঘটাতে পারেনি। মার্কসবাদকে একটা সম্পূর্ণ মানববিদ্যারূপে গ্রহণ করতে ফুকোর আপত্তি আছে।

ফুকো নিজের বিদ্যাকে অবশ্য খুব নতুন মনে করেন না, তাছাড়া তিনি 'বিজ্ঞানমনস্কতা' অপছন্দ করেন। নিজেই বলেছেন, তাঁর আলোচনা 'বৈজ্ঞানিক'ও নয় 'বিজ্ঞানসম্মত'ও নয়। 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' বইতে 'সায়েন্টিফিক ডোমিন' এবং 'আর্কেওলজিক্যাল টেরিটরি'-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন ফুকো। তাঁর চলাচল ওই প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকায়। অর্থাৎ নতুনবিজ্ঞানের জন্ম দেয়া নয়, বরং আবহমান মানব বিদ্যার প্রত্নতাত্ত্বিক শেকড়-বাকড়-উদ্ভব-বিকাশ অনুসন্ধান। একেই তিনি মনে করেন বিশ্লেষণের একমাত্র কর্তব্য। 'প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা' নির্দিষ্ট নয়, সাহিত্য দর্শন থেকে বিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত; সেজন্যে বহুকিছুকে ফুকো 'জ্ঞান' নামক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জ্ঞানের বিস্তার ফুকো লক্ষ করেছেন কথকতায়, বিশ্লেষণে, আখ্যান-বৃত্তান্তে, প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতায়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে।[৩২]

'ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ' বই থেকে ফুকো ক্ষমতা ও জ্ঞান বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন।[৩৩] তবে ফুকোর কাজের ক্ষেত্রে 'ক্ষমতাতত্ত্ব' বিরাট একটা বিচ্ছেদ এনেছে, নাকি এ চিন্তা তাঁর সমস্ত রচনায় আনুপূর্ব অন্তঃশীল, তা বলা মুশকিল। 'জ্ঞান' বিষয়ে একটা ধারণা চালু আছে (পুবে-পশ্চিমে) যে, জ্ঞান নিরপেক্ষ, এবং জ্ঞান মহৎ: জ্ঞানকে কোনো কিছু স্পর্শ করে না; জ্ঞান কেবল মস্তিষ্ক ও মেধার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফুকো বললেন, জ্ঞান নিরপেক্ষ নয়, বহুক্ষেত্রেই ক্ষমতা-সম্পর্কের সৃষ্টি; এবং জ্ঞান রাজনৈতিকও, কেননা ক্ষমতা-সম্পর্কের রাজনৈতিক প্রতিবেশ 'জ্ঞানের উদ্ভব'কে সম্ভবপর করে তোলে।[৩৪]

'ক্ষমতা'র এই চিন্তা মার্কসবাদ-নিঃসৃত নয়, ফুকো চেষ্টা করেছেন ক্ষমতাকে আরো ব্যাপক পরিসরে ভাবতে। সেজন্যে ক্ষমতাকে কেবল 'শক্তি প্রয়োগে'র দিক থেকে তিনি

বিচার করেন নি, এ জায়গায় নীৎশে থেকে তিনি আলাদা: কেননা, ফুকোর দৃষ্টিতে, ক্ষমতা কেবলি একটা শক্তি প্রয়োগের অভিব্যক্তি নয়। সে জন্যে ফুকো স্পষ্ট করেই বলেছেন: ক্ষমতা কেবল প্রত্যক্ষ নির্যাতনের মধ্যেই থাকে না, ক্ষমতার ক্ষেত্র এবং নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল আরো ব্যাপক। ক্ষমতাকে ভাবা হয় একটা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বা শ্রেণীর অন্য ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণীর ওপর আধিপত্য; কিন্তু সমাজের পরিসরে, ক্ষমতার চলাচল আরো নানাপথে নানারূপে সক্রিয়।[৩৫] ক্ষমতাকে 'অনায়ত্ত' পরিসরে বুঝতে চান ফুকো: ক্ষমতার চরম-চূড়ান্ত রূপের তুলনায় তার লোকাল আকৃতি, তার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, তাঁকে ভাবিত করে। রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অসীম, সেটা ক্ষমতার একটা চরম রূপ, কিন্তু ক্ষমতার অনেক স্থানীয় গতিবিধি আছে, যা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সমাজ পরিসর, জীবন ও চরাচরে ক্ষমতার আশ্চর্য সব বিন্যাস রয়ে গেছে, আপাতভাবে যা চোখে পড়ে না। ক্ষমতার কার্যক্রমে সবসময় উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না; ক্ষমতাবান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন—এমনও নয়, তাছাড়া কিভাবে ক্ষমতা প্রযুক্ত হচ্ছে তা অক্ষরে অক্ষরে নির্ণয় করাও দুরূহ। 'ক্ষমতা কার হাতে?' 'ক্ষমতাবানের ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি?'—ক্ষমতা বিষয়ে এ ধরনের সরল প্রশ্নে ফুকোর আগ্রহ নেই। বিপরীতে ফুকো জানতে চান: কিভাবে একটা অধীনতা ঘিরে ফেলে আমাদের, কিভাবে সেই অধীনতা ক্রমশ অদৃশ্য আর অতিক্রমণ-অযোগ্য হয়ে ওঠে, কিভাবে আমাদের 'শরীর' এই ক্ষমতা-সম্পর্কের ভেতর এসে যায়, কিভাবে সেই সম্পর্ক আচরণীয় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে?[৩৬] বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির আধিপত্যের বিপরীতে ফুকো দৃষ্টিপাত করেন সেই প্রক্রিয়ায়, যেখানে ক্ষমতার অভিঘাতে জন্ম নেয় 'বিষয়' ও তার 'বাস্তবতা'। এর সঙ্গে আরেকটা জিনিশ বুঝতে হবে যে, 'ক্ষমতা' কোনো 'ব্যক্তি' বা 'শ্রেণীর' সম্পত্তি নয়, ক্ষমতা 'পণ্য' নয়; ক্ষমতার চরিত্র অনেকটা নেটওয়ার্কের মতো, যে নেটওয়ার্ক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাই ব্যক্তি 'ক্ষমতা' দখল করেনা, ব্যক্তি তৈরি করে ক্ষমতার এফেক্ট।[৩৭] সেজন্যে মাইক্রো-লেবেল থেকে ক্ষমতা বিশ্লেষণ করতে হবে, ফুকো নিজেও ক্ষমতার মাইক্রো-ফিজিক্স রচনা করেছেন। মার্কসবাদে ক্ষমতার বোধ কেন্দ্রোদ্ভূত, বিশেষ শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত; আর ফুকোর মতে দরকার ক্ষমতার পূর্বাক্ষ ও তার মেকানিজমের বিশ্লেষণ। বলা বাহুল্য, ক্ষমতার কলাকৌশল কেবল বুর্জোয়ারাই নিয়ন্ত্রণ করে না। আরেকটা কথাও তিনি বলেন জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে। ফুকোর ব্যাখ্যা অনুসারে ক্ষমতার ব্যবহার, এবং জ্ঞানের উৎপাদন (কিংবা জ্ঞানের আসবাবপত্রের বিস্তার) পরস্পরিত। ক্ষমতার ধারণা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রকে ফুকো অনেক বেশি বিস্তৃত মনে করেছেন। ফুকোর মতে, মধ্যযুগে ক্ষমতার প্রয়োগ সার্বভৌমিক ছিলো, কিন্তু সতের-আঠার শতকে এই সার্বভৌমিকতার স্থানবদল, কাঠামোবদল, রূপবদল ঘটে, ফলে ক্ষমতার কলাকৌশলও ব্যাপকভাবে বদলে যায়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রিত, অ-সার্বভৌমিক, রূপান্তরপ্রবণ রূপ, মিশেল ফুকোর আলোচ্য। সার্বভৌমিকতার বাইরে যে 'ক্ষমতা'

থাকে, তাকে ফুকো বলেছেন 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার' বা 'শৃংখলাবিধায়ক ক্ষমতা'।[৩৮] ফুকো অতঃপর দেখান, কিভাবে এই 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার' জন্ম নেয়, সেই নেটওয়ার্কে কিভাবে আধুনিক সমাজ আরো সুশৃংখল, আরো নিয়ন্ত্রিত, আরো প্রশাসিত হয়ে ওঠে। 'জেলখানার জন্মে'র বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে 'ডিসিপ্লিনারি পাওয়ারে'র যে বিশ্লেষণ মিশেল ফুকো করেছেন, তা অনবদ্য।[৩৯]

মিশেল ফুকোর 'ক্ষমতাতত্ত্ব' থেকে চারটি কথা পাচ্ছি:

(১) 'সার্বভৌমিকতা' দিয়ে ক্ষমতার বোধ ও ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

(২) নির্যাতনের রকমফের ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে ক্ষমতার ব্যাখ্যা সংকুচিত হতে বাধ্য। 'ক্ষমতা'র নিগ্রহ-নিরপেক্ষ ইতিবাচক রূপ পরীক্ষিত হওয়া দরকার।

(৩) জুলুমবাজিতে ক্ষমতার স্পষ্ট একটা প্রকাশ ঘটে বটে, কিন্তু ক্ষমতার ডায়নামিক্স ওতেই নিহিত থাকে না।

(৪) ক্ষমতা কেবলি ব্যক্তির সঙ্গে, শ্রেণীর সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে, সম্পর্কিত নয় বা থাকে না; ক্ষমতার আয়ত্ত অভিব্যক্তি যেমন আছে, আছে তার অনায়ত্ত রূপ; ক্ষমতা একই সঙ্গে বিশেষ এবং নির্বিশেষ, গুপ্ত ও বিস্ফারিত, নির্ণেয় ও বিচিত্র। মিশেল ফুকো বিষয়ে তাঁর মার্কিন বন্ধু এডমান্ড হোয়াইটের একটা মন্তব্য আছে, সেটা উল্লেখ করে শেষ করবো। এডমান্ড বলেছেন:

> 'মিশেল ফুকো সবসময় আকর্ষণ বোধ করেছেন ক্ষমতার প্রতি; তবে তাঁর আজীবনের সংগ্রাম ছিলো এই আকর্ষণের বিরুদ্ধে।'

এই একটি মাত্র তির্যক বাক্যে মিশেল ফুকো অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছেন।

১. James F. McMillan. *Dreyfus to De Gaulle/Politics and Society in France 1898-1969* (London : Edward Arnold Publishers Ltd). 1985. P. 174.

২. James F. McMillan. Ibid. P. 177.

৩. Richard J. Bernstein. *Beyond Objectivism and Relativism : Science, Hermeneutics, and Praxis* (Philadelphia : University of Pennsylvania Press. 1983. P. 2.

৪. Richard J. Bernstein. *The New Constellation*. (Cambridge : Polity Press) 1991. P. 2.

৫. Richard J. Bernstein. What is the difference that makes a difference?' Gadmer Habermas and Rorty reprinted in *Philosophical Profiles* (Philadelphia : University of Pennsylvania Press) 1986. P. 86-93.

৬. Alasdair MacIntyre. *After Virtue* (Notre Dame : University of

Notre Dame Press. 1981. p. 21.

৭. Michel Foucault. *The Order of Things*. (New york: intage Books) 1973. P. 385.

৮. Jacques Derrida. 'The Ends of Man' *Margins*. trans. Alan Bass. (Chicago : University of Chicago Press) 1982. P. 136.

৯. Hayden White. 'Foucault Decoded : Notes from Underground in *Tropics of Discourse* (Baltimore : Johns Hopkins University Press) 1978.

১০. 'Foucault frequently leaves us with more questions than he resolves'. See : Bernstein. *The New Constellation*. P. 27.

১১. David Hay (ed.) *Foucault : A Critical Reader* (Oxford : Basil BlackWell) 1986.

১২. Bernstein. Ibid. 27.

১৩. David Pace. *Claude Levi-Strauss/The Bearer of Ashes* (London : ARK Paperbacks) 1986. P. 4.

১৪. Michel Foucault. *Language. Counter-Memory. Practice : Selected Essays and Interviews*. ed. D. F. Bouchard (Oxford : Basil BlackWell) 1977. P. 218-33.

১৫. *Michel Foucault*. What is Enlightenment? in Paul Rainbow (ed.) *The Foucault Reader*. (Newyork : Pantheon Press) 1984. P. 43.

১৬. Jacques Derrida. *Writing and Difference*. trans. Alan Bass. (London : Routledge and Kegan Paul) 1978. P. 31-64.

১৭. Foucault. Ibid. P. 38.

১৮. Foucault. Ibid. P. 42

১৯. Foucault. Ibid. P. 44

২০. David R. Hiley. *Philosophy in Question : Essays on a Pyrrhonian Theme*. (Chicago : University of Chicago Press) 1988. P. 102-104.

২১. Michel Foucault. Ibid. P. 50.

২২. Charles Taylor. *Foucault : A Critical Reader*. (Oxford : Basil BlackWell) 1986. P. 83

২৩. Jurgen Habermas. *The Philosophical Discourse of Modernity*. trans. F. Lawrence. (Cambridge : Mass. MIT Press) 1987. P 275-276.

২৪. Habermas. Ibid. P. 275.

২৫. David Hay (ed). Ibid. P. 114.

২৬. Michel Foucault. 'Polemics. Politics and Problemization : An Interview. in Rainbow. (ed.) *The Foucault Reader*. এই সাক্ষাৎকারে ফুকো আগাগোড়া কথা বলেছেন সত্য-অন্বেষণ ও সত্য লাভ বিষয়ে; ফুকোর কথাগুলো তির্যক, বাগ্মিতাপূর্ণ, আর আলংকারিক।

২৭. Michel Foucault. 'On the Genealogy of Ethics : An Overview of Work in Progress' in *The Foucault Reader*. Newyork. 1984. P. 351.

২৮. Maurice Blanchot. 'Michel Foucault as I Imagine Him' in *Foucault/Blanchot*. (Newyork : Zone) 1987. P. 78-79.

২৯. Stuart Hall. The Road in the Garden : Thacherism among the Theorists. in Cary Nelson and Lawrence Grosberg (eds.) *Marxism and the Interpretation of Culture* (London McMillan Education Ltd) 1988. P. 70-71.

৩০. Michel Foucault. *The Order of Things : An Archaeology of Human Sciences* (Newyork : Vintage Books) 1973. P. 261.

৩১. Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge* (London : Tavistck) 1977. P. 188.

৩২. Foucault. Ibid. P. 183.

৩৩. (a) P. Patton. Of Power and Prisons. in *Michel Foucault : Power. Truth. Strategy* (ed.) M. Morris and P. Patton. (Sydney : Feral Publication) 1979. P. 111

(b) Allan Sherridan. *Michel Foucault : The Will to Truth* (London : Tavistock) 1980. P. 129.

৩৪. Barry Smart. *Foucault. Marxism and Critique*. (Routledge : London and Newyork) 1989. P. 80.

৩৫. Michel Foucault. *Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977.* ed. C. Gordon (Brighton Harvester Press) 1980. P. 95-96.

৩৬. Foucault. Ibid. P. 97.

৩৭. Foucault. Ibid. P. 98.

৩৮. Foucault. Ibid. P. 105.

৩৯. Michel Foucault. *Discipline and Punish : The Birth of the Prison*. (London : Penguine Press) 1977.

আধুনিকতাবাদ ও রাজনীতি

আধুনিকতাবাদের রাজনীতি কথাটি বঙ্গীয় পাঠকের হঠাৎ খাপছাড়া মনে হতে পারে। দীপ্তি ত্রিপাঠীর বই দিয়ে যাঁরা সাহিত্যপাঠ শুরু করেছেন, এবং বুদ্ধদেবের বোদলেয়ার যাঁদের আধুনিকতাবোধের বীজগ্রন্থ, তাঁরা আধুনিকতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক-সন্ধানে উৎসাহী না হবারই কথা। কিন্তু পশ্চিমে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বহুকাল ধরে উদ্দীপক তর্কের বস্তু। দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক—সর্বদিক থেকে এই তর্ক তৈরি হয়েছে, এবং সাহিত্য সমালোচনায় একে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

প্রসঙ্গে যাবার আগে সাহিত্য ও সাহিত্যবোধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বাঙালি পাঠক ও লেখক সাহিত্য বলতে গল্প-কবিতা বোঝেন; কিন্তু গত তিন-চার শতাব্দী ধরে ইউরোপের লোকেরা কখনোই স্রেফ গল্প-কবিতাকে সাহিত্য মনে করে নি। সাহিত্যের পরিসরকে আরো অনেক বিস্তৃত ভাববার কারণে তাদের সাহিত্য যেমন বিকশিত হয়েছে, তাদের সমালোচনা-ভূগোলও অনেক বৈচিত্র্যময় হয়েছে। সেজন্যে সাম্প্রতিক পশ্চিম সমালোচনাশাস্ত্রকে মনে করে একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারী ডিসকোর্স, যে-ডিসকোর্সের প্রতিপাদ্য কেবল কবিতা বা গল্প নয়, উপন্যাস বা নাটক নয়, তার ভেতর রাজনীতি, সমাজজিজ্ঞাসা, নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পরপ্রবিষ্ট। পশ্চিমের সাহিত্য সমালোচনা ইন্টারডিসিপ্লিনারী হবার কারণ তাঁদের সাহিত্যবোধ, যে সাহিত্যবোধ যুগপৎ বহুত্ববাদী, অনেকান্ত, বহুবাচনিক। বাংলাদেশের সাহিত্যবিষয়ক লেখাপত্র আজকাল যে অপাঠ্য হয়ে উঠেছে, তার কারণ আমাদের সাহিত্যবোধের একমাত্রিকত্ব, হ্রস্ব পরিসরের গোঁড়ামি, একধরনের মৌলবাদ। মৌলবাদ যেমন একটি মাত্র ফ্রেমের ফতোয়া দেয়, একটিমাত্র ছকের ওকালতি করে, আমাদের সাহিত্যচিন্তাও সেরকম রৈখিক, সমতল, সংকুচিত। তবে লেখকদের মনে নতুন প্রশ্ন যে একেবারেই দেখা দিচ্ছেনা, এমন নয়; কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাব তাঁরা খোঁজেন রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্র-পরবর্তী অন্য লেখকদের লেখায়। তাঁরা বুদ্ধদেবের অনুবাদ-কর্ম এবং অনুবাদকর্মের ভূমিকায় আধুনিকতাবোধের চূড়ান্ত ও চিরন্তন লক্ষণাবলী শনাক্ত করতে চান। এর পরিণতি যা হবার তাই, শার্ল বোদলেয়ার হয়ে ওঠেন আমাদের সমকালীন, এবং বোদলেয়ারের মুদ্রাদোষ দিয়ে বাঙালি মুসলমান কবির আধুনিকতার মাপজোক শুরু হয়। বুদ্ধদেবের বোদলেয়ার/রিলকে/হোল্ডার্লিন পড়বোনা তা বলিনা; পড়বো অবশ্যই, কিন্তু তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে বোদলেয়ার বিষয়ক ওয়াল্টার বেনজামিনের সন্দর্ভ, হোল্ডার্লিন বিষয়ে হাইডেগার বা পাউল দ্য মানের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ব্যাখ্যান। আমরা তা করিনি, যদিও আমাদের কনফিডেন্স অতুলনীয়: সব বিষয়ে আমরা রায় দিয়ে চলেছি, এবং সাহিত্য বিষয়ে আমাদের ফতোয়া জঙ্গী মৌলবাদীদেরও হার মানায়।

যা বলছিলাম, তা হলো, আধুনিকতাবাদের রাজনীতি। তার পূর্বে একটা কথা বলবো। 'আধুনিকতা' ও 'আধুনিকতাবাদ' অর্থাৎ 'মডার্নিটি' ও 'মডার্নিজম' কি এক? নিশ্চয়ই নয়। এর সঙ্গে আবার আরেকটা কথা চলে আসে, আধুনিকায়ন বা মডার্নাইজেশন। অতএব পাচ্ছি তিনটি কথা : আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ, আধুনিকায়ন; মডার্নিটি, মডার্নিজম, মডার্নাইজেশন। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'আধুনিকতা' হলো সমাজের একটা রূপ, আধুনিকায়ন হলো ওই সমাজরূপের একটা প্রক্রিয়া; আর আধুনিকতাবাদ হলো আধুনিক সমাজের নান্দনিক অভিব্যক্তি। আধুনিকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধুনিকায়ন, অর্থাৎ আধুনিকতা ও আধুনিকায়ন পরস্পর-সাপেক্ষ; পরস্পরসাপেক্ষ ব'লেই এই রূপ ও তার প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে আছে রাজনীতি। সেজন্যেই ইকলজির তাত্ত্বিকেরা আজ আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের রাজনীতির ভেতর পরিবেশবিনাশের সূত্রগুলো খুঁজে বার করছেন।

আধুনিকতা ও আধুনিকায়নের রাজনীতি না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু আধুনিকতাবাদের রাজনীতি কি? এই প্রসঙ্গে পশ্চিমে শতাব্দী ধরে তর্ক চলেছে, এবং আজো তা অমীমাংসিত। আমরা সরল বাংলায় বিষয়টি বলতে চাই।

আধুনিকতাবাদের আঙ্গিক কি আসলেই বিরোধিতামূলক (অপোজিশনাল)? নাকি আধুনিকতাবাদ, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে, একটা সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক অভিজাত মানভূমি তৈরি করে? অর্থাৎ আধুনিকতাবাদের ভেতর বিরোধিতার আবেগ প্রোথিত, নাকি আধুনিকতাবাদ অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা? এই প্রশ্ন উঠবার কারণ, আধুনিকতাবাদী লেখকেরা অত্যন্ত আত্মচেতন ও সতর্ক, সেজন্যেই আধুনিকতাবাদের বিরোধিতাতত্ত্ব কিংবা আভিজাত্যপন্থা দুটোই রাজনৈতিক তর্কের মুহূর্ত রচনা করেছে। আত্মচেতন নান্দনিক অনুশীলনের যে অভিব্যক্তির নাম মডার্নিজম বা আধুনিকতাবাদ, তার ভেতর এবং বাইরের রাজনীতি অস্বীকার করা অসম্ভব।

সেজন্যেই তর্কটা উঠেছে, এবং তর্কটা নতুন নয়। এই তর্কের কয়েকজন প্রতিভূ তাত্ত্বিকের নাম স্বভাবত মনে পড়ে : ব্রেখট বনাম লুকাচ, বেনজামিন বনাম আডর্নো, হেবারমাস বনাম লিওতার। জর্জ লুকাচ আধুনিকতাবাদবিরোধি বিখ্যাত মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক; লুকাচ আধুনিকতাবাদের অসমর্থক, কারণ তাঁর মতে আধুনিকতাবাদের রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা না বাচক আধুনিকতাবাদী আঙ্গিককে ইতিবাচক ভাবতে পারেননি লুকাচ, সেজন্যে তার স্থলে উনিশশতকী রিয়ালিজম বা বাস্তববাদকে তিনি কাম্য মনে করেছেন। রিয়ালিজমের এ্যান্টিথিসিস যে মডার্নিজম, অর্থাৎ বাস্তববাদের প্রতিণয় যে আধুনিকতাবাদ, তা কখনোই ইতিবাচক হতে পারে না, জর্জ লুকাচ বলতে চান। জর্জ লুকাচ প্রগতিশীল ইতিবাচক শিল্পকলার পক্ষপাতী, এবং তাঁর বিবেচনা যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী আজকের আধুনিকতম সমালোচক ফ্রেডরিক জেমসনের 'দি পলিটিক্যাল আনকনশাস' তার প্রমাণ। জেমসন, বলতে গেলে, লুকাচের নন্দনতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন সাম্প্রতিক সমালোচনায়। কিন্তু লুকাচের আধুনিকতাবাদ প্রত্যাখ্যান মার্কসবাদী নন্দনশাস্ত্রীরাও সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেননি; ব্রেখট,বেনজামিন, আডর্নো, হেবারমাস (এদের ভেতর বহু দিক থেকে মিল এবং অমিল আছে) আধুনিকতাবাদের বেশ কিছু আঙ্গিককে

মনে করেছেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক। এরা আধুনিকতাবাদের রাজনীতিতে লক্ষ করেন একটা ইতিবাচক র‍্যাডিকালিজম, এবং এই আমূলবাদ অভিপ্রেত প্রগতির সহায়ক। তাঁরা বলতে চান, আধুনিকতাবাদী শিল্পকলা কখনোই বুর্জোয়া পুঁজিবাদকে চূড়ান্ত মনে করে না, যদি করতো তাহলে তা এতো র‍্যাডিকাল হতে পারতোনা। ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানার হার্বার্ট মার্কুইস তো এমনও বলেছেন, আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের ভেতর যে সৃষ্টিশীলতা, স্বপ্ন ও উদ্ভাবনশীলতা আছে, তা প্রগতিশীল রাজনীতির বাঞ্ছিত প্রেরণা। মার্কুইস তাঁর 'দি এসথেটিক ডাইমেনশন' নামক ছোট্টো, কিন্তু বিখ্যাত বইটিতে, আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের উদ্ভাবনশীলতাকে 'বিপ্লবাত্মক' বলেছেন। কারণ হিশেবে তিনি বলেন, আধুনিকতাবাদ যে স্বপ্ন তৈরি করে তা বুর্জোয়া সমাজের বাইরের একটা বাস্তবতা, এবং তা অভিনন্দনযোগ্য । মার্কুইসের বিখ্যাত একটি বাক্য উদ্ধৃত করতে চাই : শিল্প পৃথিবীকে বদলাতে পারেনা; কিন্তু চৈতন্যের পরিবর্তনে শিল্প রাখতে পারে বিরাট ভূমিকা, এবং অনুপ্রাণিত ও চালিত করতে পারে সেইসব সামাজিক স্ত্রী-পুরুষকে, যারা এই দুনিয়ার বদল চায়।

এডওয়ার্ড সাইদও মোটের ওপর আধুনিকতাবাদের সমর্থক, এবং লুকাচের উনিশ শতকী বাস্তবতাবাদের বিরোধি। সাইদ বলতে চান, উনিশ শতকের বাস্তবতাবাদের গড়ন যে-সব আখ্যান বা ন্যারেটিভকে কেন্দ্র করে বিন্যাস পেয়েছে তা মূলত কর্তৃত্ববাদী, নির্যাতক, আধিপত্যবাদী, ঔপনিবেশিক। আখ্যান যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা চেতন কিংবা অচেতনভাবে ঔপনিবেশিকায়ন, প্রভুত্ববাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কাজ করেছেন; তাঁদের আখ্যান অ-পশ্চিম আদারকে কবজা করার কৌশল হিশেবে ব্যবহৃত। সাইদ একগুচ্ছ লেখকের নাম আমাদের দিয়ে দেন, এবং বিশ্লেষণ করেন তাঁদের কাজ, আমরা অবাক এবং অভিভূত হয়ে যাই। সাইদ বলতে চান উনিশশতকী বাস্তবতাবাদী আখ্যানের বিপরীতে গড়ে ওঠে আধুনিকতাবাদের আঙ্গিক, যে-আঙ্গিক বিভিন্নভাবে পূর্বেকার কর্তৃত্ববাদী বাস্তবতাবাদের গ্রন্থনকলাকে এলোমেলো করে দেয়। সাইদের চোখে আধুনিকতাবাদ পুরুষতন্ত্রী ডিসকোর্সের বিপরীত, প্রভুত্ববাদের শত্রু, বহুত্ববাদের সমর্থক, বুর্জোয়া শ্রেণী-কর্তৃত্বের সমালোচক।

নারীবাদী তাত্ত্বিকেরাও উনিশশতকের বাস্তবতাবাদের ঘোর বিরোধি, এবং তাঁরাও আধুনিকতাবাদকে সমর্থন করেছেন—যদিও ভিন্নভাবে। তাঁদের কথা হলো, সাহিত্যে নারীদের রচনা পুরুষতন্ত্রী সাহিত্যবাদীরা অস্বীকার করেছে এবং অবমূল্যায়ন করেছে; তাঁরা দেখান, কিভাবে নারীদের লেখা পুরুষ প্রভুত্বের রোষে নির্জিত হলো, কিভাবে নিজস্ব ডিসকোর্সের কথা নারীরাও ভুলে গেলো। নারীবাদীরা নিজস্ব এক 'নারী আধুনিকতাবাদে'র কথা বলেন; 'নারী আধুনিকতাবাদ' 'পুরুষ আধুনিকতাবাদে'র মতো নয়, ভিন্ন নারীবাদীরা, বিশেষত মার্কিন নারীবাদীরা বলছেন, 'নারী আধুনিকতাবাদ' 'পুরুষ-আধুনিকতাবাদে'র চেয়ে অনেক প্রাগ্রসর, কিন্তু পুরুষেরা সজ্ঞানে একে উপেক্ষা করেছে।

কোনো কোনো নারীবাদীর বক্তব্য হলো, আধুনিকতাবাদকে কেবল 'পুরুষ আধুনিকতাবাদ' বলা ঠিক হবে না; কারণ 'পুরুষ আধুনিকতাবাদে'র মধ্যেও এমন রচনা অসংখ্য, যা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, এবং যা ভেদবাদী নয়; এই ধরনের আধুনিকতাবাদী রচনাকে

তার' গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ আধুনিকতাবাদী আঙ্গিক অস্বীকার করে ক্রমোচ্চ বাগবিধি (হায়ারারকিকাল সিনট্যাক্স), সংহত একক দৃষ্টিকোণ, বাস্তববাদী কলারূপ, রৈখিক সময় ও তার ছক। রাশেল ব্লাউ বলেন, নারীদের রচনা আধিপত্যহীন আধুনিকতাবাদের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। জুলিয়া ক্রিস্তেভা বলেন, 'যে-সংস্কৃতিতে মৌখিক বিষয়াবলীর গুরুত্ব বেশি, সেই সংস্কৃতি শিশ্নকেন্দ্রিক। কিন্তু আজকের সমালোচনায় বয়ানবাদী বিশ্লেষণ ও ভাষাকেন্দ্রিক বিচার ওই শিশ্নকেন্দ্রিক সংস্কৃতির জন্যে অবশ্যই বিরাট চ্যালেঞ্জ।' বলা বাহুল্য, ক্রিস্তেভা যে-সমালোচনার কথা বলছেন, তা আধুনিকতাবাদের মহৎ অর্জনের অন্যতম।

বিপরীতে আধুনিকবাদবিরোধিরা বলতে চান, আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের মধ্যে যে বিচূর্ণতা, নৈরাজ্য ও বিকলতা আছে, তা পরিণামে নৈরাশ্যবাদকেই স্বাগত করে, এবং তার ফলে তৈরি হয় নাস্তিবাদী রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ। বিরোধিরা যে সংহতি, একক অভিমুখিতা ও সামগ্রিকতার কথা বলেন, আধুনিকতাবাদীদের তাতে ঘোর সংশয়, কারণ সংহতি শেষ পর্যন্ত একক কেন্দ্রের কথা বলে, সেটা ঐক্যবদ্ধ জবরদস্তি; কারণ বিকল্পের অনুমোদন এবং বহুত্ববাদের পক্ষাবলম্বন আধুনিকতাবাদের মূল কথা। বিরোধিরা বলেন রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা, আধুনিকতাবাদীদের কাম্য শিল্পের সাহস, শিল্পের সততা, শিল্পের চরিত্র। আধুনিকতাবাদীরা মনে করেন, আলোকপর্ব বা এনলাইটেনমেন্ট যে সমাজ এবং মানবতাবাদের কথা বলেছে, তা কর্তৃত্ববাদী; বিপরীতে পাউন্ডের ইমেজিজম, এলিয়টের উদ্দীপন বিভাব, আর্তেগার বিমানবিকীকরণ—সবই ওই সংস্কৃতির প্রতি একটা মঙ্গলময় চ্যালেঞ্জ। মার্কসবাদীরা 'বিচ্ছিন্নতা'র অপবাদে খারিজ করেন আধুনিকতাবাদীদের: কিন্তু আধুনিকতাবাদীদের বক্তব্য হলো, 'বিচ্ছিন্নতা' আসলে বিভ্রমাত্মক বাস্তববাদী আঙ্গিক থেকে একটা দূরত্ব, এবং এই দূরত্ব মূলত ওই বিভ্রমের এক সমালোচনা, কেননা ওই বিভ্রমাত্মক বাস্তববাদ একটা সমাজকে স্থির/চিরন্তন হিশেবে উপস্থিত করতে চায়, কিন্তু আধুনিকতাবাদ বুঝিয়ে দেয় কোনো সমাজই চূড়ান্ত নয়, তার বদল সম্ভব এবং বদল দরকার।

আরেকটা অভিযোগ হলো, এবং সেটা খুব পুরনো, আধুনিকতাবাদী আঙ্গিক দুরূহ ও বিমূর্ত : এই দুরূহতা ও বিমূর্ততা অভিজাততন্ত্র তৈরি করে। কিন্তু আধুনিকতাবাদীরা বলেন, দুরূহতা কোনো আভিজাত্যের আগ্রহে নয়; দুরূহতা চৈতন্য বদলানোর অভিপ্রায়ে: দুরূহতা জানিয়ে দেয় বর্তমান পৃথিবী জটিল, এবং এর মধ্যে কোনো বিভ্রম নেই: আধুনিকতাবাদীদের দুরূহতা শেষাবধি জটিল চিন্তাশীলতার দিকে আহ্বান করে সবাইকে।

আধুনিকতাবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এর দ্বৈততা, অনিশ্চয়তা ও অনির্দিষ্টতা। আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকে যে-সব উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দিলেই এটা স্পষ্ট হবে। যেমন জোশেফ কনরাডের উপন্যাস। তাঁর 'লর্ড জিম' উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক। 'লর্ড জিম' উপন্যাসে 'জিম' একটা চরিত্র: 'জিম' কি কনরাডের প্রতিবিম্ব'? নাকি 'মার্লো' কনরাডের যথার্থ প্রতিফলক'? নাকি দুটোই। ফ্রেডরিক জেমসন কনরাড বিষয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন: জেসমন বলেন, জিমের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতা পরিণত হয় ইম্প্রেশনে। কিন্তু দৃষ্টিকোণটি ওই চরিত্রের, নাকি কনরাডের'? 'জিম' যদি কনরাডের

প্রতিভূ হয়, 'মার্লো'তে কনরাড তার চেয়ে বেশি প্রতিফলিত। কিন্তু আসল কথা, 'জিম' বা 'মার্লো', কোনো একটাতেই কনরাডকে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছেনা; এই দ্বৈততা বা ডুয়ালিজম আধুনিকতাবাদের মূল। আধুনিকতাবাদ একটা বস্তুকে যুগপৎ স্বীকার এবং অস্বীকার করে, এবং এই দ্বৈততা সচেতন, অন্তত, অচেতন নয়।

আধুনিকতাবাদের টেক্সটে প্রকাশ এবং প্রত্যাখ্যান, রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড নেগেশন, যুগপৎ খেলা করে। এলিয়টের প্রুফ্রকের কথা ভাবতে পারি আমরা। আধুনিকতাবাদ বলে, শাদা/কালো নামক সরল বিভাজনের শৈশব আমরা পার হয়ে এসেছি; এখন এমন জগতে আমাদের বসবাস যেখানে কিছুই সমতল নয়, যেখানে অস্তি ও নাস্তি, হ্যাঁ এবং না, প্রবেশ ও প্রত্যাখ্যান একই সঙ্গে সক্রিয়। এজন্যেই দেরিদার ডিকন্স্ট্রাকশন সর্বত্র লক্ষ করে বিসংগতি, অনিশ্চয়তা, সংঘাত; কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই অনিশ্চয়তা সচেতন, অচেতন নয়। আধুনিকতাবাদী আঙ্গিক চরমভাবে পারম্পর্যহীন; কিন্তু মনে রাখা দরকার, পারম্পর্যহীন হলেও সঙ্গতিহীন নয় (ইনকনসিসটেন্ট, বাট নট ইনকোহিয়েরেন্ট)। যে-দ্বৈততাকে বলছি আধুনিকতাবাদের চরিত্র, সেই দ্বৈততার একটা প্রধান কারণ লেখকের মস্তিষ্কে একইসঙ্গে অসংখ্য, এবং বিপরীতধর্মী, ভাবনার উপস্থিতি। মার্কিন ঔপন্যাসিক ফিটজেরাল্ড সুন্দরভাবে বলেছেন, 'প্রথম শ্রেণীর মেধাবী মানুষ তাঁকেই বলবো, যিনি একইসঙ্গে পরস্পরবিরোধী ভাবনায় অভ্যস্ত : যিনি একইসঙ্গে সবকিছু দু'ভাবে ভাবতে পারেন, এবং দুটো ভাবনায় সমান উদ্দীপিত হতে পারেন।'

তাই আধুনিকতাবাদীর ধর্ম হলো এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব, এক বৈপরীত্য : এই বিরোধ আর দ্বৈততার ভেতর কাজ করেন আধুনিক শিল্পী, এই বিরোধ ও দ্বৈততা থেকে আধুনিকতাবাদীর মুক্তি নেই, এবং মুক্তি তাঁর কাম্য নয়। এই নিহিত বৈপরীত্যের বোধ আশ্চর্য সব আয়তন তৈরি করে সাহিত্যে, এবং তখন আমরা বাস্তবতার ভেতরে থেকেও আবার তার বাইরে চলে যাই। তখন কালো নারীর লেখাও তার বিরুদ্ধে চলে যায়; তখন যোরা নীল হার্টসনের মতো এক কৃষ্ণ নারী 'দেয়ার আইস ওয়্যার ওয়াচিং গড' নামক উপন্যাস লিখে বসেন। যোরা দেখান, কেবল শাদাই যে কালোর শত্রু এমন নয়, কখনো উল্টোও; কালোরাও কালোদের নির্যাতন করে এবং কালোরাও কালোদের ঘৃণা করে। সেই সঙ্গে যোরা এ-ও দেখান, কেবল পুরুষেরা নারীদের ওপর প্রভুত্ব করেনা, নারীরাও নারীদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়। যোরা আসলে একইসঙ্গে দুটো জিনিশকে ধরতে চান; সেজন্যে তিনি যে প্যারাডাইম তৈরি করেন, তার ভেতর শাদা/কালো, নারী/পুরুষ এরকম সরল ভাগ অনুমোদন পায় না। এই দ্বৈততাই ভার্জিনিয়া উল্ফের 'বাতিঘরের দিকে' উপন্যাসকে অন্যরকম ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। উল্ফ একইসঙ্গে যুদ্ধোত্তর বর্তমান এবং ভিক্টোরিয় অতীতকে মেলাতে চেয়েছেন এবং ভাঙতে চেয়েছেন: বিপন্ন উত্তরকাল ও ভাবালু শৈশবকে তিনি একদিকে সমর্থন অন্যদিকে অসমর্থন করেছেন: একদিকে স্বাধীনতা অন্যদিকে যুক্ততা, একপ্রান্তে জীবন অন্যপ্রান্তে মৃত্যু, একদিকে অস্তি অন্যদিকে নেতিবাদ—এই হলো 'বাতিঘরের দিকে' উপন্যাসের চেতনা। এই চেতনা জ্ঞানকৃত, অনুপ্রাণিত এবং অভিপ্রেত: আমরা যদি কোনো একটিমাত্র দিকে উল্ফের ঝোঁক দেখাতে চাই, পুরো উপন্যাসের আবেদন নষ্ট হবে।

আধুনিকতাবাদের এই দ্বৈততাকেই ক্রিস্তেভা 'ইমপসিবল ডায়ালেকটিক' বলেছেন। এই ডায়ালেকটিকে সময় ও তার সত্য, আত্মরূপ ও তার অপনোদন, ইতিহাস ও সময়চ্যুতির মধ্যে অবিশ্রাম পালাবদল চলছে। এই বদল স্থায়ী ও চিরন্তন : বদলের প্রক্রিয়ায় দুই পক্ষই সমান গুরুত্বপূর্ণ, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা ভাবা যাবে না। এই দ্বৈততা, বদল, বিকল্প ও অনেকত্ব আধুনিকতাবাদের অন্তঃসার। আধুনিকতাবাদের চরিত্র ওই অন্তঃসার দিয়ে বুঝতে হবে, আর তা থেকেই স্পষ্ট হবে আধুনিকতাবাদের র‍্যাডিকালিজম ও রাজনীতি।

ঔপনিবেশিকতা ও ফ্রানৎস ফ্যানন

উপনিবেশ-বিরোধি স্মরণীয় ভাবুক ফ্রানৎস ফ্যাননের চিন্তা আজ নতুন করে পাঠ করা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ফ্যাননের তিনখানা বই নিয়ে কিছু বলবো: এগুলো হলো: (ক) "কালো চামড়া শাদা মুখোশ" (১৯৫২); (খ) "জগতের হতভাগ্য" (১৯৬১); (গ) "ক্ষয়িষ্ণু উপনিবেশবাদ" (১৯৭০)[১]। ফ্রানৎস ফ্যাননের কাজের কেন্দ্র আলজিরিয়া; তাঁর রচনাগুচ্ছ আফ্রিকার কালো মানুষের স্বপ্ন-সম্ভাবনার চিরন্তন আকৃতি। ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখায় বিদ্রোহের তেজ ও হৃদয়ের উত্তাপ, সদর্থক আগামীর আকাঙ্ক্ষা ও ঔপনিবেশিক মানুষের লড়াকু জীবনযাপনের আখ্যান, একরজ্জুতে বাঁধা। ফ্যাননের লেখাকে অনেকের মনে হয়েছে নিছক প্রতিক্রিয়ার শস্য[২], কিন্তু জাঁ-পল সার্ত ফ্যাননের দ্বিতীয় বইটিকে উপনিবেশ-বিরোধি শ্রেষ্ঠ ক্ল্যাসিকের সম্মান দিয়েছেন।

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা তাত্ত্বিক মনস্বিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, ফ্যাননকে তার প্রতিভূ বলা যায়। সমস্যা হলো, ফ্যানন কথা বলতেন খুব স্পষ্ট; তাঁর চিন্তায় জড়তা ছিলো না, তাঁর ভাষাতেও আড়ষ্টতা নেই; সত্য কথা তিনি সরল, ঋজু, তীক্ষ্ণভাবে বলেছেন। তাঁর লড়াই কোথায়, এবং কার সঙ্গে, তিনি জানতেন; ফলে অভিজাত ভাষায় কথা বলার দরকার হয়নি। উত্তর-ঔপনিবেশিক মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা তাঁর টেকস্টে ফিরে ফিরে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা পরিচ্ছন্ন করা দরকার, তাহলো, ফ্রানৎস ফ্যানন সরল সুস্পষ্টতায় যা-ই বলুন বা লিখুন না কেন, তিনি সরল চিন্তাবিদ ছিলেন না। উপনিবেশের অবরুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিতে টেক্সচ্যুয়াল বিপ্লব নিয়ে এসেছেন ফ্রানৎস ফ্যানন। সেইজন্যে তাঁর লেখায় অতিরঞ্জন, এমনকি অতিকথনও এসেছে; এসেছে উপনিবেশ-বিরোধি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের অংশ হিশেবে। সন্ত্রাসও আছে তাঁর লেখায়; আছে কুসুমিত ইস্পাতের আলেখ্য। জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছেন ফ্যানন, সেই স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সবার ভেতর।

'ইতিহাস' নিয়ে ভেবেছেন ফ্রানৎস ফ্যানন; 'ইতিহাস নিজে নিজের পুনরাবৃত্তি করে'—এই কথা ফ্যাননের; এই কথার মধ্যে একদিকে তাঁর ইতিহাসবোধ, অন্যদিকে ইতিহাসকে 'মুক্তি'র সম্ভাবনাময় প্রকল্প ভাববার প্রেরণা, লুকিয়ে আছে। ইতিহাস মুক্তির প্রকল্প এই অর্থে যে, যথামুহূর্তে ইতিহাস বদলাতে পারে; সেই কারণে ইতিহাস জাগৃতির অপরূপ সংবেদন ধরে রাখে নিজের ভেতর। ফ্যাননের চোখ ভবিষ্যতের দিকে; তিনি ইতিহাসকে বদলাতে চান; তাঁর বিশ্বাস, বর্তমানই সব নয়, বিরাট ভবিষ্যত তৃষিত কাতরতায় অপেক্ষা করছে। সনাতন অর্থে এইটেই হয়তো ইতিহাসের শিক্ষা; এই শিক্ষায় বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রবিষ্ট। অব্যবহিত বর্তমানকে তিনি ভবিতব্য বদলানোর কাজে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি পদ্ধতি, শৃংখলা, বিন্যাসে কমই[৩] নির্ভর করেন; উপনিবেশের ডিসকোর্সে ফ্রানৎস ফ্যাননের ঘোর সংশয় আছে।

"জগতের হতভাগ্য" (১৯৬১) বইতে ফ্রানৎস ফ্যানন গণমানুষের বিক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছেন; পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র, মুখ ও আদল তাঁর টেকস্টে

পুনরাবৃত্ত; নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তিনি এগুলোকে তুলে এনেছেন—কিন্তু এসবের কোনো নির্দিষ্ট নাম তাঁর লেখায় নেই, কারণ তিনি এপিক, ফিকশন, স্যাটায়ার কোনোটাই লেখেননি। তিনি চান আমাদের চেহারা যাতে ঠিকমতো উঠে আসে, এবং প্রত্নপ্রতিমা থেকে অন্যদের আদলও যাতে স্পষ্ট হয়। 'কালো চামড়া শাদা মুখোশ' (১৯৫২) বইতে তিনি বলেছেন, 'এমন সুসময় মাঝে মাঝেই আসে যখন চারদিকে দুঃখ, জ্বরা, মৃত্যু, আগুন, দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা; তখন বাছাইয়ের পালা, লোহা পিটিয়ে অস্ত্র বানানোর সময় তখন। কারণ মানুষকে 'পৌছুতেই হবে মীমাংসায়' [পৃ. ৮]। আলজিরিয়ার ঔপনিবেশিক আমজনতার একদশকের সংগ্রাম ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখায় যেভাবে আছে, সেরকম আর কোথাও নয়! সরকারী নথিপত্রে নয়, রিপোর্টে নয়, দলিল-দস্তাবেজে নয়, বিশেষজ্ঞের নিখুঁত প্রতিবেদনে নয়। ফ্যানন পৌরাণিক মুখ এনেছেন তার লেখায়; কিন্তু উত্তাল সমকালের ভেতর পুরাণ কেন? কারণ পুরাণের মুখচ্ছদ ছাড়া আলজিরিয়ার ঔপনিবেশিক মুহূর্ত কিছুতেই ধরা যেতো না। ফ্যানন মনে করেন না বিশেষজ্ঞরাই সব বোঝেন, নেটিভরা বোঝে না। ফ্যানন বলেন— নেটিভরা সমস্তটা বোঝে, বোঝে আর হাসে; তারা বোঝে তারা জন্তু নয়, তারা মানুষ, যখন বোঝে তখন তার হাতে উঠে আসে অস্ত্র; সন্ত্রাস ছাড়া মানুষ জন্তুতে পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব অবিচলিত থাকে না, কড়া রোদ্দুরের সোজা সত্যও ধাঁধার মতো লাগে। উপনিবেশই শেখায় মানবতা জিতে নেয়ার জন্যে অস্ত্রের ব্যবহারের কথা।

প্রজন্মের ওপর[৪] বড়ো বিশ্বাস ছিলো ফ্রানৎস ফ্যাননের; বলেন, প্রত্যেক প্রজন্ম সকল বিভ্রম দূরে ঠেলে খুঁজে বার করে তার মিশন; হয় সে মিশন সফল করে কিংবা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রজন্মের ভেতর ফ্যানন দেখেছেন ঐক্য এবং একতার চরিতার্থতা; প্রত্যেক প্রজন্ম আইডেনটিটির জন্যে সংগ্রামশীল, ফ্যাননের এই বিশ্বাস বেশ দৃঢ়। তার কারণ ফ্যানন মানুষের সংঘবদ্ধতাই শুধু দেখেছেন, জনতার ঐক্য তিনি অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন, সম্মিলন ও সংঘশক্তির সার্থকতা নিজের জীবন থেকে তিনি শিখেছেন। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ, পারক্যে ত্রাসিত আধুনিক ইনডিভিজুয়াল, আফ্রিকার উত্তরাধিকারের ভেতর নেই। পশ্চিমের সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা, পারক্য, শূন্যতা, অনিকেতভাবনা সাধারণ সত্য; কিন্তু আফ্রিকার সাহিত্যে 'বিচ্ছিন্ন মানুষের' আখ্যান পাওয়া যায় না। আফ্রিকার একটিও এমন উপন্যাস নেই, যার নায়ক চারপাশের কোলাহল থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে। বিজনবাসী, একাকিত্বে মজ্জমান, বিরূপ বিশ্বের ইনডিভিজুয়ালেরা পশ্চিমের আধুনিক সাহিত্যের অলংকার; কালো আফ্রিকার সাহিত্যে এদের দেখা মেলে না। চিনুয়া আচিবির 'সবকিছু খসে পড়ে' (১৯৫৮) 'জনতার একজন' (১৯৬৬); 'ঈশ্বরের তীর' (১৯৬৪); জুমু কেনিয়াট্টার 'কেনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে' (১৯৩৮); ওকট বিটেকের 'লাওইনের গান' (নাইরোবি ১৯৬৬); ফার্দিনান্দ ওয়েনোর 'গৃহভৃত্য' (১৯৬৬); জে. ওকোলো ওকোলির 'এতিম' (নাইরোবি ১৯৬৮); নগুগি ওয়া থিংগুর (জেমস নগুগি) 'নির্জনের কালো সন্ন্যাসী' (১৯৬৮); 'কেঁদো না, বাছা' (১৯৬৪); 'ঘরে ফেরা' (১৯৭২); 'ভুট্টার দানা' (১৯৭০); —এলিচি আমাদির 'একত্রবাস' (১৯৬৬); লেগসন কেইরার 'অস্পষ্ট ছায়া' (১৯৬৭); পিটার প্যালাংগিওর 'রৌদ্রলোকে মৃত্যু' (১৯৬৬) কিংবা লুইস নকোসির 'ঘর ও নির্বাসন' (১৯৭০); এইসব পৃথিবীখ্যাত রচনামালার একটিতেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপবর্তী

নিঃসঙ্গ বিজনবাসী ইনডিভিজুয়াল নেই। ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখার লক্ষ্যও তাই বিশেষভাবে-স্বতন্ত্র-কেউ নয়, বরং অব্যবহিত প্রতিবেশের যে-কোনো সামাজিক/ঔপনিবেশিক মানুষ।

ফ্রানৎস ফ্যাননের একমাত্র ভরসা মানুষ, জনতা, পিপল। বুর্জোয়ার ওপর তাঁর ভরসা নেই, কেননা ইউরোপে বুর্জোয়ারা যে ভূমিকা পালন করেছে আফ্রিকায় করেনি; মধ্যবিত্তের ওপরও তিনি নির্ভর করতে পারেন না[৫]:

> মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে-কোনো সমাজের অকেজো অংশ; মধ্যবিত্ত, বিবর্তনে বিশ্বাস করে না; মধ্যবিত্ত সকল অর্জন, সাফল্য, প্রগতির বিরুদ্ধে; মধ্যবিত্ত সকলরকম উদ্ভাবনায় অবিশ্বাসী; মধ্যবিত্তেরা তৈরি করে বদ্ধ সমাজ, যে-সমাজে জীবনের কোনো স্বাদ নেই, স্পৃহা নেই, উত্তাপ নেই; যে সমাজের বাতাস বদ্ধ, যেখানে মানুষ এবং তার চিন্তা কলুষিত। আমার বিশ্বাস, যে-ব্যক্তি এই আবদ্ধতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে চায়, সে এক অর্থে বিপ্লবী মানুষ।

ইউরোপে ডায়নামিক জাতীয় বুর্জোয়ার অভ্যুদয় স্মরণীয় ঘটনা; ওই বুর্জোয়ার কারণে অর্থনীতিতে সজীবতা আসে, কৃষি-ব্যবস্থা উন্নত হয়, প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, সর্বোপরি একটা জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ইউরোপের শিক্ষিত-সেক্যুলার সমাজ বুর্জোয়ার দান, সামাজিক সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়ার রচনা[৬]।

আগেও বলেছি ফ্রানৎস ফ্যাননের চিন্তাধারা সুশৃংখল নয়; জাতীয় বিপ্লবের মুহূর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি অসংগতি তৈরি করেছেন। কিন্তু শৃংখলা বা সৌন্দর্যের জন্যে ফ্যাননের লেখা আকর্ষণীয় নয়, তাঁর গুরুত্ব মহৎ আবেগের কার্যকর উপস্থাপনায়, সজীব বুদ্ধিবৃত্তিতে, প্রাণময়তায়। ফ্রানৎস ফ্যানন অনেক কিছু সরলীকরণ করেছেন; কেননা অনেক কিছু তিনি জানেন; আফ্রিকা তাঁর করতলে বলেই সরলীকরণ তাঁর জন্যে শোভন হয়েছে। ফ্যানন আফ্রিকার কথা বলেছেন কর্তৃত্বের বাসনা থেকে নয়, বিশেষ একটা লক্ষ্য থেকে, তিনি উসকে দিতে চান প্রতিক্রিয়া।

ফ্রানৎস ফ্যানন কাজ করেছেন আলজিরিয়ার পটভূমিতে; আলজিরিয়ার জীবন ও জনপদ তাঁর মুখস্থ বলেই তাঁর আরগুমেন্টের ভিত্তিও আলজিরিয়া। ফ্যানন আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী ভাবুক। আলজিরিয়ার কৃষকদের তাঁর মনে হয়েছে সবচেয়ে র‍্যাডিকাল; কেননা কৃষকদের ভেতর ঐতিহ্যের অনুশাসন নেই। আলজিরিয়ার প্রথাগত পরিবারের ভাঙন ফ্যাননের ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে। পরিবারের এই ভাঙনের মধ্যে ফ্যানন ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভব আবিষ্কার করেন। 'ক্ষয়িষ্ণু উপনিবেশবাদ' (১৯৭০) বইতে[৭] তিনি বলেন, পরিবারের যূথবদ্ধতা, পিতৃতন্ত্র, একক প্রভুত্বের ঐক্য—আলজিরিয়ার সমাজে কমে আসছে, আরব সমাজের তুলনায় আলজিরিয়ার পরিবার এইখানে আলাদা। মানুষ বিদ্রোহ করছে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিচ্ছে, অবিবেচিত মৃত্যুকে পরোয়া করছে না; ব্যক্তিতন্ত্র এইভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। 'পৃথিবীর হতভাগ্য' (১৯৬১) বইতে এইসব কথা যখন ফরাশি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়, আলজিরিয়ার সমাজ পৃথিবীর চোখে রীতিমত গবেষণার বস্তুতে পরিণত।

ফরাশি উপনিবেশের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখার অন্যতম প্রেরণা। তবে ফ্যানন জানতেন, স্বাধীনতার পরপরই তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশে রাতারাতি পরিবর্তন ঘটবেনা। স্বাধীনতা সব সমস্যার সমাধান নয়। পরিবর্তন আরো অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত। ফ্রানৎস ফ্যানন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর উপনিবেশ-বিরোধি ধ্রুপদীগ্রন্থের জন্যে; কালো মানুষের দুঃখ এবং শ্বেত দুঃশাসনের বাস্তবতা অমন করে আর কাউকে নাড়া দেয়নি:

> আমি বিশ্বাস করি, অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্যের দুর্ভোগ বোঝা অসম্ভব নয়; কিন্তু আমি একজন কালো মানুষ। আমার সমস্যা কালো হওয়ার সমস্যা, এই সমস্যা একান্তভাবেই আমার, এবং এই সমস্যা আমি ভাবতে চাই। মিস্টার মানুনির পক্ষে আন্দাজ করাও কঠিন, শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে কালো মানুষের সংঘাত কতো নিষ্ঠুর। এ বইতে আমি কালো মানুষের দুঃখের আখ্যান মেলে ধরতে চাইছি। এই দুঃখ শারীরিকও, এই দুঃখ বিমূর্ত নয়। নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। এমনকি অসৎও হতে পারি আমি, কেননা আমি অবশ্যই পক্ষ নেবো: কালো মানুষের পক্ষ।[৮]

ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখা পড়তে পড়তে আমরা তার অংশ হয়ে যাই; ফ্যাননের কল্পনা, আবেগ, যাতনা আমরা ভাগ করে নিই। গদ্য লিখেছেন তিনি ঔপন্যাসিকের মতো; আর সাহিত্য হিশেবে দেখলে, তাঁর "পৃথিবীর হতভাগ্য" (১৯৬১) বইটিকে, ম্যাথু আর্নল্ডের 'কালচার এ্যান্ড এনার্কি' বার্নাড শ'র 'মেজর বারবারা' কিংবা জর্জ অরওয়েলের 'হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া'র মতো মনে হবে। ফ্যানন অনায়াসেই বলতে পারেন, শ্রমিকরা যে-ব্রীজ বানায়, সে ব্রীজ সম্পর্কে যদি তাদের সচেতনতা না থাকে—তাহলে তা না বানানো উচিত; ব্রীজের বদলে সাঁতরিয়ে পার হওয়া উচিত নদী, কিংবা নৌকোতে করে। কেননা ব্রীজ তৈরি হবে মানুষের মগজ আর পেশীর শক্তি থেকে; অন্যত্র বলেছেন: উপনিবেশের পরে মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে ঔপনিবেশিক সব মূল্যবোধ, ঘৃণা করবে ওসব কায়দা-কানুন রীতি-নীতি, বমিতে উগরে দেবে সব ফাঁপা বুলি। এইসব কথা শ্লোগানের মতো মনে হবে, কিন্তু এইসব কথা তিনি যখন লিখেছেন তখন, এবং এখনো, এর দরকার আছে প্রচন্ড; তাছাড়া ফ্যানন সবসময় সরল চিন্তা করেন নি, তার চিন্তা মাঝে মাঝেই দুর্গম পথে রওনা দিয়েছে। তার সঙ্গে আছে আয়রনির মোক্ষম ব্যবহার, এক জায়গায় বলছেন:[৯]

> গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট এক সরকারী সফরে প্যারিস পৌঁছে বলেছেন: 'গ্যাবন এখন স্বাধীন; ফ্রান্স এবং গ্যাবনের ভেতর কোনো কিছু বদলায়নি—সবকিছু আগের মতো আছে, আগের মতো চলছে'। আসলে এইটুকু কেবল বদলেছে যে, গ্যাবন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এখন তিনি, এবং ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট তাঁকে গ্রহণ করেছেন

সন্ত্রাসের প্রতি পক্ষপাত ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বিশ্ব ফ্যাননকে অন্ধ করেনি, তিনি জানতেন তৃতীয় বিশ্বের কর্তাদের হাঁকডাক খানিকটা বেশি; তিনি জানতেন, এদের মুখ বিভিন্নভাবে বন্ধ করে দেয়া দরকার; ফ্যানন বুঝতেন, স্বাধীনতার দীর্ঘ যাত্রা একদিন বিষিয়ে তুলবে মানুষদের, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী হবে,

এবং কারো কোথাও চাকরি হবে না; কেবল পতাকা উড়বে এবং ছুটির দিন ঘোষিত হবে, এবং জীবনটা কোনোভাবেই বদলানো যাবে না। সাধারণ মানুষের কাছে বাস্তব আরো বেশি করে বাস্তব হয়ে উঠবে।

দুই

যে-আলজিরিয়ার জন্যে ফ্রানৎস ফ্যানন লড়াই করেছেন, সে আলজিরিয়ার কি অবস্থা এখন? ফ্রানৎস ফ্যানন একটা 'মুক্ত সমাজ' কামনা করেছিলেন; ভেবেছিলেন এমন জাতীয়তাবাদের জন্ম ও-দেশে হবে, যার শেকড় দেশের মাটিতে হলেও চরিত্র হবে আন্তর্জাতিক। তিনি মার্কসবাদী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁকে আমূলবাদী মনে হয়, কিন্তু ফ্রানৎস ফ্যানন যে-কথাটা বুঝতে চাননি বা পারেননি, তা হলো, আলজিরিয়া প্রধানত একটা মুসলিম সমাজ, মুসলিম সমাজকে কেন্দ্রে না রেখে আলজিরিয়ার পরিবর্তন ঘটবে না। যে-কারণে ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখা আমাদের যতোটা অনুপ্রাণিত করে, খোদ আলজিরিয়ায়, বলতে গেলে তার কোনো প্রভাবই নেই।[১০] অথচ যে ত্যাগ, সংগ্রাম ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে আলজিরিয়া স্বাধীন হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোনো দেশের কথা এক্ষেত্রে মনে পড়ে না। স্বাধীনতার পর আলজিরিয়ায় একধরনের সাম্যবাদও দেখা গেছে; মালিকানা ব্যবস্থা, শ্রমিকদের আত্ম-প্রশাসন, কৃষি ও শিল্পে পরিবর্তন ইত্যাদি।

আলজিরিয়ার বীরোচিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা, বামভাবুকদের অনুপ্রাণিত করে। ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখায় যে-আলজিরিয়ার কথা আছে, স্বাধীনতা-উত্তর আলজিরিয়া সত্যিই কি তাই? সাম্যবাদী বিপ্লব আলজিরিয়ায় হয়েছে বটে, কিন্তু ফ্রানৎস ফ্যাননের মতো ভাবুকের কদর ওখানে হয়নি। তার কারণ সাম্যবাদের বিকাশ আলজিরিয়ায় ঘটেনি, বরং 'ইসলাম' একটা প্রধান শক্তি হিশেবে সেখানে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১১] সেক্যুলার সাম্যবাদের পথ আলজিরিয়ায় বন্ধ। কাজেই আলজিরিয়ার লোকেরা যে ফ্রানৎস ফ্যাননের নাম জানে না, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদিও আলজিরিয়ায় ফ্যানন এভিনিউ, এমনকি ফ্যানন স্কোয়ার আছে।

'ইসলাম' যথেষ্ট প্রভাবশালী, আলজিরিয়ার মানুষের মনোলোকে। এই প্রভাব দীর্ঘদিনের, এবং এর শেকড় অত্যন্ত গভীর। এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপর্বের যুক্তি, কিংবা আধুনিকতার আকস্মিক কোনো আরোপণ আলজিরিয়ার মুসলিম সমাজকে বদলাতে পারে না। সাম্যবাদী ভাবুকেরা এই সত্যকে এড়িয়ে যেতে চান, কিন্তু তা সম্ভব নয়; আর্নেস্ট গেলনার বার বার মনে করিয়ে দেন এই কথা। অথচ এমন নয় যে, আলজিরিয়া পশ্চিমের সংস্পর্শে আসেনি। আলজিরিয়া পশ্চিমের অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবীকে ওদেশের তীর্থযাত্রিক করেছে। যেমন আঁন্দ্রে জিদ, বিপ্লবের অনেক আগে ১৮৯৩ সালে, আলজিরিয়ায় যান। ভেবে আশ্চর্য হতে হয় আঁন্দ্রে জিদ নিছক ট্যুরিস্ট হিশেবে আলজিরিয়ায় যাননি, গেছেন এক ধরনের আধ্যাত্মিক এষণায়, আত্মজ্ঞানের জন্যে। আলজিরিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জিদ একখানা উপন্যাসও লিখেছেন; জিদের লেখা থেকে আলজিরিয়ার আজকের পরিস্থিতি ভালোরকম বোঝা যায়। আঁন্দ্রে জিদ ছিলেন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী; তবে খ্রিষ্টিয় শুদ্ধিবাদ নিয়ে তাঁর মনে কিছু গোলযোগ দেখা দিলে

তিনি আলজিরিয়ায় যান; তাঁর একমাত্র ভাবনা ছিলো: মানুষ তার নিজের স্বভাব-অনুসারে বাঁচতে পারবে না কেন?

সে অনেক লম্বা কাহিনী। আলজিরিয়ায় জিদের সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ড এবং লর্ড আলফ্রেড ডগলাসের দেখা হয়। আলজিরিয়ার 'বিসকারা মরুদ্যান' জিদকে পাগল করে ফেলে; এই মরুদ্যান নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন, তাঁর উপন্যাস ও আত্মজীবনীতে বিসকারা মরুদ্যানের বর্ণনা আছে। আঁদ্রে জিদ লিখেছেন :

> 'বসন্ত ছুঁয়ে গেছে বিসকারার এই মরুদ্যান...আমি স্তব্ধভাবে তাকে দেখেছি, শুনেছি, নিঃশ্বাস নিয়েছি—দেখলাম আমার হৃদয় সকল বন্ধন থেকে মুক্ত, অশ্রুময়; করুণ-কাতর; আমি বুঝলাম, এই মরুদ্যানের কোথাও অ্যাপেলো থাকতেন'।

যাই হোক এই মরুদ্যান, কথা হলো, এই মরুদ্যান ছিলো একটা পতিতালয়; পতিতা নারীরা ছিলো উলাদ নীলের উপজাতি। এই উপজাতিদের ঠাকুর-পুরোহিতেরা যৌনচর্চা অনুমোদন করতেন। উলাদ নীলের রমণীদের নিয়ে লোককাহিনীর জন্ম হয়েছে অনেক। উলাদ নীলের নারীরা ছিলো আসলে আধা-ধর্মীয় আধা-পতিতা, এবং উপজাতির ঠাকুরেরা একে সমর্থন করতেন। কিন্তু এই ঠাকুরদের সঙ্গে মুসলিম উলেমাদের বিরোধ তখন থেকেই ছিলো, যদিও সেই বিরোধ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে পরবর্তীতে। আঁদ্রে জিদ যে আলজিরিয়ার কথা লিখেছেন, সেসময় একদিকে ধর্ম অন্যদিকে নিষিদ্ধ যৌনসম্ভোগ সাধারণ ঘটনা ছিলো। উপজাতীয় ধর্মবোধের সঙ্গে উলেমাদের[১২] ইসলামশাস্ত্রের বিরোধ আলজিরিয়ার প্রধান বাস্তবতা। কিন্তু ধর্মের বাইরে আলজিরিয়া কখনো ছিলো না, এইটেই মূল কথা।

আলজিরিয়ায় কেন গিয়েছিলেন আঁদ্রে জিদ? কেন উপজাতীয় মারাবাউট সন্তের দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি? জিদ আলজিরিয়ায় গিয়েছিলেন স্বভাবের পরীক্ষা দিতে, বিসকারা মরুদ্যানের অ্যাপেলোর নিকট তিনি নিবেদিত হন এইভাবে:[১৩]

> 'আমাকে গ্রহণ করো তুমি, সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করো। আমি তোমার। তোমারই অনুগত। তোমার কাছেই আমি সর্বস্ব সমর্পণ করছি। আমাকে আলোকিত করো। দিনের পর দিন তোমাকে পীড়ন করেছি আমি। আমি ব্যর্থ। আজ স্বীকার করছি তোমাকে। তোমাকে আর কখনো দমন করবো না; তোমার চরণে আমি প্রণত, আমাকে গ্রহণ করো'।

কার কাছে জিদের এই প্রণতি, কোথায় তাঁর এই নিবেদন? ধর্মের কাছে?—না। পুরোহিতের কাছে?—না। মারাবাউট সন্তের কাছে?—না। আঁদ্রে জিদ তাঁর স্বভাবের নিকট পরাভবের কথা স্বীকার করছেন; স্বভাবের দাবি সর্বাধিক, প্রকৃতি সর্বজয়ী; যা কিছু প্রাকৃতিক তাই স্বভাবসংগত, কাজেই স্বভাবের কাছে ফিরে যেতে হবে। জিদের এই আত্মোপলব্ধি কি আলজিরিয়ার কোনো কাজে লাগবে? সাম্যবাদীদের? কম্যুনিষ্ট তীর্থযাত্রিকদের? মুসলিম মৌলবাদীদের? আজকের সামরিক অটোক্র্যাটদের?

আলজিরিয়া আঁদ্রে জিদের কল্পনা মতো চলেনি। একের পর এক মুসলিম রিফর্মেশন আলজিরিয়াকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। যে 'বিসকারা মরুদ্যানে' অ্যাপোলনীয় স্বপ্ন দেখেছিলেন আঁদ্রে জিদ, সেই মরুদ্যান থেকে তাইয়েব উকবির মুসলিম মিশন শুরু হয়। আজকের আলজিরিয়া বেন বডিস, মুফতি আবদুহু, তৈয়ব উকবি, আলী মিরাডের আলজিরিয়া। ফ্রানৎস ফ্যানন এখানে দূরশ্রুত কোনো নাম; মুসলিম বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে আলজিরিয়ার পরিবর্তন অসম্ভব।

---

১. *Black Skin White Masks* (1952); *The Wretched of the Earth* (1961); *A Dying Colonialism* (1970)

২. David Cook, *African Literature/A Critical View*, London: Longman Group Ltd, 1977, p.200.

৩. ফ্রানৎস ফ্যাননের লেখা ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের বিপরীত; তিনি পশ্চিমের পদ্ধতি-শৃংখলা-বিন্যাসে নির্ভর করতে নারাজ। এডওয়ার্ড সাইদের *Orientalism* (Routledge & Kegan paul: Newyork, 1978) বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন সাইদও পশ্চিমের পদ্ধতি-পূজোর সমালোচক। পদ্ধতি ও শৃংখলার বাড়াবাড়িতে আসল তাৎপর্যটাই চাপা পড়ে বলে সাইদের বিশ্বাস। উনিশ শতকেই অরিয়েন্টালিজম ও প্রাচ্যতত্ত্ব একটা প্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্সে পরিণত হয়; যে ডিসকোর্সে পদ্ধতির আড়ম্বর, উপাত্তের লাগসই বিন্যাস, বিজ্ঞানসম্মত শৃংখলা ইত্যাদি প্রধান ব্যাপার। এই ডিসকোর্স পশ্চিমের নিজস্ব পদ্ধতি ও শৃংখলার ডিসকোর্স, এই পদ্ধতিতে অরিয়েন্ট এবং অরিয়েন্টাল অধস্তনরূপে চিহ্নিত হয়েছে। অরিয়েন্টালিস্টদের দরকার ছিলো মেথড, যুক্তি, বিন্যাস; কি নিয়ে লিখছেন তা তাঁদের ভাবিত করেনি। পশ্চিম বড়ো, পশ্চিমের ক্ষমতা বড়ো, পশ্চিমের ডিসকোর্স শ্রেষ্ঠ এইসব সংস্কার দ্বারা বিশেষজ্ঞরা চালিত হয়েছেন। এই ডিসকোর্স ঔপনিবেশিক, ও শক্তিশালী; এই ডিসকোর্সে কালো/অরিয়েন্ট ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রক্রিয়ায় নির্জিত, বিকৃত, রূপান্তরিত হয়েছে। এডওয়ার্ড সাইদ ফ্রানৎস ফ্যাননের বক্তব্য দ্বারা প্রচন্ডরকম প্রভাবিত।

৪. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, Newyork, 1963, p 37

৫. Frantz Fanon, *Black Skin White Masks*, Newyork, 1963, p.160.

৬. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, 1963, p. 140-1.

৭. Frantz Fanon, *A Dying Colonialism*, tr. Haakon Chevalier, Penguin, London, p. 31-3.

৮. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, 1963, p. 61.

৯. Fanon, Ibid, p. 89.

১০. Ernest Gellner, *Muslim Society*, Cambridge University press, 1993, p. 149.

১১. Ibid p. 150.

১২. F.Colonna, *cultural resistance and religious legitimacy in colonial Algeria*, in 'Economy & Society', Vol. 3, 1974, p. 233.

১৩. Gellner, Ibid, p. 151-153.

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসজিজ্ঞাসা

ইতিহাসকে মানবিক চিন্তার একটা প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য করা পৃথিবীতে নতুন নয়। এমনকি ধর্মগ্রন্থগুলোতেও ইতিহাসের সংকেত, আখ্যান ও সন্ত্রাস অনবরত ব্যবহৃত হয়েছে[১]। তবে 'ইতিহাস' বিষয়ে বিশিষ্টরকম বিশ্বাস গড়ে ওঠে আধুনিককালে। যে কারণে দেখা যায়, প্রাগাধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের খোঁজে বারবার তওরাত বাইবেল কোরানের দ্বারস্থ হচ্ছেন; ওই ফ্রেমেই তাঁরা তুলে ধরছেন নিজেদের আখ্যান,উপকথা, বৃত্তান্ত । ধর্মগ্রন্থ এবং মানুষী আখ্যানকে আলাদা করা বহুদিন পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। ইউরোপের চিন্তায় বাইবেলের শাসন অমোঘ; বাইবেল এবং খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের বিরাট প্রতিপত্তির কারণে 'ইহুদী'রাও ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিতে জায়গা পায়নি বহুদিন। প্রাগাধুনিক ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা' ইতিহাস'কে পুনরাবৃত্তি কিংবা চক্রাকার আবর্তনের ছকে দেখেনি; রৈখিক সময়ভবাধের নিরিখে তারা রৈখিক ইতিহাসের কল্পনা করেছে। ইতিহাসের নির্দিষ্ট সূচনা এবং নির্ধারিত সমাপ্তিতে তাদের বিশ্বাস। বিশ্বলোকের সৃষ্টিতে ইতিহাসের সূচনা, এবং মসিহর (মেসিয়াহ) আবির্ভাব ও আধিপত্যে তার সমাপ্তি। এই ইতিহাসবোধেও প্রগতির একটা অনুশাসন আছে যদিও তা ধাবমান স্বর্গের দিকে, এবং তার সঙ্গে এনলাইটেনমেন্ট এবং আঠারো-উনিশ শতকের 'প্রগতি' ধারণার কোনো মিল নেই। প্রভুর আজ্ঞায় পৃথিবী চলছে, এবং প্রভুর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি: এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবনধারা লেখকদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

তবে মানুষের বিশ্বাসের ধরন এবং নির্ভর বদলে গেলো পরে, সর্বোদয়ের সোপান এবং আলোকপর্বের পটভূমিতে। রেনেসাঁসের সমস্ত অর্জনের আকর্ষণীয় পরিণতির নাম: এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপর্ব; এই আলোকপর্ব আবার আধুনিকতার স্মরণীয় সূতিকাগার। আধুনিকতার ডাঙায় 'ইতিহাস' বিষয়ে নতুন ধরনের ঝগড়া শুরু হলো[২]। কেউ লিখতে চাইলেন ইতিহাসের ইতিহাস, কেউ ইতিহাসের টেকস্টকে পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত করলেন; কারো মনে হলো , ইতিহাসের ভেতর রাজ্যশাসন ও রাজ্যনাশের সুন্দর গল্প পাওয়া গেলেও তাতে বিপুল জনপদের কাহিনী নেই; কারো মনে হলো, এতদিনকার ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্মৃতিশাস্ত্র, এক ধরনের পুরাণ ও পুরাতত্ত্ব; কালনির্ঘন্টি এবং ইতিহাসের তফাত বিষয়ে ভাবলেন কেউ কেউ : কেউ কেউ অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, এতোদিন পর্যন্ত যাকে ইতিহাস বলা হয়েছে তার মধ্যে সত্যিকার মানুষের কণ্ঠস্বর নেই, তা মহৎ মানুষের বিরাট কিংবদন্তী, এবং সামরিক কুশলতা ও রোমাঞ্চকর অভিযানের আখ্যানে ঠাসা।

· ইতিহাসের সঙ্গে রাজনীতির যোগ অনিবার্য কিনা, কিংবা ইতিহাস চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক কিনা, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের তর্ক দীর্ঘদিনের;এবং আমরা যদি তিন

প্রজন্মে বিধৃত ও বিকশিত ফরাশি 'এ্যানালস স্কুলে'র (১৮২৯-১৯৮৯) ইতিহাসভাবনা বিচার করে দেখি, দেখবো, 'ইতিহাস'-বিষয়ক তাঁদের সকল বিতর্কের মূলেও রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বন্দ্ব[৩] প্রধানত কার্যকর। 'এ্যানালস ঘরানা'র ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য ছিলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনো-ঐতিহাসিক, এককথায়, অ-রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা। কোনো কোনা ঐতিহাসিকের লক্ষ্য ছিলো, মানসিকতার ইতিহাস রচনা: কেউ কেউ গুরুত্ব দিলেন অতীত জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা, ধর্ম, মূল্যবোধ-ব্যবস্থায়; শিল্পকলা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ফিরে গেলেন কেউ কেউ।

তবে 'ইতিহাসে'র সঙ্গে রাজনীতির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ এ্যানাল্‌স স্কুলের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আমরা অনেকের মধ্যে মিশেল ফুকোর নাম বলতে পারি, যিনি ইতিহাসের ডিসকোর্স থেকে রাজনীতি ও ক্ষমতা-সম্পর্ক নতুনভাবে উদঘাটন এবং নতুন প্রক্রিয়ায় বিন্যাস করেন। বাংলায় যে-রকম 'কবিদের কবি' বলি, মিশেল ফুকো সেইরকম 'ঐতিহাসিকদের ঐতিহাসিক।'

তবে আজকের দিনে 'ইতিহাস'নিয়ে যে তর্ক দেখা দিয়েছে, সেটা অন্যরকম। তর্কটা তুলেছেন, উত্তরাধুনিকেরা, তাঁরা ইতিহাসের বিরোধিতার কথা বলছেন। উত্তরাধুনিকতার পুরোধা বুদ্ধিজীবী জাঁফ্রাসোঁয়া লিওতার লিখেছেন, যেহেতু গ্রান্ড-ন্যারেটিভের অনুশাসন আজ অকেজো, তাই ইতিহাসের প্রতিশ্রুতিও লুপ্ত; ইতিহাসের ঐতিহাসিক স্বপ্নকে তাঁরা দিবাস্বপ্ন বলছেন, দিবাস্বপ্নের মধুর অঙ্গীকার তাঁদের মতে জাজ্জ্বল্যমান প্রবঞ্চনা। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তো বটেই, চিন্তার ধরনেও আজ যে অনেকখানি ওলোটপালট ঘটেছে, তা বোঝা যায়। দেরিদার 'ডিফারেন্স' সেদিক থেকে একটা বিরাট প্রতীকের মতো। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা আজ ব্যবধান/ ব্যাকৃতি/অন্যতা/ভিন্নতা/ অপরতা /আদারনেসের অন্বেষণে অসম্ভব ব্যস্ত। অভিজ্ঞতার আয়ত ও অনায়ত স্তর তাঁদের চিন্তার ফ্রেমকে সম্পূর্ণ বদলে দিচ্ছে যেন। কাফ্‌কার এক প্যারাবলে আছে:

> 'তার শত্রু দু'জন: প্রথম শত্রু তাকে ঠেলছে পেছনের উৎস থেকে সামনের দিকে; আর অপর শত্রু, তার পথ বন্ধ করে রেখেছে সামনে । দু'জনই তার শত্রু, দু'জনের সঙ্গে তার যুদ্ধ। প্রথম শত্রু চায় সে লড়ুক দ্বিতীয়জনের সঙ্গে, দ্বিতীয়জন চায় সে লড়ুক প্রথমজনের সঙ্গে। কিন্তু এই দু'জনই তো তার একমাত্র শত্রু নয়, সে নিজেও নিজের শত্রু, তাছাড়া কে বলবে তার উদ্দেশ্যই-বা কি'? দীর্ঘ অমারজনীর কোনো এক মুহূর্তে সে হয়তো স্বপ্ন দেখে শত্রুর মাঝখান থেকে লাফিয়ে অদৃশ্য হবার, আর লম্ফঝম্পে তার দক্ষতাও কিছু আছে, তাই ওরকম লাফ, দিতেও পারে সে, নিরপেক্ষতার ছুতোয়, দুই বিরোধীকে পরস্পরের মুখোমুখি করে।'

প্যারাবলের এই উদ্ধৃতি এনে হান্নাহ আরেণ্ড[৫] বোঝাতে চান, মানুষের 'চিন্তা' নামক বস্তু কোথায় জন্ম নেয়, কি ভাবে এবং কোন শূন্যতায়'? হান্নাহ বলেন, চিন্তার জন্ম এক যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে অতীত এবং ভবিষ্যতের শক্তি পরস্পর যুযুধান। দুই শক্তির মধ্যবর্তী ফাঁকে তৈরী হয় চিন্তা,এবং চিন্তার অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা অনবরত অভ্যাস ও অনুশীলন-সাপেক্ষ, কিন্তু তার কোনো শেষ নেই, সমাধান নেই। আজকের

উত্তরাধুনিকদের যে ইতিহাস বিরোধিতা, সেটাও ইতিহাস-চিন্তারই অংশ—আর চিন্তা হলো সেই জিনিশ, যেখানে একটা নিরন্তর লড়াই চলছে। সেই লড়াই থেকে পালানোর স্বপ্ন দেখা যায়, কিন্তু পালানো যায় না। যায় না বলেই জাক দেরিদাকে আবার মার্কস খুলে বসতে হয় এবং মার্কসের অভিনবত্বে অভিভূত হতে হয় [দ্র. নিউ লেফট রিভিয়্যু, জুলাই ১৯৯৪]।

উত্তরাধুনিকেরাও শেষপর্যন্ত ইতিহাস-বিরোধি নন; তাঁরা মূলত ইতিহাসের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত, তাঁরা ইতিহাস-প্রকল্পের ভেতর যে প্রগতিবাদ বা আশাবাদ আছে (যে প্রগতি প্রহসনে, এবং যে আশা নিষ্ঠুরতায় বিকৃত) কেবল তাকেই আক্রমণ করতে চান। উচ্চাশার বদলে কোনোরকম বেঁচে-বর্তে থাকা, ট্রাজেডির বদলে সাধারণ দুঃখকষ্টের উপলব্ধি, এবং গভীর মহৎ বয়স্ক চিন্তার স্থলে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে তাঁরা উপযোগী ভাবছেন আজ।

সেজন্যেই হয়তো বুদ্ধিবৃত্তিতে বর্তমানে গুরুত্ব পাচ্ছে 'আয়ত' অভিজ্ঞতার বদলে, অভিজ্ঞতার অনায়ত স্তরের উপলব্ধি, ব্যাখ্যান এবং বিশ্লেষণ। কিন্তু অতীতের সঙ্গে অনিশ্চিত আগামীর যোগ রহিত করা অসম্ভব বলেই, উত্তরাধুনিকেরাও প্রাক্তন অগ্রজদের উত্তরাধিকারকে বারবার নেড়েচেড়ে দেখছেন, হয়তো বাদ দেয়ার জন্যে ; তবু তা-ও তো ফেরা, অন্তত একধরনের ফেরা, ইতিহাসের দিকে।

২.

'ইতিহাস' নিয়ে ভাবনা পশ্চিমের মতো আমাদের দেশেও হয়েছে। 'রাজরাজড়ার উপাখ্যান'কে যে ইতিহাস বলা যায় না, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধে[৬] বলেছেন। ঔপনিবেশিক বাংলার উনিশশতকী ভাবুকেরাও ইতিহাস নিয়ে অনেককিছু ভেবেছেন। অনেকের ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সেই ভাবনায় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই যুক্ত, যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সকলের উদ্যমকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করে। ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানেরা তাদের ধর্মের অতীতকে বারবার বর্তমান গ্লানির নিদান হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে; ধর্মচ্যুতিকে তারা চিহ্নিত করে সমকালীন বিড়ম্বনার প্রধান উৎস হিশেবে, মুসলমানদের চোখে তাই ইতিহাস হয়ে উঠলো অতীত ইসলামের ইতিহাস, প্রাচীন গৌরবের রোমন্থন ; যার রাজ্য নেই, ক্ষমতা নেই, দরবার এবং কর্তৃত্বনেই, তার ইতিহাস হতে পারেনা। এইটেই ছিলো মুসলিম ভাবুকদের বিশ্বাস এবং এইটেই তাঁদের অতীতব্রাজনার যুক্তি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভাবুকেরা ভেবেছেন, উন্নত শিক্ষার বদৌলতে বর্তমানের বদল অপ্রতিরোধ্য ; সেজন্যে তিনি গৌরবময় হিন্দু অতীতের কথা তোলেন, কিন্তু সেই অতীতে ফেরার কথা বলেন না; বলেন, প্রতীচ্যের সার্থক পরিগ্রহণের মাধ্যমে তার পুনর্গঠন, নবায়ন, আধুনিকায়নের কথা।

আর আজকে, উত্তর-ঔপনিবেশিকপর্বে, ভারতবঙ্গীয় ভাবুকেরা এক নতুন ইতিহাসতত্ত্ব প্রস্তাব করেন: সাবঅলটার্ন স্টাডিজ বা নিম্নবর্গের ইতিহাস। কেননা বর্তমানে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কেবল লিখিত ইতিহাসে জীবনের সকল স্তরের সমূহ বিবরণ ধরা পড়েনা, তার বাইরেও ইতিহাস থেকে যায়। ইতিহাসের লিখিত বয়ানকে একমাত্র ইতিহাস ভাবলে অনেক সমস্যা তৈরী হয়, কেননা, সরকারী নথিপত্রও ঐতিহাসিক

বিবরণের একটা অংশ— কিন্তু তাকে অভ্রান্ত গণ্য করার ভেতর বিপদ বিস্তর। শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টা পরীক্ষা করলেও দেখা যায়, আমাদের ইতিহাসের যে-সব মুহূর্তকে আমরা গৌরবকেন্দ্র মনে করি যেমন ভাষা -আন্দোলন, ভাষাবাহিত বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ, অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ—সরকারী অভিলেখ্যাগারে তার বিবরণ এবং ব্যাখ্যা একেবারে ভিন্ন। সত্যপক্ষ যাকে মহৎবিদ্রোহ বলে, সরকারপক্ষ তাকে নৈরাজ্য বললে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। ইতিহাস নিয়ে সমস্যার প্রধান কারণ লিখিত বয়ানকে বিচারোর্ধ ভাববার মনোভঙ্গি। সেজন্যে লিখিত 'টেকস্টে'র আভিজাত্যকে আজ আর প্রাক্তন মূল্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে ইতিহাস তাই কয়েকরকম : (ক) যা লেখা হয়েছে; (খ) যা প্রবলপক্ষ নির্দেশ করেছে বা প্রবলপক্ষের নির্দেশে যার আকল্প বা উপকল্প নির্মিত হয়েছে; (গ) যা লেখা হয়নি— অর্থাৎ নিম্নবর্গ /অধস্তন/ব্রাত্য / অন্ত্যজ /সাধারণ/সাবঅলটার্ন জনপদ ও জীবনধারার ইতিহাস। অধ্যাপক রণজিৎ গুহের উদ্যোগে একগুচ্ছ ভাবুক যে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ প্রস্তাব করেছেন, তার ভেতর শেষোক্ত ইতিহাস উদঘাটনের বাসনা বিদ্যমান। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ মূলত বিশেষজ্ঞদের রচনা হলেও এর ভেতর কর্তৃত্ববাদী আরোপণ সরলীকরণ কিংবা যৌথপ্রযোজনার স্বতঃসিদ্ধতা লক্ষ করা যায় না। রচয়িতাদের অনেকেই বন্ধুত্বের সম্পর্কে অন্তরঙ্গ হলেও লেখার ভেতর সিদ্ধান্তের কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির আবদ্ধতা নেই, একজনের মীমাংসা আরেকজনের ওপর ভর করেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশ্লেষণের পরিসর অসংকুচিত বলে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ কোনো একক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেনা; তাই কেবল পণ্ডিতবর্গ নন, তরুণ প্রজন্মের ভাবুকেরাও এতে অভ্যর্থিত।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ সমাজব্যাখ্যা এবং ইতিহাসরচনার অভিজাত আকল্প (এলিটিস্ট প্যারডাইম)ভেঙ্গে দিতে চায়। নিম্নবর্গের বিষয়সমূহে নিমগ্নতা, কার্য এবং চেতনার সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ, এবং ক্ষমতা ও ডিসকোর্সের অঙ্গাঙ্গীযোগ বিষয়ে সতর্কতা সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকদের বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ একটা চ্যালেঞ্জের মতো।

রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসপ্রকল্পের সমালোচনায় স্টাডিজের প্রথম খণ্ডে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাকে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসরচনার ভূমিকা মনে করা যেতে পারে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন:[৮] ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দু'ধরনের উচ্চবর্গীয় অভিজাততন্ত্র এ-ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে : (ক) ঔপনিবেশিক অভিজাততন্ত্র (খ) বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী অভিজাততন্ত্র। এই দুই পন্থার নেপথ্যে আছে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের মতাদর্শগত প্রণোদনা। এই প্রণোদনায় যে ইতিহাসের জন্ম, তার অনুকরণস্থল সাধারণভাবে ব্রিটিশদের লেখা ইতিহাস। এর বক্তব্য হলো, ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তাবাদের সামগ্রিক বিকাশের মূলে এলিটদের ভূমিকা সর্বাধিক। এই এলিটরা মূলত ব্রিটিশ প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও পলিসির সৃষ্টি। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের 'উদ্দীপক' এবং 'সাড়া' (স্টিমুলাস এণ্ড রেসপনস) কথা দুটো দিয়ে এই উচ্চবর্গীয় ইতিহাসবাদকে ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা লেখকেরা বলতে চেয়েছেন : ব্রিটিশ প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান 'উদ্দীপকে'র মতো কাজ করেছে, এবং ভারতের এলিটরা সুবিধের

খোঁজে ওসবে সাড়া দিয়েছেন প্রাণপণ। যে কারনে ওদের ইতিহাস যে জাতীয়তাবাদের কথা বলে, তা মূলত একটা লার্নিং প্রসেস: অর্থাৎ ব্রিটিশদের গড়া প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে, ব্রিটিশ পলিসিতে দীক্ষিত হয়ে ,ব্রিটিশ জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়ে, ভারতীয় এলিটরা রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিদ্যমানকে বদলানোর আকুতি এবং জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। অতএব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব কোনো মহৎ চিন্তার পরিণতি নয়: এর প্রধান আকর্ষণ ক্ষমতা, সম্পদ ও সম্মানের লোভ, ঔপনিবেশিক কৃপা এর অন্তর্মূলে, দেশ শাসনের অভিলাষ এর আরাধ্য। অভিজাততন্ত্রী ইতিহাসের আরেকটা ধরন হলো, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কেবলমাত্র কতিপয় স্বদেশী এলিটের প্রবর্তনা হিসেবে দেখানো। স্বদেশী এলিটরা স্বজাতির স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সেই বক্তব্যে তারা সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং সেই প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কাজেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নেটিভ এলিটদের মহৎ আদর্শ ও শুভ কামনার ফল। রণজিৎ গুহের মতে, এভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস হয়ে উঠলো ভারতীয় এলিটদের আধ্যাত্মিক চরিতকথা।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা অবশ্য মনে করেন না যে, উপরোক্ত ইতিহাস প্রকল্পের কোনো উপযোগ নেই। অভিজাতপন্থী ইতিহাস থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসংগঠন বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কলাপ্রকরণ বোধগম্য হয়, সে সময়ের উচ্চবর্গীয় মতাদর্শের চরিত্রও ওখান থেকে উঠে আসে: ঔপনিবেশিক এলিট এবং ভারতীয় এলিটদের সম্পর্ক ও সংঘাতের খতিয়ানও তা থেকে পাওয়া যায়। উপরন্তু হিস্টিওগ্রাফিক মতাদর্শের চরিত্রও এ ইতিহাস থেকে আমাদের বড়ো প্রাপ্তি।

কথা হলো, এই ইতিহাস-আখ্যানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব বিকাশের সার্বিক বিবরণ নেই, কারণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে আমজনতার অংশগ্রহণ এবং নিম্নবর্গের ভূমিকা বিষয়ে এই আখ্যান সম্পূর্ণ নীরব।

এই ইতিহাস-আখ্যানে 'পলিটিক্স অফ দি পিপল' বা জনতার রাজনীতির বিবরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আছে বিশেষ ধরনের শ্রেণীগত প্রত্যয়। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ এলিট এবং সহযোগী স্বদেশী এলিটের বাইরে বিপুল সাবঅলটার্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছে : এই জনগোষ্ঠীর রাজনীতিই জনতার রাজনীতি। এই জনতা বা নিম্নবর্গ ছিলো স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন, এদের ওপর কারো কর্তৃত্ব বা খবরদারি ছিলো না, এলিট-নেতৃত্বের ওপর এদের কার্যধারা বা সক্রিয়তা নির্ভর করেনি। এলিটদের রাজনৈতিক কার্যক্রম যদি আড়াআড়ি(ভার্টিকাল) হয়, এদের সক্রিয়তা ছিলো খাড়াখাড়ি (হরাইজন্টাল)। এলিটরা অনুসরণ করেছে ব্রিটিশদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ছক, অভ্যেস ও অনুশাসন: আর নিম্নবর্গ চালিত হয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্কে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কম্যুনিটির তাগিদে, সহমর্মী অনুপ্রেরণায়। এলিটদের রাজনীতি সংবিধান ও শাসনতান্ত্রিক: আর নিম্নবর্গের সক্রিয়তা রূপ নিয়েছে সন্ত্রাসে নৈরাজ্য এবং নিয়মবিরোধিতায়। এলিটদের রাজনীতি পরিকল্পিত, সুবিবেচিত, নিয়ন্ত্রিত: সাবঅলটার্ন রাজনীতি অবিবেচিত, স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দাম। নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র, গুরুত্ব ও প্রবর্তনা ভালো করে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ভারতের ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের দিকে তাকালে। বলা

বাহুল্য সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা কৃষকবিদ্রোহকে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন: কেউ কেউ স্বতন্ত্র বইও লিখেছেন, যেমন দীপেশ চক্রবর্তী, রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়

নিম্নবর্গীয় রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য এলিট কর্তৃত্বের প্রতিরোধ; তবে নিম্নবর্গের নিজের নিয়মেই এই চেতনা সুসংগঠিত হতে পারেনি। নিম্নবর্গের মানুষেরা এলিটদের কাছে বিভিন্নভাবে প্রতারিত প্রবঞ্চিত লুণ্ঠিত হয়েছে, তাদের রাজনীতিতেও তাই বঞ্চনা ও লুণ্ঠনের অভিজ্ঞতা একটা বড়ো উপাদান। বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নবর্গের রাজনীতির ইতিহাসে তৈরি হয়েছে বহুধরনের স্বতন্ত্র বাক-রীতি ও বাগবিধি, বিভিন্ন শব্দ ,পরিভাষা।[৯] নিম্নবর্গ একটা আলাদা রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়; গৌতম ভদ্র "ইমান ও নিশান" (কলকাতা, ১৯৯৪) বইতে সেই সংস্কৃতির অসামান্য আখ্যান রচনা করেছেন। এই সংস্কৃতি এলিট রাজনীতির অভিজ্ঞতার ভেতর নেই। তবে মনে রাখা দরকার, সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন, ভাষার ছকের ভেতর নিম্নবর্গের মানুষের সক্রিয়তা , অভিজ্ঞতা ও বিবরণ তুলে ধরা কঠিন, ভাষার ছকে ধরতে গেলে তার অপরিচিত মহত্ত্ব নষ্ট হতে পারে।একথা সত্য যে, নিম্নবর্গের রাজনীতি এতোটা লক্ষ্যমুখী ছিলোনা যে তা থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রূপ নিতে পারে। নিম্নবর্গের একটা অংশ যদি শ্রমিক শ্রেণীকে ধরি, দেখা যাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী নিজের সামাজিক সত্তা এবং শ্রেণীগত অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন ছিলোনা, ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মিশনও সফল হতে পারেনি। যার কারণে নিম্নবর্গীয় চাষীজনতা ও কর্মজীবীশ্রেণীর বহুরকম বিদ্রোহ, আন্দোলন ও অভ্যুত্থান যথানেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক এই জায়গায় এসে রণজিৎ গুহ একটা ঐতিহাসিক বাক্য বলেন, তা হলো: ঔপনিশেবিক ভারতের এই এক দুঃখজনক ব্যর্থতা যে, একটা জাতি সম্পূর্ণভাবে নিজের জাতি হয়ে উঠতে পারেনি (হিস্ট্রিকাল ফেলিউর অফ এ নেশন টু কাম টু ইটস ওন)। যে কারণেই এই ব্যর্থতা হোক না কেন (হতে পারে বুর্জোয়াদের ব্যর্থতা কিংবা শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতা কিংবা বিপ্লবাত্মক কর্মসংগঠনের অনুপস্থিতি)এ এক প্রচণ্ড ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার ভেতর রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসপ্রকল্পের সংকট। কোনো একটি মাত্র প্রক্রিয়ায় এই সংকট বোঝা যাবেনা। সেজন্যে রণজিৎ গুহ বলেছেন, যদিও সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা এই সংকট বুঝবার উদ্যোগ নিয়েছে, তারপরও এক্ষেত্রে এরাই একমাত্র নন। পাশাপাশি আরো অনেক বিক্ষিপ্ত প্রয়াস রয়ে গেছে এবং রয়ে যাবে। সেই প্রয়াসগুলোও এই প্রয়াসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে, এবং অভিঘাতের দিক থেকে সকল উদ্যোগ একবিন্দুতে একত্রিত হতে পারে।

৩.

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের ইতিহাসরচনা ও ইতিহাসব্যাখ্যা ভারতের কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিকের পছন্দ হয়নি। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'সোশ্যাল' স্যায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় (ভল্যুম ১২ সংখ্যা ১০: অক্টোবর ১৯৮৪) এঁদের প্রকল্পের বিরুদ্ধে কড়াসমালোচনা

ছাপা হয়। মূল বক্তব্য [10] অনেকটা এই রকম:

১. সাবঅলটার্ন বিশ্লেষকের মধ্যে পরিণত মার্কসিস্ট ... হয়ে গেছেন, এবং ... এই ভবনে রণজিৎ গুহের লেখায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে (যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার ভেতর বৃহত্তর বিদ্রোহ, প্রতিরোধ, মুক্তির আকৃতি লক্ষ করেন)।
২. সাবঅলটার্ন বিশ্লেষকেরা সরলীকরণ করেন অনেক কিছুর; তাদের ব্যাখ্যা ও অসংহত, তারা পৃথিবীকে ভাগ করেন দুটো সরল রেখায়; যার একদিকে এলিট অন্যদিকে সাবঅলটার্ন নিম্নবর্গকে তারা গুলিয়ে ফেলেন অনেকখানি, নিম্নবর্গ হয়ে উঠেছে বিমূর্ত; কিন্তু সমাজের এ দুটো স্তর—এলিট ও সাবঅলটার্ন কিভাবে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে যুক্ত, এদের লেখা থেকে তা উদ্ধার করা মুশকিল
৩. নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে চান এরা, কিন্তু সেই ইতিহাসের ফাঁকগুলো তারা ভরাতে পারেন নি ইতিহাস লিখতে গিয়ে এরা রচনা করেন 'পুরাণ'; যেমন শ্রেণী বাস্তবতাকে 'জনগণ' শব্দ দিয়ে মিস্টিফাই করেন গৌতম ভদ্র গৌতম ভদ্রের 'পিপল' শব্দটি নন-ক্লাস- ক্যাটেগরিতে পর্যবসিত; এই বিমূর্ততা ও অবিন্যাস সাবঅলটার্ন ইতিহাসের পদ্ধতিগত ত্রুটি।
৪. সাবঅলটার্ন স্টাডিজ মার্কসবাদী নয়; মার্কসীয় শ্রেণীব্যাখ্যা এরা অনুসরণ করেন না একদিকে তাঁরা শ্রেণী-বিশ্লেষণ অগ্রাহ্য করেন; অন্যদিকে নিম্নবর্গের কার্যধারায় প্রয়োজনের অধিক গুরুত্বারোপ, তৈরি করেছে, একমাত্রিক উদ্দেশ্যবাদ যেমন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের লেখা; উত্তর ভারতের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ সাবঅলটার্ন ইতিহাস-লেখকেরা উপনিবেশবাদের কার্য ও কারণের সূত্রে ভারত ইতিহাসের দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক কলহ, সংঘাত ও স্ববিরোধকে বুঝতে চাননি। উপনিবেশের 'কনটেকস্ট' থেকে বিচ্যুত করে ভারতের দাঙ্গা-কলহ বোঝা যাবে না
৫. মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ হলো, চেতনার আগে সামাজিক অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ ব্যক্তির চেতনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সামাজিক অস্তিত্ব ও অবস্থান কিন্তু সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা চেতনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী, গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেছেন অথচ 'চেতনা' সব সময়েই অবজেকটিভ ঐতিহাসিক শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট।

মোটামুটি এই হলো সাবঅলটার্ন স্টাডিজের বিরোধিতার ছক ও সূত্র। এই বিরোধিতার মূলে রয়েছে একমাত্রিক মার্কসবাদ[11] আধুনিক কালে মার্কসবাদের বহুরকম পাঠ দেখা দিয়েছে, সেদিক থেকে সাবঅলটার্ন স্টাডিজও মার্কসবাদী। মার্কসের নিজের চিন্তা প্রক্রিয়াতেও অনেক টেনশন রয়ে গেছে, সেইগুলোতে নজর দেওয়া দরকার, অন্তত সেগুলোকে এড়ানো মূঢ়তা মার্কসের পাঠভেদ তার অর্থভেদকে অনিবার্য করে তোলে আজকের দিনে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যার বহুত্বের এক উন্মুক্ত পরিসর ভাবা হয়, এই প্রতিজ্ঞা নব্যমার্কসবাদের। নব্য মার্কসবাদীরাও মার্কসবাদের মূল অঙ্গীকারে বিশ্বাসী, সেকারণে নব্যমার্কসবাদ সকলরকম অসাম্য ও বিষমতার বিপক্ষে : হোক তা লিঙ্গের, শ্রেণীর, কিংবা জাতির। এই অঙ্গীকারের কারণেই নব্যমার্কসবাদ বুর্জোয়া-লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ 'মুক্ত মার্কসবাদে'র কথাই বলেছে

ভারতের ইতিহাস যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে 'অর্থনীতিবাদ' ভূতের মতো চেপে বসেছিলো তারা গুরুত্ব দিয়েছেন কেবল অর্থনৈতিক প্রান্তে, দীপেশ চক্রবর্তী যাকে নাম দেন 'ইকোনমিজম' ভারতের দারিদ্র্য নয়, ভারতের দারিদ্র্য তাদের আচ্ছন্ন করেছে, এই দারিদ্র্যকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন তারা, একে ব্রিটিশ শাসনের ফল বলে তারা দায়িত্ব শেষ করেন বলেন, অর্থনৈতিক 'এক্সপ্লয়টেশন' উপনিবেশের লক্ষ্য ছিলো বলে ভারতের দুরবস্থা ঘটেছে উপনিবেশবাদের আর্থতাত্ত্বিক অধিবিচারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই ইতিহাসধারার প্রতিভূ জওহরলাল নেহেরু নেহেরু জাতীয়তাবাদী-মার্কসিস্ট ইতিহাসধারার প্রভাবশালী জনয়িতা। নেহেরু ইতিহাস লেখেন তিরিশের দশকে, কিন্তু তার প্রভাব সত্তর দশকেও প্রবল ছিলো। জনপ্রিয় মুভমেন্টসমূহের বিবরণে সত্তরের ঐতিহাসিকেরা অক্লান্ত। ইতিহাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যুক্তিবাদের অভ্যুদয় ও বিস্তার, সত্তর দশকের ইতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঐতিহাসিকেরা কায়দা করে বলেন; ভারতের গণ-অসন্তোষ, বিষয়ের দিক থেকে অর্থনৈতিক, আর ফর্মের দিক থেকে ধর্মীয়; গণ অসন্তোষের কারণ হিসেবে দেখান ম্যানিপুলেশন বা প্ররোচনা, যে-প্ররোচনা ঔপনিবেশিক, এবং স্থানীয় এলিটের সৃষ্টি। দাঙ্গা-কলহও ওই প্ররোচনার ফল

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা একটা কথা ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, ইতিহাসরচনা বা ইতিহাসব্যাখ্যায় একরৈখিকতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে : কিন্তু একে ঔপনিবেশিকায়ন বা কেবলমাত্র এলিট-প্ররোচনা বলা একদেশদর্শিতা। 'দাঙ্গা' কোনো একটিমাত্র কারণে হয় না, কোনো একটিমাত্র সূত্রে তা ব্যাখ্যাও করা যায় না। যেমন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কেবল ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গ দিয়ে 'মুবারকপুরের দাঙ্গা' বোঝা যায় না ভারতীয় ইতিহাসের সকলপর্বে, ঘটনায় ও কার্যক্রমে, উপনিবেশের প্রসঙ্গ খোঁজা, 'উপনিবেশ' নামক চাবিশব্দে সবকিছু ব্যাখ্যা করা, অতঃপর সনাতন মার্কসীয় উপরকাঠামো/ভেতরকাঠামোর রূপকে ফিরে গিয়ে সমস্ত উপাত্ত সংশোধন করা, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্বের মর্মবাণী এই প্রবণতা কি রক্ষণশীল নয়? একে কি ভাবালু বা মরমী মনে হয় না? সবকিছুর নিদান মার্কসবাদে সন্ধান, এবং সবকিছুর কারণ হিশেবে উপনিবেশবাদকে দেখানো কতদূর সংগত?

নিম্নবর্গের রাজনীতি নিজস্ব, তার সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের ইতিহাসে রাজনৈতিক সক্রিয়তার এক স্বাধীন রূপকল্প পাওয়া যায়। তাই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের অ-প্ররোচিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত চেতনাকে স্থান দেওয়া আজকের প্রধান কর্তব্য : এই মনোভঙ্গির কোনো কোনো সূত্র কারো কারো লেখায় ইতিপূর্বে থাকলেও, সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা যেভাবে তা একক আধারে বিন্যাস করেছেন, অন্য কোনো নজির চোখে পড়েনা।

রণজিৎ গুহ তার "এলিমেন্টারি আসপেকটস অফ পেজেন্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া" বইতেই দেখানোর চেষ্টা করেন যে, নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক সংকেতের (কে ভস অফ পলিটিক্স) জন্ম হয়েছে উপনিবেশের ঢের আগে সাবঅলটার্ন বিশেষজ্ঞদের লেখায় নিম্নবর্গের যে ইতিহাস উন্মোচিত, তা প্রচ্ছন্নভাবে একটি কথাই আমাদের জানিয়ে দেয়, তাহলো, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সক্রিয়তা কেবল উপনিবেশবাদের

প্রতিক্রিয়াপ্রসূত নয়। এই সক্রিয়তা তাদের মধ্যে এসেছে এক ধরনের আদর্শবাদ থেকে, ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রভাব থেকে। বহু আগে এই চেতনার উন্মেষ, তখন ভারতবর্ষে 'নাগরিকতা' নামক বিশেষ ধারণাটির আমদানি ঘটেনি, 'কলোনি'ও গড়ে ওঠেনি। হ্যাঁ উপনিবেশের ফলে এই চেতনা আক্রান্ত ও তীব্রতর হয়েছে বটে, কিন্তু এই চেতনা এবং তার অভিজ্ঞতাকে উপনিবেশ প্রসঙ্গের (কলোনিয়াল কনটেক্স্ট) ব্যানারে হ্রস্ব করা অনুচিত। এই সংকোচনকেই উত্তরাধুনিকেরা 'অভিজ্ঞতার সংকোচন' বলে থাকেন। এই হলো আয়ত অভিজ্ঞতার বিরোধিতা, অনায়ত অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। ভারতবর্ষের প্রধান বাস্তবতা 'ধর্ম', বিশেষ ধরনের বিশ্বাস-ব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের 'কম্যুনিটি'; এই অভিজ্ঞতাগুলোকে আয়ত ব্যাখ্যার ছকে না এনে, এর অনায়ত স্তরের চৈতন্যকে বোধের আওতাভুক্ত করা দরকার। উপনিবেশের ইতিহাস-পদ্ধতি আমাদের সকল অভিজ্ঞতাকে দু-তিনটি ছকে বুঝে ফেলতে চায়, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ দেখিয়েছে সেটা অসম্ভব।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ ভারতীয় সমাজকে 'এলিট' এবং 'সাবঅলটার্ন' (নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গ) এই দুই সরল ভাগে ভাগ করে নিয়েছে, একথাও সত্য নয়। নিম্নবর্গের ইতিহাসজিজ্ঞাসুরা বরং বুঝবার চেষ্টা করেছেন, একটি সমাজে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং অধস্তনতা যুগপৎ চলতে থাকে। তারা ভাবতে চেয়েছেন নিম্নবর্গের রাজনীতি কি? তাদের সক্রিয়তা কেমন? তাদের রাজনীতির ভাষা এবং রাজনীতির সংস্কৃতি কি? নিম্নবর্গের সক্রিয়তা কেন এবং কোন অর্থে সমকালীন এলিট রাজনীতির বাইরে আলাদা বৃত্ত রচনা করে? নিম্নবর্গ জানতোনা 'নাগরিক' কে, 'নাগরিকতা' কি—সাবঅলটার্ন স্টাডিজ নিম্নবর্গের নাগরিকতাচ্যুত রাজনীতির ইতিহাস তুলে এনেছে।

'ইতিহাস' বলতে কেবল বড়ো বড়ো ঘটনা বোঝা, ইতিহাসের অভিজাততন্ত্র তৈরি করে। সাবঅলর্টান স্টাডিজ অভিজাত ইতিহাসতন্ত্রের বিপরীত; তার দৃষ্টিপাতকেন্দ্র: নিম্নবর্গ। ইতিহাসে যাদেরকে বিষয়ই মনে করা হয়নি, স্টাডিজ তাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। স্টাডিজের পঞ্চম ভাগে রণজিৎ গুহের একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ আছে— 'চন্দ্রের মৃত্যু', রণজিৎ গুহ পঞ্চানন মন্ডল-সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সংবাদচিত্র' বইয়ের একটি ছোট্টো প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এটি লিখেছেন। এটি ১৮৪৯ সালের একটি ঘটনা, ব্যাপারটা এইরকম :

> 'চন্দ্র বীরভূমের এক গরিব চাষীপরিবারের মেয়ে। ভগবতী চাষানী তার মা। চন্দ্রের সঙ্গে মগরাম [illegible] সমাজ নিষিদ্ধ শারীরিক সম্পর্ক [illegible] গর্ভবতী [illegible] [illegible] সম্পন্ন হয়।'
>
> [চিঠিপত্রে সংবাদচিত্র, পঞ্চানন মন্ডল-সম্পাদিত, ভল্যুম ২, কলকাতা ১৯৫৩, পৃ ২৭৭-২৭৮]

ছোট্টো সংক্ষিপ্ত সাধারণ ঘটনা : এই ঘটনার কতটুকু স্থান থাকতে পারে ইতিহাসে? কিন্তু না, এই ঘটনা ছোট্টো নয়, সংক্ষিপ্ত হলেও সাধারণ নয়, মনুষ্য জীবনের কোনো ঘটনাই তুচ্ছ নয়; উনবিংশ শতাব্দীর বীরভূমের এক গরীব চাষী পরিবারের এই ঘটনাকে অসাধারণভাবে পাঠ করেছেন রণজিৎ গুহ, তাকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, জীবনের এক আপাত তাৎপর্যহীন আখ্যানকে তিনি অসামান্য সংকেত ও ব্যঞ্জনায় পুনর্বিচার করেছেন।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেও আকর্ষণীয়। কেউ কাজ করেছেন কৃষক বিদ্রোহের ওপর, কেউ একেকটা অঞ্চলকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কেউ বিচার করেছেন ধর্ম, কেউ সংস্কৃতি, কেউ আঞ্চলিকতাবাদ, কেউ মহামারি, মন্বন্তর, দাঙ্গা, কেউ বিচারব্যবস্থা; কেউ সন্ধান করেছেন সাবঅলটার্ন লেনিন; কেউ দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রুশের বিজয় ভারত, বিজয়ে পরিণত হলো, কিভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের ভাষা শিখে অতঃপর ভারত-শাসনের ভাষা তৈরী করলো; কেউ দেখিয়েছেন গান্ধীর প্রভাবমুক্ত মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তা; কেউ ব্যাখ্যা করেছেন জিতু সাঁওতালের বিদ্রোহের স্থানিক শেকড়; কেউ বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে আইনের ডিসকোর্স একটা ঘটনাকে 'কেস' এবং একটা 'মৃত্যু'কে 'ক্রাইম' বলে তার সমস্ত মাত্রা হ্রস্ব করে দেয়; ভারতের মহামারী (১৮৯৬-১৯০০) বিশ্লেষণ করে একজন ডেভিড আর্নল্ড দেখান, কিভাবে নাটকীয় সংঘাতের মুখোমুখি হলো ঔপনিবেশিক ভারতের মানব-শরীর, কিভাবে তা দেশজ রাজনীতি এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত হলো; আরেকটি লেখায় তিনি দেখান মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে কৃষক চৈতন্যের কি রকম বদল ঘটলো, কিভাবে দুর্ভিক্ষ তাদেরকে অক্রিয়, হতাশ, আশাভরসাহীন করে তুললো; দীপেশ চক্রবর্তী[১৩] ব্যাখ্যা করেন কলকাতার পাটকল শ্রমিকদের রাজনীতিকে কেন কেবলমাত্র মার্কসীয় শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়; জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে আজমগড়ের একজন মুসলিম জমিদারের উর্দু পাণ্ডুলিপির অনুসরণে ভারতের একটা 'কসবা'র অ-সরকারী সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ছবি তুলে আনেন; গায়ত্রী চক্রবর্তী নিম্নবর্গের সাহিত্যিক শিল্পরূপ হিশেবে মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তন্যদায়িনী' গল্পটিকে অন্যভাবে পাঠ করে শোনান।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' ইতিহাসকে মনে করে আলাপের একটা পরিসর; ইতিহাস তাদের দৃষ্টিতে ফতোয়া নয়, ডিসকোর্স; ম্যাক্রোলেবেল থেকে মাইক্রো-লেভেল-এ,[১৪] আয়ত-অভিজ্ঞতার বদলে অভিজ্ঞতার অনায়ত ভূগোলের ভাষ্য। সাবঅলর্টান স্টাডিজ 'ডায়ালেকটিক' থেকে 'ডায়ালজি'তে সরে আসার বাঙ্ময় ডিসকোর্স রচনা করেছে।

---

১. Denys Hay. Annalists and Historians. Western Historiography from the Eight to the Eighteenth Centuries. London. 1977. p. 1.

২. Peter Burke. The French Historical Revolution. The Annales School 1929-1989. Polity Press : Cambridge. 1990. P. 6-8.

৩. P. Ricoeur. The Contribution of French Historiography to the Theory of History. Oxford. 1980. P. 40-41.

৪. Barry Smart. Foucault. Marxism and Critique. Routledge :

New York. 1989. P. 80.

৫. Hannah Arendt. Between Past and Present (New York : Viking Press. 1961) p. 7.

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' [বঙ্গদর্শন : মাঘ ১২৮১]; 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' [বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ ১২৮৭]; 'বাঙ্গালির বাহুবল' [বঙ্গদর্শন : শ্রাবণ ১২৮১]; 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' [বঙ্গদর্শন : জৈষ্ঠ ১২৮৯]

৭. Ranajit Guha (ed.). Subaltern Studies IV. Preface Vii. Oxford University Press : Delhi. 1985.

৮. Ranajit Guha (ed.). Subaltern Studies I : On Some Aspects of the Historiography of Colonial India. Oxford University Press : 1982. p. 1-7.

৯. গৌতম ভদ্র, "ইমান ও নিশান", 'বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধানে', পৃ. ৩২৬-৩৯৫

১০. Dipesh Chakrabarty. Invitation to a Dialogue. in Subaltern Studies IV. P. 369.

১১. Dipesh Chakrabarty. Ibid. p. 375.

১২. Ranajit Guha. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi. 1983

১৩. বাংলার কর্মজীবী-শ্রেণীর ওপর দীপেশ চক্রবর্তীর আলাদা বই আছে: Rethinking Working Class History. Bengal 1890-1940. Princeton University Press. 1989

১৪. উত্তরাধুনিকেরা সম্প্রতি 'Microhistory'-র কথা তুলেছেন; এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : Carlo Ginzburg. Microhistory : Two or three Things that I Know about it. in 'Critical Inquiry'. Autumn 1993 Chicago.

নারীবাদ জেন্ডার ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক

আধুনিকতার আত্মব্যাখ্যায় দেখা যায় তার কোনো অখন্ড রূপ নেই, অথচ আকাঙক্ষা আছে; যদিও ওই আকাঙক্ষা তৈরি করতে পারে সহিংস সমগ্রতাবাদ, উৎপীড়ক রাষ্ট্র, আত্মকেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাস। আধুনিকতার সাংস্কৃতিক উদ্যম ওই আত্মবিশ্বাসকে খুব গুরুত্ব দেয়, এবং তার ফলেই 'স্বাধীনতা' 'মুক্তি' এই কথাগুলো আলাদা জোর পায়। কিন্তু এই কথাগুলোর প্রথমে যে সরলরূপ ছিলো, কালক্রমে তার বদল হয়, এবং ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। একটা সময়ে দেখা গেলো একই যুক্তিতে কোনো কিছুর গ্রহণ অথবা বর্জন একইসঙ্গে সম্ভবপর। এই পরিস্থিতি আধুনিকতারই সৃষ্টি, এবং এটা আধুনিকতার পরিণত অর্জনের পর্যায়ে পড়ে, এবং এ হলো সেই মুহূর্ত যখন বিম্ব আর প্রতিবিম্বের ভেতর কোনো তফাত নেই, আরম্ভ আর উপসংহার অভিন্ন, যাকে আলিঙ্গন করা যায় তার নাকচও সম্ভব। আজকের দিনের সমালোচক ও তাত্ত্বিকেরা একে আধুনিকতার 'রিফ্লেকসিভ মোমেন্ট' বা প্রতিবর্তী মুহূর্ত বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রিফ্লেকসিভিটির এই সমস্যা কেন কিংবা কিভাবে তৈরি হলো, তার নিশ্চিত একটা গল্প আছে; সেই গল্প জানা গেলে উত্তরপ্রস্থানবাদী উৎক্ষেপ ও তার নকশার সবরকম কারুকাজের একটা আন্দাজ মিলবে।

আসলে ইউরোপ-আমেরিকায় পোষ্টস্ট্রাকচারালিজম বা পোস্টমডার্নিজম কিংবা তার শাখা-প্রশাখা নিছক খামখেয়ালের শস্য নয়। ইউরোপ বহুকাল ধরে কেবল নিজেকে নিয়েই ভেবেছে, আধুনিকতা স্বাধীনতা প্রগতি মুক্তি ইতিহাস এসবকেও সে নিজস্ব সম্পদ মনে করেছে। কিন্তু পুঁজির সঞ্চয়ন ও সমৃদ্ধির গরজে সে হানা দেয় সমুদ্রের এপার থেকে ওপারে; বিপুল সম্পদের ওপর ইউরোপ গড়ে তোলে তার আধুনিক সাম্রাজ্য। কিন্তু সাধের সাম্রাজ্য তৈরি হলেও সময়ের ব্যবধানে তাতে ভাঙন ধরে, এবং জীবনানন্দের ভাষায়, 'বাণিজ্যবায়ুর গল্প' একদিন শেষ হয়। উপনিবেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে বৈভবে স্ফীত তৃপ্ত আধুনিক ইউরোপ এবার যুদ্ধ বাঁধালো নিজেদের মধ্যে, সেই যুদ্ধ ছড়িয়ে গেলো পৃথিবীর সর্বত্র। যুদ্ধ নতুন নয় পৃথিবীতে, কিন্তু এই যুদ্ধ আলাদা। এ হলো আধুনিক মানুষ আধুনিক পৃথিবী আধুনিক ইউরোপের যুদ্ধ। বহুপ্রচারিত রেনেসাঁস, বিশাল এনলাইটেনমেন্ট, আকাশকুসুম প্রগতি, জগতশ্রেষ্ঠ মানবিকবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা বিজ্ঞানও প্রয়োগবিজ্ঞানের পটভূমিকায় এই আধুনিক যুদ্ধ সংঘটিত। মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ সংঘাত রক্তপাতের সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলেনা। উপরন্তু একবার নয়, দু-দুবার এই মহাযুদ্ধ করেছে আধুনিক মানুষেরা।

তবে আধুনিকতার অর্জন ও প্রগতির প্রকান্ড পরিব্যাপ্তি বুঝে নেয়ার জন্যে দুই মহাযুদ্ধ বেশ দরকারী ছিলো। আধুনিকতার পরিসরে আধুনিকতার অন্তর্বিরোধ, যুক্তিবিশ্বাস ও ইতিহাসপথের দ্বন্দ্ব; যুদ্ধ ছাড়া স্বচ্ছ হতে পারতোনা। আধুনিক ইউরোপের যুদ্ধোত্তর

সংকট যুক্তিকাঠামোর সংকট: দেখা গেলো 'কাঠামো' নামক অপরূপ তুলাদণ্ডে সবকিছুর বিচার অসম্পূর্ণ খণ্ডিত তো বটেই, আত্মনেশেও। এই পটভূমি চোখের সামনে থাকলে এইটেও বোঝা যায়, কেন স্ট্রাকচারালিজমের পর পোষ্টস্ট্রাকচারালিজম আসে, মডার্নিজমের পর কেনই-বা দেখা দেয় পোস্টমডার্নিজমের মতো ঘটনা। স্ট্রাকচারের সঙ্গে কলহের দু-ক্ষেত্রেই একই পরিণতি। নারীবাদও, প্রাক্তন ও আবহমান 'মেল ডিসকোর্স' থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস: অর্থাৎ জেন্ডার ও আইডিওলজি বা লৈঙ্গিক মতাদর্শের স্ট্রাকচার ভেঙে দেওয়া, এবং সেই স্ট্রাকচারের সংস্কৃতি অস্বীকার করা। নারীবাদ বা ফেমিনিজমকে যদি পোস্ট্রস্ট্রাকচারালিজমের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি, দেখবো আটলান্টিকের দুই পারে তার রূপ এক নয়, কেননা পটভূমি, অর্থাৎ রাজনৈতিক যুক্তিও, এক নয়। অন্যদিকে 'নারীবাদ' আধুনিকায়নের অন্য অনেক কিছুর মতো গ্লোবাল এক ঘটনা: সমাজভেদে তার প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন।

সবমিলিয়ে 'নারীবাদ' বিরাট এক ব্যাপার, কিন্তু আমি আলো ফেলতে চাই তার বিশেষ একটা প্রান্তে। নারীবাদের যে 'সমালোচনাতত্ত্ব' গড়ে উঠেছে গত কয়েক দশকে, তার চেহারা; এবং নারীদের সঙ্গে উত্তরগ্রন্থনবাদী সৃষ্টিকার্যের অবাধ মেলামেশার রাজনীতি, ঠিকমতো যাচাই হওয়া দরকার। বলাবাহুল্য, আমার ভাষ্য হবে খুবই প্রাথমিক, এবং তা সুধী-রসজ্ঞের জন্যে, বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়।

'নারীবাদী সমালোচনা' বিশেষ কোনো ডিসিপ্লিন নয়, এমনও নয় যে সংঘবদ্ধ চর্চা বা গবেষণার ফলে এটা সংহত একটা 'ডিসিপ্লিন' হিশেবে গড়ে উঠেছে। নারীবাদী সমালোচনার উৎস নারীদের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনীতি। পুরুষের প্রবল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নারীর আত্মআবিষ্কারের যে সাধনা ও সংগ্রাম, এবং স্বাধীন মানুষরূপে নিজের 'সংজ্ঞা' নির্ধারণের যে আকুতি, তার ভেতর থেকে জন্মেছে নারীবাদ ও নারীবাদী সমালোচনা। নারীবাদী সমালোচনা কোনো সুসংহত ডিসকোর্স নয়; এর কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই: পুরুষতন্ত্র ও পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজ ও সিস্টেমের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ এর মূল উপাদান ও অনুপ্রেরণা। বিদ্যমান ডিসকোর্স ও আবহমান ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে নারীরা নিজের অবস্থান, স্বরূপ ও আইডেনটিটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে। এই অনুসন্ধান মুলত দু'ধরনের (এক) নারী এবং পুরুষের প্রত্যক্ষ সামাজিক বৈষম্য অধিকার বৈষম্য ক্ষমতার বৈষম্য; (দুই) প্রতিরূপণ ব্যবস্থায় (সিস্টেমস অফ রিপ্রেজেন্টেশন: যেমন নাটক, উপন্যাস, কথকতা, চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি) নারীর ইমেজ ও ভাবমূর্তি। এই দুই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তাদের সমালোচনা-তত্ত্বের জন্ম।

নারীবাদী সমালোচনার সঙ্গে অনেকধরনের তত্ত্ব, চিন্তা, বিশ্লেষণ এসে মিলেছে বটে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বোধ করি 'জেন্ডারে'র প্রতি গুরুত্বারোপ ইংরেজিতে 'সেক্স' ও 'জেন্ডার' এই দুটি শব্দ আছে, বাংলায় 'লিঙ্গ' দুটোকেই নির্দেশ করে: যদিও 'সেক্স' ও 'জেন্ডার' সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। 'সেক্স' সেই লিঙ্গ, যা জৈব: এই লিঙ্গ নারীর আছে, পুরুষের আছে, এবং এই লিঙ্গ শারীরিক। কিন্তু আরেকটি 'লিঙ্গ' আছে যা শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গ নয়, যা জৈব নয়, সেই লিঙ্গটির নাম 'জেন্ডার', এই লিঙ্গটি

সামাজিক, অর্থাৎ সমাজসৃষ্ট, কিংবা বলা যায় সমাজের মতাদর্শসৃষ্ট। সামাজিক মতাদর্শ 'জেন্ডার' লিঙ্গের জনয়িতা। কাজেই যখন বলবো 'নারী' কিংবা যখন বলবো 'পুরুষ', তখন জৈবলিঙ্গ নির্দেশ করাই উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন বলি 'মেয়েলি' কিংবা 'পুরুষালি'— তখন? তখন আসলে মনোলৈঙ্গিক নির্দেশ ও বিভাজনটাই মুখ্য। মানবসমাজের মতাদর্শ এই মনোলৈঙ্গিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে এবং আরোপ করেছে। নারী-পুরুষের জৈবলিঙ্গের ভিন্নতা প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু সেই ভিন্নতা থেকে 'জেন্ডারের' ভিন্নতা দেখা দেয়না। জৈবলিঙ্গের ভিন্নতার অর্থ এই নয় যে, নারীর লিঙ্গ ত্রুটিযুক্ত, এবং পুরুষের লিঙ্গ উৎকৃষ্ট; ফ্রয়েড লিঙ্গের উৎকর্ষ-অপকর্ষের একটা কুসংস্কার ছড়ান, কিন্তু তার ন্যূনতম বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু জেন্ডার বা মনোলিঙ্গ বা মতাদর্শলিঙ্গের ভিন্নতা পুরুষসমাজের কৌশল; নারীকে দমিত ও অবনত রাখার রাজনীতিই 'জেন্ডার পলিটিক্স'। সেজন্যে 'মেয়েলি' বললে আমরা বুঝি যা খারাপ, দুর্বল, অক্রিয়; আর 'পুরুষালি' বললে বুঝি যা বীরত্বপূর্ণ, উন্নত, অসাধারণ। এইভাবে যে মতাদর্শ তৈরি হলো, তাকে নারীবাদীরা নাম দেন প্যাট্রিয়ার্কি অর্থাৎ পিতৃতন্ত্র, অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র।

নারীবাদী সমালোচনাতত্ত্ব একপথে চলেনি, সেকথা আগে বলেছি। তবে নারীবাদী বিশ্লেষণের ঐক্য আছে একজায়গায়, তা হলো: পুরুষশাসিত সমাজে নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নারীবাদী সমালোচনার জীবনীশক্তি স্বভাবতই খুব বেশি। নারীবাদী সমালোচনার দুটো প্রধান ধারা কেউ কেউ নির্দেশ করেন: (এক) ফরাশি নারীবাদ (দুই) ইঙ্গ মার্কিন নারীবাদ। মোটের ওপর এই বিভাজন স্থূল হলেও একেবারে অবান্তর নয়। ফরাশি নারীবাদের ধারা ফ্রয়েড লাঁকার ওপর ভর করেছে বেশি, আর পদ্ধতি হিশেবে অনুসরণ করেছে দেরিদার বিনির্মাণতত্ত্ব। ফরাশি নারীবাদে তাই গুরুত্ব পেয়েছে ডিসকোর্স, সাবজেকটিভিটি ও প্রতিরূপণ বা রিপ্রেজেন্টেশন। বিপরীতে ইঙ্গ-মার্কিন নারীবাদ ইতিহাসআশ্রয়ী: সেই ইতিহাস যেমন মানুষের, তেমনি সাহিত্যেরও। স্থূল সিদ্ধান্ত হিশেবে এ-ও বলা যায় : ফরাশি নারীবাদ টেক্স্টকেন্দ্রিক, আর ইঙ্গ-মার্কিন নারীবাদ টেক্স্টের সঙ্গে টেক্স্টবহির্ভূত জগতের মিথস্ক্রিয়া গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। লেখা বাহুল্য, এটা মোটা দাগের বিভাজন; ফরাশি ও ইঙ্গ-মার্কিন নারীবাদকে এতোটা আলাদা করা যায় না। একটা কথা তবু সত্য যে, ফরাশি দেশের পোস্টস্ট্রাকচারালিজম আমেরিকায় চালান হয় ষাটের দশকের শেষ দিকে, এবং সমালোচনার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তা নারীবাদী তত্ত্বকেও গভীর প্রভাবিত করে।

'পোস্টস্ট্রাকচারালিজম' ফ্রান্সে উদ্ভূত হয়, এবং যুগপৎ ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় হানা দেয়। তিনদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কি সেই ঐক্যসূত্র যার ফলে পোষ্টস্ট্রাকচারালিজমের এতো কদর হলো ভিন্ন তিন এলাকায়? পোস্টস্ট্রাকচারালিজমের রাজনীতি ও অর্থনীতি এপ্রসঙ্গে একটু বুঝে নেওয়া সংগত হবে।

শুরুর অনুচ্ছেদগুলোতে বলেছিলাম আধুনিকতার সংকট কিভাবে তৈরি হলো, তার গল্প। অই গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি, কেন্দ্র-প্রান্তের ভারসাম্যনাশ, কলোনির উচ্ছেদ, ঔপনিবেশিক মানুষের আত্মপরিচয়ের লড়াই ও জেগে ওঠার উপক্রমণিকা। প্রবল

শক্তিগুলোর মেরুকরণ সম্পন্ন হলো অতি দ্রুত, কিন্তু 'তৃতীয় বিশ্ব' নামক একটা 'আদার' পশ্চিমকে বিড়ম্বিত করলো প্রচন্ড। এই 'আদার'কে ইউরোপ কিংবা আমেরিকা কেউ-ই অগ্রাহ্য করতে পারলোনা। 'আদার'কে নিয়ে নতুন সাংস্কৃতিক বিতর্ক তৈরি হলো ইউরোপ এবং আমেরিকায়: 'আদার' ঢুকে পড়লো গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের নেটওয়ার্কে 'আদারে'র উপস্থিতি, আধুনিকতার অন্তর্বিরোধ ও সাংস্কৃতিক বিতর্কের পটভূমিকায় যার জন্ম হলো তার নাম 'পোস্টস্ট্রাকচারালিজম'। বাংলায় একেই উত্তরগ্রন্থনবাদ বলছি

উত্তরগ্রন্থনবাদের জন্ম ষাটের দশকে, আটলান্টিকের দুই পারে: ফ্রান্স ও আমেরিকায় আটষট্টির ছাত্র-আন্দোলন, এবং উপনিবেশের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম ফ্রান্সের রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ধাক্কা দেয় প্রচন্ড। একটা স্বাধীন দেশের অবরুদ্ধ হওয়ার গ্লানি ও যন্ত্রণা কি দুঃসহ, ফ্রান্সের মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জর্মন অবরোধের সময় হাড়েমজ্জায় বুঝেছিলো। ফলে ইন্দোচীন ও আলজিরিয়া এই দুই ফরাশি উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যতা ও মহত্ত্ব সে সময় চাপা থাকেনি ফরাশিদের কাছে। সকল সংবেদনশীল ফরাশি মানুষ একে সমর্থন করেছে : মার্লো-পোন্তি থেকে আঁন্দ্রে মালরো পর্যন্ত পুরো একটা লেখকপ্রজন্ম নৈতিকভাবে এর পক্ষাবলম্বন করেছে। ফরাশি বুদ্ধিজীবীরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে নাজী-অধিকারের প্রতিরোধের সময় সর্বপ্রথম উপনিবেশের দুঃখ টের পান, অন্যদিকে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তো ছিলোই; তদুপরি তাদের নিজদেশেই সংঘটিত হয়েছে শতাব্দীর সর্ববৃহৎ ছাত্র আন্দোলন। নাজী অধিকার, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, আলজিরিয়া ও ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধ এবং ছাত্রআন্দোলন এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো ফরাশি আধুনিকতার কাঠামো নড়বড়ে করে ফেলে। আধুনিকতার সংকটকালে এক বিকল্প তৈরি হলো ফ্রান্সে, যার নাম 'উত্তরগ্রন্থনবাদ'। যাকে 'সমালোচনা' বলা হতো, তা আর থাকলোনা; তার স্থান নিলো বিভিন্ন তত্ত্ব। এতোকাল 'সাহিত্য' অত্যন্ত বিশিষ্ট একটা বস্তু ছিলো, উত্তরগ্রন্থনবাদ নষ্ট করে দিলো সেই বিশেষত্ব। বিশেষ ধরনের ভাষা ও বিশেষ ধরনের জ্ঞান যে-সাহিত্যের বিশেষ অবলম্বন ও অলংকার ছিলো, তার ক্ষেত্রবদল হলো: সমালোচনার স্থলে গুরুত্ব পেলো ডিসকোর্সব্যাখ্যা। সাহিত্যসমালোচনাও আর আগের মতো থাকলোনা: বিভিন্ন তত্ত্ব—মনোসমীক্ষণ থেকে ফেনমেনলজি ভাষাতত্ত্ব থেকে দর্শন—তার অবাধ বিচরণভূমি। 'মনোসমীক্ষণ' যে আগের সমালোচনায় কিছু কম ছিলো তা নয়, কিন্তু লাকাঁ-র হাত হয়ে ফ্রয়েডিয় বিশ্লেষণের যে রূপান্তর, ও উত্তরগ্রন্থনবাদে তার প্রয়োগ, সে একেবারে অন্যজাতের। 'সাহিত্য' হয়ে উঠলো একটা 'ডিসকোর্স', অন্য ডিসকোর্সসমূহের ভেতর একটা ডিসকোর্স, পার্থক্য থাকলো মাত্র একজায়গায়, সেটা ভাষার। তা-ও বা থাকলো কই? বলা হচ্ছে, ভাষার বাইরে কিছু নেই, টেক্সচ্যুয়ালিটির বাইরে কিছু নেই, রিপ্রেজেন্টেশনের বাইরে কিছু নেই; সেদিক থেকে সবকিছুই এক-অর্থে 'সাহিত্য', উত্তরগ্রন্থনবাদ অন্তত তাই প্রমাণ করতে চায়

কিন্তু ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে, উত্তরগ্রন্থনবাদ চর্চার যে অর্থ, আমেরিকায় তা নয়। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, যে-ঐতিহ্য প্রচন্ডরকম বিশাল, দীর্ঘ ও ধারাবাহিক, সমৃদ্ধ ও সংঘাতপূর্ণ, মার্কিন প্রতিবেশ তার সগোত্র নয়। আমেরিকায় একটা 'পলিটিকাল আন্ডার ডেভেলপমেন্ট', এজাজ আহমদের ভাষায়,

সবসময়ে ছিলো। ভিয়েতনামের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুদ্ধবিরোধি বিক্ষোভ আমেরিকায় হয়েছে, কিন্তু সেই বিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদবিরোধি আন্দোলনে পরিণতি পায়নি। তদুপরি যুদ্ধবিরোধিতায় কেবল এই কথাটি ইস্যু ছিলো যে, কেন আমেরিকা ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠালো; এটা ইস্যু হিশেবে যে কতো সাধারণ আর গভীরতাহীন, তার প্রমাণ নিক্সন সৈন্য ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাতামাতি মুহূর্তে থিতিয়ে আসার মধ্যে লক্ষণীয়। তবে ষাটের দশকে যুদ্ধবিরোধি আন্দোলন ছাড়া, আরেকটি বিষয় সাড়া তোলে, সেটা হলো কালোদের নাগরিক অধিকার আন্দোলন—যেটা পরবর্তীতে কালোদের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে রূপ পায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কালোদের পড়ার সুযোগ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, এবং ব্ল্যাক লিটারেচর বলে সাহিত্যের ভিন্ন একটা সাহিত্যধারাও সৃষ্টি হয়, এবং স্বীকৃতি পায়। মার্কিন বিদ্যায়তনে কালো সাহিত্যের কোনো স্বীকৃতিই পূর্বে ছিলোনা, এবার হলো, যদিও খুব ব্যাপকভাবে নয়। একদিকে শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধবিরোধি বিক্ষোভ, অন্যদিকে কালোদের উত্থান ও স্বীকৃতি মার্কিন দেশে র‍্যাডিকাল বুদ্ধিবৃত্তির দরোজা খুলে দেয়। নারীবাদ ও উত্তরগ্রন্থনবাদের উদ্ভব এই দুই ঘটনার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুক্ত। ষাটের দশকের শেষদিকে আমেরিকায় শুলামিথ ফায়ারস্টোন, আড্রিয়ান রিচ, রবিন মরগান কিংবা অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের মতো নারীবাদীরা র‍্যাডিকাল ফেমনিজমের বিকাশ ঘটান এসময়। শুরুতে যা ছিলো কেবলি নারী-আন্দোলন, এপর্বে তা হয়ে ওঠে চরমপন্থী, অতঃপর তা র‍্যাডিকাল নারীবাদী সমালোচনা ও তত্ত্বের চেহারা নেয়। 'উইম্যানস স্টাডিজ' নামে স্বতন্ত্র শাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠে, এবং ওদেশের সমস্ত বিদ্যাঙ্গনে তা ব্যাপ্তি পায়। কিন্তু মার্কসবাদের যেঐতিহ্য ইউরোপে বহুকাল ধরে বিদ্যমান, তা মার্কিন দেশের সমালোচক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবলভাবে কখনো ছিলোনা, সাধারণভাবেও নয়। কেবল সত্তরের দশকের শেষ দিকে মার্কসবাদ কারো কারো বুদ্ধিবৃত্তিতে বেশ আচরণীয় হয়ে ওঠে; এদের অধিকাংশই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং এরা ছিলো ষাট দশকের ছাত্র। 'সাহিত্য' যে কেবলি সাহিত্য নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জ্ঞানকাণ্ড, সমাজ-সংস্কৃতি, মতাদর্শের আরো অনেক ব্যাপার, নতুন প্রজন্মের শিক্ষক সমালোচকেরা তাতে আলো ফেললেন। অথচ মার্কসবাদ যখন ওরকম এ্যাপ্রোচের কথা বলেছিলো, তারও অনেক আগে, মার্কিন সাহিত্যের এশটাবলিশম্যান্ট তা গ্রাহ্য করেনি। তারা তখন বলতো, মার্কসবাদ সাহিত্যের কথা তো বলেনা, বলে সমাজতত্ত্বের কথা। সত্তরের দশকে যে মার্কসবাদ এলো ওআমেরিকায়, তা-ও সীমাবদ্ধ থাকলো মূলত প্রতিষ্ঠানে, একাডেমিক চিন্তাবিশ্লেষণে। বিপরীতে, ইউরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মার্কসবাদের উপস্থিতি সবসময়ে সরব এবং সজীব। তবে ষাট ও সত্তরের দশকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে মার্কিন দেশে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, তা খুব নতুন; কেননা এর আগে আমেরিকায় তার অস্তিত্ব ছিলোনা। মার্কসীয় অবস্থান থেকে 'উপনিবেশ' 'সাম্রাজ্য' বিষয়ে আলোচনা উঠলো, এটা হয়েছিলো জাতীয়তাবাদী চাপ থেকে। কালোদের উত্থান ও কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদ এর মূলে। আফ্রিকার সাহিত্য পড়ানোর ব্যবস্থাও হলো এভাবে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের একটা প্রভাব পড়লো সাহিত্য সমালোচনায়, যুদ্ধের অভিঘাতে তৈরি হলো কিভাবে কলোনি ও সাম্রাজ্য উপস্থাপিত হয়েছে পশ্চিমের সাহিত্যে, সেই জিজ্ঞাসা। ঔপনিবেশিক

অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে শেক্সপীয়র ও জেন অস্টেন, স্যামুয়েল জনসন ও জর্জ এলিয়ট, শেলী ও টেনিসন, আঁন্দ্রে জিদ ও সাঁ ঝন পার্স পাঠ করা সম্ভব হলোনা।

ষাটের দশকের শেষার্ধে ও সত্তরের প্রথমার্ধে ইউরোপ-আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিতে যে র‍্যাডিকালিজম এসেছিলো, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো অচিরেই। ছাত্র আন্দোলনের পর কিছুদিনের মধ্যেই শান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেলো ফ্রান্স; অন্যদিকে আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপন ছিলো ঐতিহ্যহীন, কেবলি কোনো না কোনো প্রতিক্রিয়ার শস্য। 'মার্কসবাদ' ফ্রান্স কিংবা আমেরিকায় কোথাও নির্দেশক শক্তি হতে পারেনি। এর ফলে যা হবার তাই হলো, র‍্যাডিকাল তাত্ত্বিকেরা পোস্টমডার্নিজম ও পোষ্টস্ট্রাকচারালিজমের পশ্চাৎধাবন করলেন। ফরাশি পোস্টস্ট্রাকচারালিজম দ্বিগুণ-চতুর্গুণ উদ্যমে সংবর্ধিত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

উত্তরগ্রস্থনবাদী-পর্বে ফরাশি বুদ্ধিবৃত্তির শাসক হলেন দেরিদা, ফুকো, লিওতার, বোদরিলার্দ, দেলিউজ, গাত্তারী। 'সাবজেক্টে'র মৃত্যু হলো সমালোচনায়, 'সমাজ' 'জীবন' এইসব ধারণা বর্জিত হলো। ফরাশি হাওয়ায় আটলান্টিকের ওপারে উৎপন্ন হতে লাগলো বিচিত্র অভিসন্দর্ভ: পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট সন্দর্ভ ও অভিসন্দর্ভে মেতে রইলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উত্তরগ্রস্থনবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সবদিক থেকে সুবিধেজনক হয়েছে: কেননা এর কোনো শেকড় নেই, এ কোনো তত্ত্বও নয়, সবকিছুর জগাখিচুড়ি এতে সম্ভব, এবং সমালোচকের কোনো তাত্ত্বিক অবস্থান এতে দরকার করেনা। 'বিপ্লব' 'সাম্যবাদ' ইত্যাদি বাদ দিয়ে মার্কিন সমালোচকেরা 'তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ' নিয়ে মত্ত হলেন এবার, এবং অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো মেট্রোপলিস থেকে। রণজিৎ গুহের 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'কে দেয়া হলো উত্তরগ্রস্থনবাদী তকোমা; উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সাহিত্যকে হোমি ভাভা ভাবলেন ম্যাজিকাল রিয়ালিজম; আর ফ্রেডরিক জেমসনের মতো সমালোচকের মনে হলো, তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য মূলত 'জাতীয় রূপক' (ন্যাশনাল এলিগরি) রচনা করে গেছে সবসময়। কলোনি, সাম্রাজ্য ও জাতি নিয়ে যেভাবে আলোচনা শুরু হয়েছিলো ইতিপূর্বে, উত্তরগ্রস্থনবাদের বিশৃংখলায় তার সুস্থতা বিপন্ন হলো।

যুক্তিশীলতা ও বিচারধর্ম নাকচ হলো, কেননা তা 'এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্ট': পৃথিবীকে কেউ যদি বুঝতে চায় সমগ্ররূপে, তাও উপহাস্য; কেননা তা 'গ্রান্ড ন্যারেটিভে'র নস্টালজিয়া। উত্তরগ্রস্থনবাদ স্থির বিষয়বস্তুতে অবিশ্বাসী: সমালোচনা পরিণত হলো সৃষ্টিশীল ব্যায়ামে। কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না, কেননা 'ক্ষমতা' বিশ্বজনীন; আর জ্ঞান, এমনকি ক্ষমতার জ্ঞানও, অনিরপেক্ষ। সমালোচনার লক্ষ্য মার্জিনাল আদারের অনুসন্ধান, সেজন্যে বলা হলো 'ফ্রাগমেন্টেশন' ছাড়া তা অসম্ভব। বলা হলো, 'তত্ত্ব' বলতে কিছু নেই, কিংবা থাকা উচিত নয়; তত্ত্বের স্থান দখল করলো 'কথোপকথন'। অদ্ভুত বহুত্ববাদের বন্দনাগীত করলো মার্কিন সমালোচকেরা: ফুকোর জয়ধ্বনি করে ঘোষণা করলো: 'ফ্যাক্ট' বলে কিছু নেই, যদি থাকে তা 'ট্রুথ ইফেক্ট' মাত্র; আর ক্ষমতার প্রতিরোধ অসম্ভব, কেননা যাকে প্রতিরোধ বলবো, সেটাও ক্ষমতার অংশ, ক্ষমতার রূপভেদ মাত্র। উত্তরগ্রস্থনবাদী সমালোচক যা খুশি এবং যেখান থেকে খুশি নিতে পারেন, বদলাতে পারেন, একই সঙ্গে মার্কসবাদী ও মার্কসবাদবিরোধি হতে পারেন, ফেমিনিস্ট-এন্টিফেমিনিস্ট হতে পারেন। এজাজ আহমদ বড়ো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন এই

অবস্থাকে: বলেছেন, উত্তরগ্রস্থনবাদ তত্ত্ব আসলে চিন্তার একটি বাজার (মার্কেট প্লেস অফ আইডিয়াস); তত্ত্ব যেখানে পণ্যের মতো বিকোয়, এবং অই তত্ত্বপণ্যের যা খুশি যেখান থেকে খুশি নেয়ার স্বাধীনতা গ্রহীতার রয়েছে। তত্ত্বের মুক্তবাজার তৈরি করেছে উত্তরগ্রস্থনবাদ, এবং তত্ত্বের পর তত্ত্ব তৈরি কিংবা বাতিল হচ্ছে ভোক্তা ও বাজারের দিকে লক্ষ রেখে।

দুই

নারীবাদী সমালোচনার আলোচনায় উপরোক্ত উত্তরগ্রস্থনবাদী পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত খেয়ালে রাখা দরকার। এইটে আমি বলতে চাইনা যে, নারীবাদী সমালোচনা ও তার তত্ত্ব মর্মে মর্মে উত্তরগ্রস্থনবাদী; না, তা নয়। নারীবাদের অন্তরের চৈতন্য অবশ্যই রাজনৈতিক, এবং নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের প্রভাবাধীন, আচরিত ও পরাক্রান্ত ডিসকোর্সের ভেতর ক্ষয়ে যাওয়া অন্য একটি 'নারী ডিসকোর্স' আবিষ্কার কিংবা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নারীবাদীরা মনে করে, যেকোনো 'ডিসকোর্স' হলো প্রতিষ্ঠানিক; প্রতিষ্ঠান ডিসকোর্সকে বৈধতা দেয়, তার ওপর আইন-অনুশাসনের লেবেল লাগায়, এবং তাকে সুসম ও সাদৃশ্যপূর্ণরূপে উপস্থিত করে। অই ডিসকোর্স বেশ সুশৃংখল, তার যুক্তির মোড়কও লোভনীয়, কিন্তু তাতে নারীর কোনো গ্রাহ্যতা নেই। কেননা সেটি পুরুষতন্ত্রী ডিসকোর্স, এবং তাতে 'আদার' বা 'আদারনেসে'র কোনো স্বীকৃতি নেই। 'নারী' এইভাবে বাদ পড়েছে প্রবল ডিসকোর্স থেকে, এবং অতঃপর 'ক্ষমতা'র বিচিত্র সব কেন্দ্র ও কাঠামো থেকে। প্রান্তিক নারীর প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য তাই 'প্রতিষ্ঠান': পুরুষতন্ত্রী জমকালো যাবতীয় সব আশ্রম। প্রাতিষ্ঠানিক ডিসকোর্স সবকিছু মিলিয়ে নেয়, একাকার করে, এবং সেই ডিসকোর্স কোনো পার্থক্য মানেন নারীরা তুলে ধরে ডিসকোর্সের সমান্তরাল বিপরীত ও যুযুধান এক বাস্তব, প্রমাণ করে পার্থক্য ও ভিন্নতা; এবং জোর দিয়ে বলে 'অনন্যতন্ত্র' বলে কিছু নেই। যদি থাকেও, তা নিছক 'পুরুষতন্ত্র', যার প্রতিরোধ দরকার। পুরুষবাদী অনন্যতন্ত্র কিভাবে নারীকে নির্যাতন করে, এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা দেয়, নারীবাদী সমালোচকেরা তা বিশ্লেষণ করেছেন। বারবারা এহরেনরেইখ ও ডেইয়ার্ডি ইংলিশের 'কমপ্লেইন্টস এন্ড ডিসঅর্ডারস/ দি সেকচুয়াল পলিটিক্স অফ সিকনেস' এবং ফিলিস চেসলারের 'উইম্যান এন্ড ম্যাডনেস'; ন্যান্সি চডোরো-র 'দি রিপ্রোডাকশন অফ মাদারিং', এবং আড্রিয়ান রিচের 'অফ ওম্যান বরন' এই ধারার রচনা। এরা দেখেছেন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান, সন্তানপালন, পরিবার কাঠামো সবকিছুর নর্ম লিঙ্গবাদী। ম্যারি ড্যালি দুটো বই লেখেন : 'বিয়ন্ড গড দি ফাদার' ও 'দি চার্চ এন্ড দি সেকেন্ড সেক্স' এবং বিশ্লেষণ করেন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গবাদ। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পাঠকক্ষ পর্যন্ত কিভাবে এই সেক্সিজম বা লিঙ্গবাদের বিস্তার ঘটে, তার ব্যাখ্যা দেন ক্যাথারিন ম্যাকিননন, এবং বিচার করেন আইন ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক।

'প্রতিষ্ঠানে'র সমালোচনার পর নারীরা ফিরে তাকান আরো গভীর ও প্রভাবশালী এক 'প্রতিষ্ঠানে', যার নাম সাহিত্য। সাহিত্যপাঠের অভ্যাসকেও চ্যালেঞ্জ করেন তারা; কিভাবে জন্ম নেয় সাহিত্য অধ্যয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কিভাবে সাহিত্যের মূল্যায়ন করি আমরা, কিভাবে সাহিত্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয় একটা সমাজে, এবং কিভাবে তা প্রাতিষ্ঠানিক

কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। আরো সোজা প্রশ্নে চলে আসেন নারীবাদীরা; বলেন: কারা পড়ায় সাহিত্য? কেন পড়ানো হয়? কিভাবে পড়ানো হয়? গত দু-দশকে সাহিত্য অধ্যয়ন ও গবেষণা যে পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই; এবং তার পেছনে নারীবাদের ভূমিকা অনেকখানি। সাহিত্য অধ্যয়নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এবং সাহিত্য ব্যাখ্যার প্রাতিষ্ঠানিকতা, নারীবাদীরা প্রয়োজনীয় প্রতিভা ও সামর্থ্যের সহযোগে তদন্ত করেছে।

পশ্চিমের সংস্কৃতি 'নারীকে' দেখতে চেয়েছে নীরব, সহিষ্ণু, শান্ত; কেননা, দেরিদার অনুসরণে সুসানা ফিলম্যান বলেন, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক বোধ ও ভাবধারা শিশ্নকেন্দ্রিক। পশ্চিমের সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক স্বরটি অপজিশনাল : অর্থাৎ কোনো কিছুকে তার বিপরীত বস্তু বা প্রতিমার মাধ্যমে চিহ্নিত করা, সংজ্ঞা দেওয়া। যেমন পুরুষ/ নারী, সুস্থ/উন্মাদ, কথা/ নীরবতা, অভিন্ন/অপর ইত্যাদি। যেহেতু পুরুষের অপর হলো নারী, কাজেই নারী হলো নীরব এবং উন্মাদ। নারীবাদীরা প্রমাণ করেছে শিশ্নকেন্দ্রিক সংস্কৃতি যাই বলুক নারীরা নীরব নয়, বা ছিলোনা, এবং যদিও নারীর শিশ্ন নেই, তবু নারী 'ডিসকোর্স' 'প্রস্তাব' করতে পারে।

পুরুষতন্ত্র সাহিত্যের ইতিহাসকে কিভাবে বদলে দেয়, মাকিন নারীবাদীরা তার তদন্ত করেছেন। মার্কিন সাহিত্যের ইতিহাসে 'সেন্টিমেন্টাল নভেল'কে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি; ইতিহাসকারেরা মার্কিন ধ্রুপদী উপন্যাসের তালিকায় হ্যারিয়েট বীচার স্টো-র 'আঙ্কেল টমস কেবিন'-কে স্থান দেননি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই ধরনের সেন্টিমেন্টাল নভেলের ভূমিকা যথেষ্ট। এধরনের উপন্যাস বিশেষরকম ভাষা-ভাবধারার আধার তো বটেই, এর জনপ্রিয়তাও ছিলো তুঙ্গে; কিন্তু যেহেতু এ ছিলো নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বরে লেখা, এবং অনুভূতিপূর্ণ, তাই এগুলোর স্বীকৃতি জোটেনি পুরুষবাদী সাহিত্যের ইতিহাসে। সাহিত্যে নারীর আপন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ও কি হতে পারে, সে দিক থেকেও সেন্টিমেন্টাল নভেলের পাঠবিশ্লেষণ জরুরি।

এখানে দুটো বিষয় পরিষ্কার থাকা ভালো। অনেকেই জানেন, 'লিটারারি ক্রিটিসিজম' 'ওলিটারেরি থিওরি' এক কথা নয়। কাজেই 'ফেমিনিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম' ও ফেমিনিস্ট লিটারারি থিওরি দুটো আলাদা ব্যাপার। সমালোচনা বলতে সাধারণত বুঝবো কোনো একটা বিশেষ 'টেক্স্ট' সম্পর্কে আলোচনা: অর্থাৎ এই টেকস্টের অর্থ কি তাৎপর্য কি মূল্য কি গুরুত্ব কি ইত্যাদি। আর 'সমালোচনা' সম্পর্কে যদি আলোচনা করি, তার ভিত্তি ও ভ্যালু সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করি, তাহলে তা হবে 'সমালোচনার তত্ত্ব'। প্রত্যেক সমালোচনার পেছনে তত্ত্ব থাকবে এমন নয়, কিন্তু সমালোচনার যথাসম্ভব তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকা দরকার। আনন্দের বিষয়, নারীবাদীরা কেবল সমালোচনাই লেখেননি, সমালোচনাতত্ত্বও সৃষ্টি করেছেন। তবে, স্বভাবতই, তাঁদের তত্ত্বপ্রস্তাব সাম্প্রতিক হলেও, তাঁদের সমালোচনার বয়েস একেবারে কম নয়। স্থূলভাবে মার্কিন নারীবাদের কথাও যদি ধরি, দেখবো ষাট এবং সত্তরের দশকে মার্কিন নারীবাদীরা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসমালোচনার জন্ম দিয়েছেন, এবং পরবর্তীতে, আশি এবং নব্বইয়ের দশকে নারীবাদীরা হয়ে ওঠেন আরো বেশি আত্মসচেতন, এবং অধিক পরিমাণে তাত্ত্বিক। অর্থাৎ প্রথমে তাঁরা সমালোচনা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন।

তত্ত্ব প্রস্তাব, এবং নিজেদের সমালোচনাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি দিতে গিয়ে ফরাশি ও মার্কিন নারীবাদীরা বিভিন্নরকম সমস্যায় আক্রান্ত। নারীবাদীদের সমালোচনা সবসময়েই প্রেরণাব্যঞ্জক, নতুন নতুন আলো ও আভায় দীপ্ত; কিন্তু তাদের সমালোচনার তত্ত্ব সমকালীন সমালোচনা-তত্ত্বের সঙ্গে অনেকসময় আপোষ করেছে, মিলে গেছে। এইটে নারীবাদী সমালোচনাতত্ত্বের সংকটের গোড়া। তবে সেই সংকট বিষয়ে নারীবাদীরা যথেষ্ট সচেতন, সেজন্যে তাঁদের তত্ত্বায়ন ও তাত্ত্বিক ভিত্তি-সন্ধান এখনো ফুরিয়ে যায়নি

নারীবাদী সমালোচনাতত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো সংকট ফরাশি উত্তরগ্রন্থনবাদের প্রভাবের ফল, এবং উত্তরগ্রন্থনবাদের প্রভাবে নারীবাদী তত্ত্ব অনেক সময়েই তার রাজনৈতিক মাত্রা হারিয়ে ফেলেছে। উত্তরগ্রন্থনবাদ সমস্ত দৃষ্টি টেকস্টের দিকে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু নারীর অবনমন কেবল টেকস্টেই সীমাবদ্ধ নয়। টেক্স্টের বাইরে বিরাট পৃথিবীতে নারীর নিগ্রহ অনেক বেশি বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও বিবর্ধমান। কেননা নারীর লড়াই কেবল সাংস্কৃতিক নয়, রাজনৈতিকও। সেই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য, প্রকরণ, চরিত্র ও অভিব্যক্তি দেশভেদে সমাজভেদে জাতিভেদে ও রাষ্ট্রভেদে আলাদা হতে বাধ্য। উন্নত বিশ্বের নারী যেজন্যে সংগ্রাম করে, তৃতীয় বিশ্বের নারীর কাছে তা একেবারে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে; আবার তৃতীয় বিশ্বের নারী যে জন্যে স্বপ্ন দেখে, মেট্রোপলিসের নারীবাদী তার মাথামুণ্ডু বুঝবেন না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উত্তরগ্রন্থনবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রভাবে নারীবাদী সমালোচনাতত্ত্ব ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে; সেই সূক্ষ্মতা হয়তো আকর্ষণীয়, উদ্ভাবনাশীল, আধুনিকের অধিক উত্তরাধুনিক, কিন্তু তাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নারীবাদের রাজনৈতিক তাগিদ, প্রেরণা ও বাস্তবতা। কেননা পৃথিবীর নারীরা এখনো অধস্তন, দুঃখী, অবনত; কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উইম্যানস স্টাডিজ' বিভাগের প্রতিষ্ঠা, ফেমিনিস্ট জার্নাল থিসিস বইপত্রের প্রকাশ, আর নারীর মুক্তি এক কথা নয়। নারীবাদের সংগ্রাম প্রধানত রাজনৈতিক, এটাকে গৌণ করা যাবে না।

সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যের ব্যাখ্যায় 'জেন্ডারে'র ভূমিকা নারীবাদীরা খুঁটিয়ে দেখতে চান। আমরা আগেই সেক্স ও জেন্ডারের তফাত বলেছি; নারীবাদীদের প্রশ্ন, জেন্ডারের পার্থক্য 'শরীরে'র ভেতরই আছে, নাকি এটা তৈরি করে সংস্কৃতি? সাহিত্যের টেকস্টে জেন্ডার-পার্থক্য কি ধরনের চিহ্নে কথা বলে? যখন কোনো সমালোচক সাহিত্যবিচারে বসেন জেন্ডারের ভূমিকা তাতে কেমন থাকে, নারীর কিংবা পুরুষের কাজের বিশ্লেষণ? সমকামী নারী কিংবা মাইনরিটি নারীর কাজের মূল্যায়নে নারীবাদী সমালোচক তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা কিভাবে অতিক্রম করবেন? নারীবাদী সমালোচনা কি তাত্ত্বিকভাবে অনেকত্ববাদী, প্লুরালিস্ট? নারীবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বের কি আদৌ দরকার আছে? এইসব প্রশ্নকে ঘিরে নারীবাদীদের আলোচনা চলছে।

'আর্কেমেডিস ও নারীবাদী সমালোচনার কূটাভাস' নামে অসাধারণ একটা প্রবন্ধ আছে মেরা যেহলেনের। তিনি বলেন, 'পুনর্ভাবনা' ছাড়া নারীবাদী সমালোচনার অন্য কোনো মূল্য নেই, এবং পুনর্ভাবনার চোখ নিয়ে তিনি বিচার করেন উনবিংশ শতাব্দীর সেন্টিমেন্টাল ফিকশন। উনিশ শতকের উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সংগ্র

সাহিত্যধারার ওপর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করেন এবং একটি [illegible] হলো : পৃথিবীর সাহিত্যে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, দুই ধরনের জীবন তাতে উপস্থাপিত : (এক) অন্তর্মুখী জীবন, (দুই) বহির্মুখী জীবন। যে জীবন 'অন্তর্মুখী', চাই তা নারীই যাপন করুক কিংবা পুরুষ, তা 'ফিমেল লাইফ': নারী জীবন; আর যে জীবন 'বহির্মুখী', চাই তা নারীর হোক কিংবা পুরুষের, তা 'মেল লাইফ': পুরুষজীবন। উপন্যাসের পর উপন্যাসে এই দুই জীবন 'স্ট্রাকচার' হিসেবে আবির্ভূত, এবং এই স্ট্রাকচার আসলে উপন্যাসের শুধু নয়, সমাজেরও; শুধু সমাজেরও নয়, চিন্তাপদ্ধতিরও।

অ্যান কোড্‌ট নারীবাদী সমালোচনার বহুত্ববাদী ভঙ্গির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন, নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো এতো প্রথাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন যে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিশেষরকম শিক্ষিত আকল্প (লার্নেড প্যারাডাইম) আমাদের সাহিত্যবোধের সংস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছে; সে জন্যে 'ভালো'-সাহিত্য কিংবা 'খারাপ'-সাহিত্য বলে যেসব ধারণা বহুকাল ধরে প্রচলিত, বিচারহীনভাবে তা গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে বিপদ যথেষ্ট

বোনি যিমারম্যান সমকামবাদী সাহিত্য সমালোচনার গুরুত্ব নির্দেশ করেন এবং বলেন: সমকামী নারীদের সাহিত্য বিভিন্নভাবে উপেক্ষিত, এবং তা উন্মুক্ত নারীবাদের বিরোধি। 'সমকাম' সাহিত্যে নীরব হয়ে ছিলো বহুকাল, এবং প্রতিষ্ঠান কখনোই তাকে অনুমোদন করেনি। সমকামবাদী সমালোচকেরা তাই ঐতিহ্যিক তাত্ত্বিকতা ও বহুত্ববাদ অপছন্দ করেন; কারণ তাঁদের মতে, 'সমকাম' নারীর আইডেনটির সূত্র, বহুত্ববাদের ছুতোয় তার অবদমন, নারীর সঙ্গে নারীর [illegible] কেউ কেউ আফ্রো-আমেরিকান নারীবাদী সমালোচনাকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন, কেননা তার মাধ্যমে ইউরোপীয় পুরুষতন্ত্রী সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রতিরোধ কার্যকরভাবে সম্ভব। এ প্রসঙ্গে এলেন শোআল্টারের লেখা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ভেতর যে অংশটুকু একান্তভাবে নারীর, যাকে ইংরেজিতে 'ফেমিনিন' বলে (অর্থাৎ 'নারীবিষয়'), সেই অংশটুকুর পুনরুদ্ধার, পুনর্বিচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সর্বস্তরের নারীবাদী সমালোচকেরা কর্তব্য মনে করেছেন।

যে সব সাহিত্যকে 'মহৎ সাহিত্য' বলে বন্দনা করা হয়েছে বহুকাল, এবং তাতে বিধৃত অভিজ্ঞতাকে 'বিশ্বজনীন' বলা হয়েছে— সাহিত্যমূল্যে তা কতোটা মহৎ আর অভিজ্ঞতা হিসেবে কতোটুকু বিশ্বজনীন, নারীবাদী সমালোচকেরা তা যাচাই করে দেখেছেন। দেখা যায়, যাকে মহৎ সাহিত্য বলা হয়েছে তা আসলে লিঙ্গবাদী, এবং যে 'অভিজ্ঞতা'কে 'বিশ্বজনীন' নাম দেওয়া হয়, তা কোনো অর্থেই বিশ্বজনীন নয়, বরং তা উচ্চশ্রেণী কিংবা মধ্যশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ কুসংস্কার। কাজেই মহৎ সাহিত্যের বর্গে যেসব টেকস্টের বিন্যাস, তা সবসময় নন্দনতাত্ত্বিক অভিরুচিজাত নয়, রাজনৈতিক নির্বাচন প্রসূত। নিজেদের সংস্কার ও অপবিশ্বাসকে নান্দনিকতা বলে চালিয়ে দেবার যুক্তি নেই। সাহিত্য ও সাহিত্য-বিষয়ক যাবতীয় বোধকে সনাতন মল্যবাদের ধারণা থেকে বিযুক্ত করা যেহেতু কঠিন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব, তাই নারীবাদীরাও মনে করেন যে, তাদের অন্বেষা কেবলি সাহিত্য-কেন্দ্রিক হলে সমস্যা আছে।

নারীবাদী সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, নারীর লেখা বিপুল সাহিত্যকর্মের পুনরাবিষ্কার, এবং তার সূত্রে সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্গঠন। নারীবাদী সমালোচকেরা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত নারীদের সাহিত্যকর্মের জরিপ করেন, নতুন ইতিহাস তৈরি করেন, এবং প্রমাণ করেন নারীর লেখা সাহিত্য অভিজ্ঞতা, রীতি ও উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষসাহিত্য থেকে : উপন্যাসে নারীরা এক উপসংস্কৃতির (সাবকালচার) জননী, যার সঙ্গে অন্য লেখার কোনো সাদৃশ্য নেই। নারীদের নারীরা পুরুষদের তৈরি নারীদের একেবারে উল্টো। এলেন শোআল্টার ১৮৪৫ সালের পরে রচিত ব্রিটিশ নারীদের উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখান, কিভাবে ওদের উপন্যাস সমকালীন নিয়ন্ত্রক সংস্কৃতির বিপরীতে আলাদা এক 'উপসংস্কৃতি' উপস্থিত করে, কিভাবে নারীদের উপন্যাসে নিজেদের তৈরি প্যাটার্ন, প্রবলেম, বিষয় ও ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং কিভাবে তা নারীদের প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রবহমান। ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডে নারীরা যে সাবকালচার জন্ম দিয়েছিলো,তা পুরুষবাদ-মুক্ত, এবং তার বিপরীত। এলেন শোআল্টার দেখান, নারীর ঐতিহ্যে তিনটি মুহূর্ত এসেছে: প্রথম মুহূর্ত ফেমিনিনের, দ্বিতীয় মুহূর্ত ফেমিনিস্টের, তৃতীয় মুহূর্ত ফিমেলের। সাহিত্যের নতুন ইতিহাস পুনর্গঠন করেন শোআল্টার, অসাধারণ দক্ষতায় বর্ণনা করেন অস্টেনের 'চূড়া', ব্রোন্টির 'খাড়াই', জর্জ এলিয়টের 'পরিধি' এবং ভার্জিনিয়া উলফের 'পর্বত'। সান্দ্রা গিলবার্ট ও সুসান গুবারও 'চিলেকোঠার পাগলী' (১৯৭৯) বইতে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান নারীসাহিত্যের ধারাবাহিক পুরুষ প্রভাবমুক্ত ঐতিহ্যের অনবদ্য বিশেষণ করেছেন। হ্যারল্ড ব্লুমের মতো বিখ্যাত সমালোচককে খারিজ করে এরা বলেন, ব্লুম যে 'প্রভাবতত্ত্ব' (এংযাইটি অফ ইনফ্লুয়েন্স) নিয়ে মাতামাতি করেন, এবং নিজের তত্ত্বের সমর্থনে রাশিরাশি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দেন—তার সবটাই পুরুষের; এই পুরুষতন্ত্রী প্রভাববাদ দিয়ে নারীসাহিত্যের উপসংস্কৃতি আন্দাজ করা যাবে না। পুরুষের 'এংযাইটি অফ ইনফ্লুয়েন্সে'র স্থানে তারা বসান নারীর এংযাইটি অফ অথরশিপ'।

নারীবাদী সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব অনেক সূক্ষ্মতর ধারণা ও উপলব্ধি গোচরে এনেছে আমাদের। পশ্চিমের সংস্কৃতিতে এই কথাটি বেশ প্রতিষ্ঠিত যে, লেখালেখি মূলত পুরুষের ব্যাপার, নারীর নয়; কেননা, লেখা মানে উপাত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত, বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত— যা নারীর নেই। নারীর লেখাকে মেধাবুদ্ধিপ্রতিভাহীন বলার, এবং তার সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করার এ এক চাতুর্য। এরই প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ায় সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে ফ্রান্সে 'ফেমিনিন রাইটিং' নামে এক নারীবাদী লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতিভূ এলেন সিক্সো ও ল্যুস ইরিগেরি। এলেন সিক্সো ঘোষণা করলেন: 'তুমি লেখ, তোমার শরীর অবশ্যই তা শুনবে' (রাইট য়ুরসেলফ। য়ুর বডি মাস্ট বি হার্ড)। এলেন কি বলতে চেয়েছেন এই ক্ষুদ্র বাক্যে, তা নিয়ে গবেষণা কম হয়নি পাশ্চাত্য দেশে: শরীর কি করে লেখে? শরীরের কি তবে ভাষা আছে কোনো? শরীর কি কথা বলে? শরীরের কি কোনো ডিসকোর্স আছে?

এলেন সিক্সো আসলে বলতে চান, লৈঙ্গিক ভিন্নতা কেবল, লিঙ্গের দিক থেকে স্বতন্ত্র নারী /পুরুষ নামক এই দুই প্রজাতিতে সীমাবদ্ধ নয়, এই ভিন্নতা ভাষার ভেতরেও আছে

দুই লিঙ্গের দুই ভিন্ন ভাষা, এমনই হয়তো ইঙ্গিত করেন এলেন। পশ্চিমের সংস্কৃতি যে ধরনের ভাষার অনুমোদক, নারীর ভাষা তা থেকে ভিন্ন; পশ্চিমের আধুনিক সংস্কৃতি ঐ বিশেষ লিঙ্গনিষিক্ত ভাষা-ব্যবস্থাকেই মান্য দেয়। পশ্চিমের সংস্কৃতি-সে জন্যে বলে, 'তার' (পুরুষের) ভাষা যুক্তিশীল, মননাশ্রয়ী; এবং 'ওর' (নারীর) ভাষা অযৌক্তিক, মননহীন; পুরুষের ভাষা রৈখিক, নারীর ভাষা বৃত্তাকার— এই কথাও পশ্চিম প্রতিষ্ঠা করেছে। পশ্চিম বলতে চায় বুদ্ধি মেধা মন ও মননের সঙ্গে নারীর যোগ অল্প, এগুলো কেবল পুরুষবাবুর নিজের জিনিশ। প্রবল সংস্কৃতির এই লৈঙ্গিক নির্দেশ লংঘন করার জন্যে এলেন ও ইরিগেরি 'ফেমিনিন রাইটিং' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন; তাঁরা বলেন, মনের চেয়ে শরীর বড়ো নারীর লেখায়, এবং এটা নারীর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। শরীরকে মনের কয়েদী না বানিয়ে তাঁরা শরীরকে মনের প্রভু করে তোলেন, এবং ঘোষণা করেন; ভাষা লেখে শরীর, মন নয়; ভাষা শোনেও শরীর, মন নয়; আর লেখা কখনোই স্রেফ মানসিক কাজ হতে পারে না। তবে এদের আলোচনার দার্শনিক ভিত্তি ফ্রয়েড লাকাঁর সাইকোএনালিসিস; ফ্রয়েড-লাকাঁর চিন্তাধারার অনুসরণে এরা মন, শরীর ও ভাষার সম্পর্ক সন্ধান করেছেন। 'ফেমিনিন রাইটিং' কাকে বলে, কিংবা তা কিরকম, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এলেন সিজোর বিশ্ববিখ্যাত রচনা 'মেডুসার হাসি' (ফরাশিতে ১৯৭৫-এ, এবং ইংরেজিতে পরের বছর [১৯৭৬-এ] প্রকাশিত)।

তিন

'দি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ফেমিনিস্ট মাস্ট লার্ন টু স্টপ ফিলিং প্রিভিলেজড্ এজ এ ওম্যান।'

—গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক

নারীবাদী সমালোচনাতত্ত্বের সূক্ষতা, দুরূহতা, গভীরতা কালক্রমে অন্য এক সংকট ঘনীভূত করে তোলে। প্রথম বিশ্বের আধুনিক নারীবাদী এক জটিল স্বেচ্ছাদুর্গ নির্মাণ করেন, যে-দুর্গ এতো দুর্গম, শৃংখলামন্ডিত ও আলট্রা-মডার্ন যে, সেখান থেকে তৃতীয় বিশ্বের নারীদের পাঠ করা অসম্ভব। নারীবাদী সংগ্রামের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সমজনিতি ও সরলীকরণে তাৎপর্য হারায়। প্রাচ্য ও পশ্চিমের সেই সনাতন বিদারণ রেখা আবার মাথা তোলে, প্রথম বিশ্বের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দূরত্ব কেবলি বাড়তে থাকে তখন। ফরাশি নারীবাদী সমালোচক জুলিয়া ক্রিস্তেভা যখন "এবাউট চাইনিজ উইম্যান" (লন্ডন ১৯৭৭) নামে বই লিখে চীনা নারীদের বিষয়ে স্বকপোলকল্পনার জাল বোনেন, প্রাচ্য-পশ্চিমের দূরত্ব ও পার্থক্য অলংঘনীয় মনে হয়।

জুলিয়া ক্রিস্তেভা সহ অন্যান্য উত্তরগ্রন্থনবাদী নারীতাত্ত্বিকেরা দেরিদা, দেলেউয ও লিওতারের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, প্রথম থেকেই; এবং দেরিদা-দেলেউয-লিওতার যেহেতু পশ্চিমী পরাতত্ত্বের সীমানা-লংঘনে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন অন্যসব 'আদার'কে বুঝবার জন্যে, তাই ক্রিস্তেভার মতো নারীবাদীরাও তাদের অনুগমন করেন। কিন্তু 'আদার ওয়ার্ল্ড' এবং 'আদার নারী'কে অনুধাবন করতে হলে ভিন্ন ধরনের পাঠাভ্যাস (ডিফরেন্ট রিডারশিপ) দরকার, তা এঁদের নেই। গায়ত্রী চক্রবর্তী সাম্প্রতিক ফেমিনিজমের প্রথম বিশ্বকেন্দ্রিকতার উল্লেখযোগ্য সমালোচক। নারীবাদের এই সমস্যার উৎস সন্ধান করতে

গিয়ে গায়ত্রী এক গল্প বলেন তাঁর "অন্য ভুবনে" (১৯৮৮) নামক বইতে :

> ১৯৪৯ সালে [illegible] সীমানায়। এখানে তাঁর পিতামহের এস্টেট। দুই বৃদ্ধা [illegible] প্রস্তর খন্ডের ওপর। নদীতে কার কোন অংশ, এই নিয়ে দু'জনের তুমুল ঝগড়া। [illegible] এই নদীর তোর নাকি, এটা তো কোম্পানির নদী'

উল্লেখ্য, এটা ১৯৪৯ সালের ঘটনা, এবং ১৯৪৭ সালেই ইংরেজ উপনিবেশ উঠিয়ে নেয়। সাতচল্লিশে ইংরেজ চলে গেছে, কাজেই বৃদ্ধা ঠিক বলেনি; কিন্তু বৃদ্ধার কথা তথ্য হিসেবে ভুল হলেও, ফ্যাক্ট হিসেবে সত্য। কোম্পানি যায়নি। পশ্চিমের নারীবাদীরাও একই সমস্যায় আক্রান্ত, গায়ত্রী বলেন; তাঁরা বুঝতে চাইছেন প্রান্তিক নারীদের, এটা ঠিক; কিন্তু বুঝতে যে পারছেন না (পারবেন না!) এটা ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, 'অরিয়েন্টালিজম' হানা দেয় আবার; 'প্রাচ্য' আদারই র'য়ে যায়। চীনা নারীদের নিয়ে লিখতে গিয়ে ক্রিস্তেভা বার বার চলে যান চীনের অতীত মাতৃতন্ত্রে, মিথ ও অতিকথা তাঁকে টানে; সমকালের চেয়ে অতীতকালে স্বস্তিবোধ করেন বেশি

ফরাশি নারীবাদ একধরনের 'হাই ফেমিনিজম' তৈরি করে; যেজন্যে দেখা যাবে, বিশেষত আমেরিকায়, তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে এর কদর খুব বেশি। সাধারণ নারীবাদীরা এতে খুব উৎসাহ পান না, কিন্তু সাহিত্যবিভাগগুলোতে ফরাশি নারীবাদ খুব উচ্চমূল্য পেয়েছে।

এলেন সিজো ও মানিক উইটিং ("সমকামী শরীর"গ্রন্থপ্রণেতা) ও জুলিয়া ক্রিস্তেভা ফরাশি আভঁগার্দ সাহিতে দ্বারা খুব অনুপ্রাণিত। তাদের লেখা কখনো শার্ল বোদলেয়ারের কিছু গদ্যকবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়; যদিও বোদলেয়ার থেকে তারা দূরে থাকতে চান, সম্ভবত এজন্যে যে, ওয়াল্টার বেনয়ামিনের ভাষায়, বোদলেয়ার মার্গীয় পুঁজিবাদপর্বের পুরুষতন্ত্রী অবক্ষয়ের লিরিক প্রতিভা ছিলেন।

মালার্মে ও জয়েসের লেখা এলেন ও ক্রিস্তেভাকে অসম্ভব আলোড়িত করেছে। তাঁদের বিশ্বাস, ফরাশি আভগাঁদ সাহিত্যে যে চরমপন্থা ও র‍্যাডিকালিজম ছিলো, তাতে লিঙ্গের ভিন্নতা ও বিশেষত্বের বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই নারীবাদীরাও যদি ও-পথে যেতেপারেন, তাহলে নারী ডিসকোর্স অবশ্যই এক সম্পূর্ণতা পাবে। প্রকাশবাদ ও বাস্তববাদের মাঝামাঝিতে আঁভর্গাদের যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিলো এলেন ও ক্রিস্তেভা তাকে নারীবাদের জন্যে জরুরী মনে করেন।

ফরাশি নারীবাদীরা নারী ও পুরুষকে আলাদা ভাবতে চান না শেষ পর্যন্ত। হার্বার্ট মার্কুইস লিখেছিলেন, আঁভর্গাদ সাহিত্য ও দ্বান্দ্বিক চিন্তার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। আঁভগার্দ সাহিত্য শব্দের ওপর থেকে 'ফ্যাক্ট' এর সব চিহ্ন মুছে দেয়, এবং এভাবে যে ভাষা তৈরি হয় তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ভাষা থেকে ভিন্ন। ভাষার এই প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরিত্রে এলেন ক্রিস্তেভা খুব আকর্ষণ বোধ করেন।

জুলিয়া ক্রিস্তেভা বলতে চান, নারী-পুরুষের বিভাজন বাড়িয়ে নারীবাদের কোনো লাভ নেই; কেননা ওভাবে নারীবাদ স্বতন্ত্র হবে না। তার স্থলে দরকার আঁভগার্দ সাহিত্যের

আদর্শ, যাতে লৈঙ্গিক ভিন্নতা নেই, যাতে 'আইডেনটিটির বৈপরীত্য লুপ্ত হয়ে গেছে 'নারী'কে আলাদা করে দেখা, কিংবা নতুন এক 'নারী' সৃষ্টি করে নেয়াই দুটো, ক্রিস্তেভার চোখে অবাঞ্ছিত। কারণ, এতে পুরুষতন্ত্রের সনাতন ভিন্নতার ধারণা টিকে যায়। লিঙ্গবাদের বিরোধিতা তিনি করেন, কিন্তু তার বিশ্বাস, এই বিরোধিতার পাশাপাশি 'চৈতন্য বদলের আন্দোলন' দরকার যে আন্দোলন লিঙ্গের ভিন্নতা ও অসংগতিকে অতিরিক্ত মূল্য দেবে না।

নারী-পুরুষ আজকের পৃথিবীতে এমন একটা নেটওয়ার্কে চলে এসেছে যেখানে, ক্রিস্তেভার মতে, লিঙ্গভেদের প্রসঙ্গ তেমন অর্থপূর্ণ নয়। তাছাড়া এলেন ও ক্রিস্তেভা বলেন, 'নারী'র মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে ভাষার আধারে যা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তাঁরা বলেন, আঁভগার্দের সাহিত্যে যে 'আমরা' কথাটি পাই, তা পুরুষ ও নারী দুপক্ষকে যুগপৎ নির্দেশ করে। একটা ব্যাপার লক্ষণীয় ফরাশি নারীবাদীরা ফ্রয়েড পড়েছে। অসাধারণভাবে, কিন্তু মার্কস নয়; মার্কস অনুপুঙ্খভাবে এঁরা পড়েন নি।

ফরাশি নারীবাদ, যার ভিন্ন একটা সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক। শরীর ও যৌনতা নিয়ে এরা বলেছেন বেশি, নারীবাদের রাজনৈতিক লড়াই এখানে গৌণ। গরিব দেশের নারী ও নারীবাদীরা এ থেকে কতোটা উপকৃত হবে, বলা শক্ত। 'আমি কে?'—এই প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে ফরাশি নারীবাদীদের আচ্ছন্ন করে রাখে; 'অন্যনারী'কে?'—এই প্রশ্ন তারা ভাবতে চান নি। 'নারী-আনন্দ' নিয়ে এঁরা যে পরিমাণ শ্রম-উদ্যম-প্রতিভা ব্যয় করেন, অন্য নারীর দুঃখ, মুক্তি, বিষয়ে অতোটা আগ্রহী নন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এসবই নারীবাদকে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করার প্রয়াস।

সেজন্যেই 'নারীবাদ'কে গরিব দেশের পটভূমিকায় নতুন করে বিশ্লেষণ কর দরকার। প্রথমে মীমাংসা করতে হবে, আমাদের জন্যে 'শ্রেণী'-র বোধ আগে, ন 'জেন্ডারের' বোধ। পশ্চিমে নারীরা নারীর স্বাধীনতা ও মুক্তি নিয়ে যেসব কথা বলেন, তা গরিব দেশের নারীদের জন্যে স্রেফ বিলাসিতা কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে। দেশে যখন নারীর মুক্তির কথা বলবো, তখন বুঝতে কোন মুক্তি? কর্মজীবী নারীর? এলিট নারীর? সকল নারীর? বলা বাহুল্য, 'শ্রেণীর' প্রশ্ন কিছুতেই এড়ানো যাবে না। কোন শ্রেণীর নারী কার পক্ষে, কোন মুক্তির কথা বলছে, এইটে স্পষ্ট থাকা দরকার। একথা বলতে চাই ন যে, এলিট নারীর সমস্যা নেই, সে তো অবশ্যই আছে; কিন্তু সেই 'সমস্যা' গরিবদেশের সাধারণ নারীর সমস্যা কিনা, কিনা ভাবতে হবে। গরিব কর্মজীবী নারীর প্রতিদিনের সংগ্রাম থেকে নারীবাদকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

ফরাশি ও মার্কিন নারীবাদ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, সে বৃত্তান্ত আগেই দিয়েছি। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব যে পরিমাণ সূক্ষ্মতা, সংকেতময়তা ও বুদ্ধির দীপ্তি অর্জন করেছে, সমালোচনার ইতিহাসে বিরল। নারীবাদী সাহিত্যপাঠ কিংবা বিচার যদি আমরাও শুরু করি, তাহলে একই পথে যেতে হবে এমন নয়। সেরকম অনুকরণ বেগানা, উদ্ভট, এমনকি হাস্যকরও হতে পারে। তবে এটা ঠিক, পশ্চিমের সব কথা নতুন নয়, গরিব দেশের লোকেরাও আজকাল ওসব বোঝে। এমনকি আগের বাঙালি নারীরাও জেন্ডারের রাজনীতি, লিঙ্গবাদ, সাংস্কৃতিক বিতর্ক (পুরুষসংস্কৃতি ও নারী সংস্কৃতির

বৈপরীত্য) বুঝতেন না, তা নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তা দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা তার প্রমাণ। তবে এদের সাহিত্যকর্ম সাহিত্যের ঐতিহাসিক বা বিবরণকারেরা স্বীকার করতে চান নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে জীবনানন্দ দাশ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'ছায়াপিণ্ড', বলেছিলেন 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা', সেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" (৪র্থ সংস্করণ কলকাতা ১৩৬৯) নামে দু-কেজি ওজনের মোটা এক বই লেখেন। সেখানে প্রভাবতী দেবী ও শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো, 'ইহাদের মধ্যে নতুন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর ইঁহারা সকলেই কম বেশি পুরাতন আদর্শ-সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন'। দীনেশচন্দ্র সেন এক নারী কবিকে কবিতা লেখা বাদ দিয়ে 'রন্ধনশালার ভার' নিতে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে, স্ত্রীলোকের বিদ্যা সবসময় আধখানা, সম্পূর্ণ নয়; এবং তা দিয়ে বড়োজোর 'নারকেলের মালা' উৎপন্ন হতে পারে, যা কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু আসলে কি বঙ্গীয় নারীদের রচনা একরম তুচ্ছ? বঙ্গীয় নারীদের কি মেধা বুদ্ধি প্রতিভা কিছু ছিলো না? শৈলবালা ঘোষজায়ার "জন্ম-অপরাধী" উপন্যাস ওকি পুরাতনের পোষকতা মাত্র?

উল্লেখ করা দরকার, নারীদের লেখালেখি বঙ্গীয় সমাজে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা; শৈলবালা নিজের নামের সঙ্গে যোগ করেন 'ঘোষজায়া'; যাতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা টের না পায় লেখিকা তাঁদেরই নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ। অথচ শৈলবালার লেখার উপার্জনে উন্মাদ স্বামীর চিকিৎসা এবং সংসার চলেছে।

শৈলবালা ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকেরা বাংলার নারীদের যে চিত্র আঁকেন সেটা তার সত্যরূপ। তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন এখনো ঘটেনি। যে সমাজে 'পুরুষ মানুষের চটি জুতার স্থানটা যেখানে, বিবাহিতা স্ত্রীর স্থান যে তাহার ঢের নীচে' ("জন্ম-অপরাধী") সে সমাজে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা ভিন্ন হতে বাধ্য। উন্নত বিশ্বের নারীবাদ বঙ্গীয় সমাজে বিলাসিতা। নারী আন্দোলন এখানে তাই কেবল উচ্চ-মধ্য-শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবেনা।

তবে ইউরো-মার্কিন নারীবাদের যে সাংস্কৃতিক বিতর্ক, তা আমাদের জন্যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাঙালি নারীদের লেখা পড়লে বোঝা যায়, পুরুষদের টেকস্ট ও অভিজ্ঞতালোক থেকে তা কতো স্বতন্ত্র। বঙ্গীয় নারীর স্বতন্ত্র ডিসকোর্স এখানো আলোচিত, এমনকি আবিষ্কৃত, হয়নি; নারীদের রচনা বিভিন্নভাবে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ওগুলোর পুনরুদ্ধার কর্তব্য, তারপরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ। শ্রেণীর প্রশ্ন, সামাজিক স্বার্থের প্রশ্ন, নির্যাতন ও দুঃখের প্রশ্ন, সর্বোপরি গরিব দেশে নারীর লড়াইয়ের প্রশ্ন এড়িয়ে বঙ্গীয় নারীবাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উত্তরাধুনিকতা ও ইতিহাস

পশ্চিমের ইতিহাসে তিনটি বড়ো রকমের ঘটনা ঘটে : (ক) মধ্যযুগের পর রেনেসাঁস; (খ) রেনেসাঁসের সমস্ত অর্জনের পটভূমিকায় আলোকপর্ব বা এনলাইটেনমেন্ট; (গ) আলোকপর্বের আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় অর্জিত 'আধুনিকতা'। তিনটি ঘটনাই পরস্পর-সম্পৃক্ত, এবং ঐতিহাসিকেরা তিনটি ঘটনাকেই 'কালে'র সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। 'ইতিহাস' বলতে সেজন্যে আমাদের মনে প্রথমেই ভেসে ওঠে কালের ছক, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কালের বৃত্তান্ত। সময়ের ছককে এরকম নির্দিষ্ট করা উত্তরাধুনিকদের অপছন্দ, তাই তাঁরা 'ইতিহাস' ও ইতিহাস-বিধৃত আধুনিকতা বিষয়ে গভীর সংশয় ব্যক্ত করেছেন।

'ইতিহাস'কে অনেককাল ধরে ভাবা হয়েছে স্রোতোরেখার মতো: এমন একটি স্রোতোরেখা যা এগিয়ে চলেছে আবহমান, যার কোনো পিছুটান নেই, যা দুর্বার ও দুরন্ত। ইতিহাসকে বহতা-স্রোত ভাববার কারণে তার সঙ্গে 'প্রগতি'র বিকাশকেও মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'ইতিহাস' বলতে একটিমাত্র ইতিহাসকেই ধরা হয়, তা হলো 'সভ্যতার ইতিহাস'। বলা বাহুল্য সভ্যতার ইতিহাস মানে পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাস। পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসের ছকে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে মাপা হয়েছে। যদিও পশ্চিমের বাইরেও পৃথিবী ও সভ্যতা আছে, এবং ছিলো : কিন্তু সেই পৃথিবীর সভ্যতাকে 'একমাত্র ইতিহাসে'র উপাদান মনে করা হয়নি, পশ্চিমের ইতিহাস/প্রগতি/সভ্যতার ফ্রেম থেকে গোলার্ধের অনালোকিত কিংবা অপরিচিত কিংবা অনাবিষ্কৃত অংশ বাদ পড়ে গেছে। যাই হোক, ধাবমান ইতিহাসের সঙ্গে প্রগতির বিকাশকে এক করে ফেলার কারণে খোদ 'ইতিহাসের'ই একটা সংকট তৈরি হয়েছে; উত্তরাধুনিকদের মতে সেই সংকট উপেক্ষা করা যাবে না।

পশ্চিমের ইতিহাস ও পশ্চিমে রচিত ইতিহাস, একটি কথাই জানাতে চায়, তাহলো, 'ইতিহাস' মুক্তিরই একটা প্রকল্প। কারণ ইতিহাস মেলে ধরে মানবিক প্রগতির আখ্যান, এবং সেদিক থেকে ইতিহাস মানুষের মুক্তিঅন্বেষা ও মুক্তিলাভের বিচারবোধ এক ভাষ্য। ইতিহাসের কালবিভাজন, প্রগতি ও মুক্তির চেতনা অতঃপর 'আধুনিকতা' নামক কনসেপ্টে বদলে যায়। ইতিহাস হয়ে ওঠে আধুনিকতারই এক ধারাবাহিক বৃত্তান্ত।

পশ্চিমের মনোভঙ্গিতে এইভাবেই সুদৃঢ় হলো 'ইতিহাসবাদ'; ইতিহাসবাদ মানে ইতিহাস নিয়ে ভাবনা, ইতিহাস-আশ্রয়ী প্রগতির চৈতন্য; এককথায় ইতিহাস-সৃষ্টির জন্যে ইতিহাসের ব্যবহার, উত্তর-ঐতিহাসিক আধুনিকতার জন্যে ঐতিহাসিক-আধুনিকতার উপযোগ সন্ধান। কিন্তু দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে, যে-ইতিহাস নিয়ে পশ্চিমের বিরাট দম্ভ এবং উল্লাস, তার মধ্যে অনেক নিষ্ঠুর তামসীপর্ব আছে; সেজন্যে ইতিহাস কেবল নিরবিচ্ছিন্ন প্রগতি বা নির্বিরোধ আধুনিকতার ইতিহাস নয়, একই সঙ্গে তা হত্যা, লুণ্ঠন, বিশ্বযুদ্ধ, সন্ত্রাস, সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশবাদেরও ইতিহাস। উত্তরাধুনিকেরা বলেন, ইতিহাস কখনোই মুক্তির প্রকল্প হতে পারে না, কারণ বিংশশতাব্দী প্রমাণ করেছে, বিপ্লব কিংবা যুদ্ধ কিংবা ব্যাপক মানবধ্বংস মানুষকে মুক্তি দেয় না।

তবে এখানে বলে নেয়া দরকার, মার্কিন আমলারা বর্তমানে যে ইতিহাসের মৃত্যুর কথা বলে আনন্দে আত্মহারা হচ্ছেন, তার সঙ্গে যেমন হেগেলের সম্পর্ক নেই, তেমনি উত্তরাধুনিক লিওতারের ইতিহাসবিরোধিতারও কোনো সম্পর্ক নেই। রাশিয়া ও পূর্বইউরোপে সাম্যবাদের পতন মার্কিন বুরোক্র্যাটদের আনন্দ দেবে, সেটা স্বাভাবিক। আনন্দের বন্যায় আমেরিকার এক আমলা 'ইতিহাসের মৃত্যু'র কথা ঘোষণা করে বেশ হৈ চৈ ফেলে দেন [দ্রষ্টব্য, ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা, 'দি এন্ড অফ হিস্ট্রি' *দি ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট*, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৯৮৯]; কিন্তু এর সঙ্গে হেগেলের ইতিহাস-সমাপ্তি তত্ত্বের কোনো যোগ নেই। হেগেল বলেছিলেন রিয়াল-র‍্যাশনাল যেদিন এক হবে, যেদিন মিলন ঘটবে সাবজেক্টের সঙ্গে অবজেক্টের, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর, সেদিনই ইতিহাসের সমাপ্তিতে পৌঁছুবে মানুষ, সেদিনই সমাপ্ত হবে ইতিহাস। রিয়াল-র‍্যাশনালের মিলন দেখেছিলেন হেগেল ফরাশি দেশে, বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে বীর নেপোলিয়নের রাষ্ট্রগঠনে মধ্যে; কিন্তু' রাষ্ট্র'-যে শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত মুক্তি আনে না, হেগেল সে কথা বোঝেন নি। যে কারণে হেগেল-কথিত ইতিহাসের সমাপ্তি এক কূটাভাসপূর্ণ অনুপম ইউটোপিয়া হিশেবেই রয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা যে 'ইতিহাসের মৃত্যু'র কথা বলেন, সেটা একেবারেই ভিন্ন প্রসঙ্গ। ফুকোয়ামা বোঝাতে চান, ইতিহাসের দরকার ছিলো সাম্যবাদী মার্কসিস্টদের; রাশিয়া ও পূর্বইউরোপের পতনে সেই ইতিহাসের মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ মার্কসবাদীরা ইতিহাস-সৃষ্টির জন্যে ইতিহাসের যে ব্যবহার করেছেন, পুঁজিবাদের বিরাট ক্ষমতা, জৌলুশ আর ঐশ্বর্যে তা বিবর্ণ। ইতিহাস যদি থাকে, ফুকোয়ামার মতে, তবে তা তৃতীয় বিশ্বেই থাকবে; পুঁজিবাদের তা আর দরকার নেই; আমেরিকার পুঁজিবাদ 'ইতিহাসের' ছেলেমানুষী ভাবালুতা ও আদর্শবাদ অনেক আগে পার হয়ে এসেছে। ফুকোয়ামার মতে, তৃতীয় বিশ্বেই এখন ইতিহাস দরকার, কেননা তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লব হয়নি, তৃতীয় বিশ্বে আধুনিকতা বা প্রগতির মতো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেনি। ফুকোয়ামা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলছেন, তা তাঁর জন্যে খুব শোভন, পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ বিজয়ে তাঁর উল্লসিত হবারই কথা।

উত্তরাধুনিকেরা ইতিহাসের বিরোধিতা করেন একেবারেই ভিন্ন অবস্থান থেকে। ইতিহাসের বিরোধিতা করে তাঁরা মূলত আধুনিকতার সমালোচনা করেন। আধুনিকতার বিরাট অহংকার 'যুক্তিবাদ', উত্তরাধুনিকেরা এই যুক্তিতন্ত্রের ঘোর অসমর্থক। মিশেল ফুকো তাই একের পর এক বই লিখে প্রমাণ করেন, কিভাবে যুক্তির বিন্যাস ও শৃংখলায় আধুনিক সমাজ ও আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি হলো; কিভাবে সেই আধুনিক রাষ্ট্র সকল নিষ্ঠুরতাকে বৈধ করলো, কিভাবে নির্মমতাকেও যুক্তি/ ডিসিপ্লিনের মোড়কে সুন্দর ও শোভন করা হলো। দেরিদা যে ডিকনস্ট্রাশনের কথা বলেন, তা-ও আধুনিক যুক্তির খোপ থেকে বেরিয়ে আসবার একটা প্রয়াস। যুক্তির ভড়ং-এর বদলে তিনি অন্তহীন এক তামাশাকে স্বাগত করেন। দেরিদা লক্ষ্য করেন, যুক্তির ফ্রেমে টেক্সটকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা অর্থকে প্রধান করে তোলা হয়েছে, এবং সেই অর্থের ঝলকানিতে অন্য অর্থ নির্যাতিত হয়েছে। ফুকো কিংবা বার্থ দেখেন, লেখকের কবজা থেকে টেক্সটের অর্থ মুক্ত নয়। এভাবে তাঁরা চলে যান কর্তৃত্বের সকল ফর্ম আর অনুশাসনের বিপরীতে, এক সপ্রাণ ডায়ালজিতে; সুসান সোন্তাগের 'ব্যাখ্যা-বিরোধিতা'ও সেই গোত্রের। সোন্তাগ [illegible]

কিন্তু ব্যাখ্যা নয়: ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রেটেশনের ভেতর তিনি দেখেন একটা আধিপত্যবাদ, আরোপণ, জবরদস্তি। তারা বারবার বৃত্তের বাইরে চলে আসেন, মার্জিন আর মার্জিনালের খোঁজে; তাঁরা টেক্সটকে পরিণত করেন বহুভাবে ব্যবহারসম্ভব এক উন্মুক্ত পরিসরে। সে জন্যেই ঘুরে ফিরে তাঁরা বলেন ডিসকোর্সের কথা : ফতোয়া নয়, সিদ্ধান্ত নয়, শেষকথা নয়; ডিসকোর্স— বহুবাচনিক মানবিক প্রক্রিয়া।

উত্তরাধুনিকপর্বে বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান চরিত্র এই মুক্ততা, স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিবাদে সংশয়: যুক্তিবাদে অবিশ্বাস থেকেই উত্তরাধুনিকেরা ইতিহাস বিরোধিতার কথা বলেন। ইতিহাসের কাল-পারম্পর্যে বিশ্বাস রাখা দায়। কারণ ফুকো দেখিয়েছেন ইতিহাস যেভাবে কালপারম্পর্য দেখায়, তা এক পুরাণ মাত্র: ইতিহাসের ওরকম নিছিদ্র, ধাবমান, ধারাবাহিক ছক এক অলীক কল্পনা। আয়তইতিহাসের (ম্যাক্রো হিস্ট্রি) পরিবর্তে উত্তরাধুনিককেরা তাই 'অনায়ত ইতিহাস' (মাইক্রো হিস্ট্রি) প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ যেসব বিষয় অসাধারণ, বিরাট ও মহৎ বলে স্বীকৃত, তার দিকে না তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সাধারণ ও মামুলি ব্যাপারকে গ্রাহ্য করা; আয়ত অভিজ্ঞতার বদলে অভিজ্ঞতার অনেকান্ত ও অনায়ত প্রান্তকে মূল্য দেওয়া—এই হলো মাইক্রো হিস্ট্রি, একেই এক ডাচ বিশ্লেষক উত্তরাধুনিক ইতিহাসতত্ত্ব বলেছেন। উপহাস করে ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের এক অধ্যাপক বলেছেন: এ হলো সেই ইতিহাস যেখানে গাছ নয়, গাছের শাখাও নয়, গাছের পাতাই মূল্যবান, অর্থাৎ উত্তরাধুনিকতা বৃক্ষপত্রের ইতিহাসমঞ্জরী প্রস্তাব করেছে। বৃহৎ নয় খন্ড, যৌগিক সময় নয় বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত, বৃত্ত নয় তার প্রান্তদেশ, উত্তরাধুনিক ইতিহাসতত্ত্বে মূল্যবান। উত্তরাধুনিকেরা বলতে চান অতীত জানার জন্যে যে ইতিহাস দরকার তাতো রাশি রাশি লেখাই আছে, এখন প্রয়োজন তাকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠ করা, তার মার্জিনে বিচরণ করা, তার বিচিত্র বিক্ষিপ্ত মুহূর্ত বিশ্লেষণ করা।

রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রকাশনা মাইক্রো-ইতিহাসচর্চারই একটা পরিণতি। রণজিৎ গুহ ও তাঁর সহযোগী ভাবুকেরা বলতে চান, এতোদিন পর্যন্ত যাকে ইতিহাস বলা হয়েছে ভারতে, তা মূলত এলিটিস্ট হিস্টরিওগ্রাফি: উচ্চবর্গীয় ইতিহাস: এখন প্রয়োজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাস সন্ধান। তাঁরা ঐতিহাসিকদেরকে অভিজ্ঞতার আয়ত স্তর থেকে অনায়তপর্যায়ে নামতে বলেন। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকপর্বের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষদেরও যে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও সক্রিয়তা ছিলো, উচ্চবর্গীয় ইতিহাসপ্রকল্পে তা স্বীকার করা হয়নি। তার কারণ, সেই ইতিহাস প্রবলভাবে ইংরেজ, ও ইংরেজের উপনিবেশ পুষ্ট; যে-ইতিহাসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ইংরেজি ও ইংরেজের প্রবর্তনা হিশেবে দেখানো হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে চাষীবিদ্রোহ ও কৃষক চেতনা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য; এই চেতনা নিম্নবর্গের, এই চেতনা ও বিদ্রোহ স্বতস্ফূর্ত ও অবিনাশী, এই চেতনা গান্ধীর নয়, ইংরেজের কেতাব থেকে এই চেতনা আসেনি, নিম্নবর্গের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে এর জন্ম। এই অভিজ্ঞতা নিম্নবর্গকে বিদ্রোহী সক্রিয়তায় অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু অভিজাততন্ত্রী উচ্চবর্গীয় ইতিহাসে এই নিম্নবর্গ কই? যা-ও বা আছে, তা বিক্ষিপ্ত, এবং অপব্যাখ্যায় বিকৃত; নিম্নবর্গকে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করে এলিট ঐতিহাসিকেরা তাদের ইতিহাসকে ভুলভাবে

বিচার করেছেন; ফলে নিম্নবর্গের ধর্মকে তাদের মনে হয়েছে কুসংস্কার, তাদের সংস্কৃতিকে মনে হয়েছে গ্রাম্য ও অমার্জিত, তাদের বিদ্রোহকে মনে হয়েছে অপরিকল্পিত আবেগের নৈরাজ্য ও অপরিণত উচ্ছ্বাস। সেজন্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডির্জের, রণজিৎ গুহ, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, গায়ত্রী চক্রবর্তী, ডেভিড আর্নল্ড, সুমিত সরকার, অরবিন্দ দাশ, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শাহিদ আমিন, অশোক সেন, অজিত চৌধুরী, এন, কে, চন্দ্র, স্টিফেন হেনিংহাম, জ্ঞান পান্ডে, রামচন্দ্র গুহ, স্বপন দাশগুপ্ত, তনিকা সরকার, বার্নাড কোহন এই উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করেন, বিচার করেন, ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের পাঠ থেকে ইতিহাসের কাঠামোটাই বদলে যায় : প্রচারিত সত্য হয়ে ওঠে মিথ, মিথ হয়ে ওঠে ইতিহাসের আসল আদল। তবে এঁরা যদিও সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখক, কিন্তু এদের প্রয়াস কেবল 'সাবঅলটার্ণ স্টাডিজে'র সম্পাদিত-ন'টি খন্ডে সীমাবদ্ধ নয়; একই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছেন— দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন ঔপনিবেশিক বাংলার কর্মজীবী শ্রেণীর ইতিহাস (১৯৮৯), গৌতম ভদ্র ময়মনসিংহের ও নারকেলবেড়ের কৃষকবিদ্রোহের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ (১৯৯৪), রণজিৎ গুহ-ও লেখেন কৃষক বিদ্রোহ বিষয়ে আলাদা বই (১৯৮৩), ডেভিড আর্নল্ড লিখেছেন দক্ষিণ-ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সম্পর্কে (১৯৭৭), বার্নাড কোহন লেখেন ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন এবং ভারতীয় সভ্যতার সামাজিক নৃতত্ত্ব বিষয়ে (১৯৬৮ ও ১৯৭১), ডেভিড হার্ডিম্যানের বই আছে গুজরাটের কৃষক জাতীয়তাবাদ বিষয় (১৯৮১), শাহিদ আমিন লেখেন গোরখপুরের চাষীদের ইক্ষুচাষ বিষয়ে (১৯৮৪), জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে লেখেন উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি সম্পর্কে (১৯৭৮), সুমিত সরকার লেখেন ভারতের গণ-আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং বাংলার স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে (১৯৭৩ ও ১৯৮৩)।

সাবঅলটার্ন স্টাডিজের লেখকেরা ইতিহাসকে নিচের দিক থেকে দেখতে চান, উপরের দিক থেকে নয়; এই দৃষ্টিপাত নিঃসন্দেহে ভিন্ন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' কোনো মতাদর্শকেই চূড়ান্ত মনে করে না; কোনো একক তত্ত্বের আনুগত্য তারা করেননি। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজে'র ইতিহাসচর্চা সেজন্যে এক 'মাইক্রো হিস্ট্রি' প্রস্তাব করে; তাদের প্রয়াসকে 'উত্তরাধুনিক' বলা যাবে কিনা, সেটা ভিন্ন কথা। তবে উত্তরাধুনিক পর্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবুকদের চিন্তাধারা যে এদেরকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁদের লেখা পড়লে বোঝা যায়। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বা নিম্নবর্গের ইতিহাসপ্রকল্প পশ্চিমেও সাড়া জাগিয়েছে, তাছাড়া এই প্রকল্পের কোনো কোনো ভাবুক পশ্চিমের একাডেমিক অঙ্গনে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার তো মনে হয় পত্র-পত্রিকায় নিরর্থ কলাম না লিখে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের উচিত এসব ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া; বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আরো সমকালীন, সৎ, এবং আরেকটু আধুনিক হবার চেষ্টা করা।

উত্তরাধুনিক অদিসিয়ুস ও একজন পিটার আইজেনম্যান

পিটার আইজেনম্যান উত্তরাধুনিক স্থপতি। আইজেনম্যান ইঞ্জিনিয়ার নন, শিল্পী, স্থাপত্যের শিল্পী। আইজেনম্যানের স্থাপত্য চিত্রশিল্পের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বি। তাঁর সঙ্গে আছেন, আরো কয়েকজন স্থাপত্যশিল্পী, যেমন বার্নাড তাসুমি কিংবা যাহা হাদিদ। আইজেনম্যান ও তাসুমি স্থাপত্যকলায় যে -তাত্ত্বিক বিপ্লব এনেছেন, তা বেশ অভিনব। তাঁদের স্থাপত্যকাজ যেমন অদ্ভুত, তাঁদের তত্ত্বও তেমনি সমকালীন উত্তরগ্রন্থনবাদী সমালোচনাশিল্পের প্রতিস্পর্ধী। জাক দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন'-কে এঁরা স্থাপত্যে প্রয়োগ করেছেন—বাস্তব কাজে এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়। সমালোচনাতত্ত্বে উৎসাহী সকলেই তাঁদের অভিমত ও বিশ্লেষণে অবাক মেনেছেন।

আইজেনম্যান খুব প্রভাবশালী তাত্ত্বিক, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। আইজেনম্যানের 'ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেকচার এন্ড আরবান স্টাডিজ', এবং অই প্রতিষ্ঠানের দুটো ম্যাগাজিন—'অপজিশন' ও 'স্কাইলাইন'—স্থাপত্যক্ষেত্রে বিভিন্নরকম তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তরঙ্গের জনয়িতা। আইজেনম্যান দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলায় সুপণ্ডিত; তাঁর ভাবনায় অনেক অসংগতি ও উল্টোকথন আছে, তাঁর রচনাও সবসময় নির্দ্বন্দ্ব নয়; কিন্তু তাঁর চিন্তা, বুদ্ধির দীপ্তি ও বিনির্মাণের মতো দর্শনঘনিষ্ঠ ব্যাপারকে স্থাপত্যে প্রয়োগ করার দুঃসাহস স্তম্ভিত করে দেয় । আইজেনম্যান, সন্দেহ নেই, একটু এলিট গোত্রের লোক, ফরাশি আঁভগার্দে দারুণ আলোড়িত তিনি, এবং তাঁর সর্বমুহূর্তের ভাবনা : আধুনিকতার মতো বিরাট বৈপ্লবিক এক ঝড়তুফানকে কিভাবে ঘরবাড়িভবনের ভেতর নিয়ে আসা যায়, কিভাবেই তা নির্ণেয় হতে পারে প্রতিদিনের বসবাসের মধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও চরাচরের মহানগরগুলোতে আইজেনম্যান কাজ করেছেন। তবে তিনি কেবল শিল্পী নন, অনেক বড়ো তাত্ত্বিকও। আইজেনম্যানের লেখায় দর্শন, সাম্প্রতিক সংস্কৃতিজিজ্ঞাসা, বিনির্মাণ, পাঠবাদী তত্ত্ব ও পাঠকেন্দ্রী সৃষ্টিশীলতা একসঙ্গে মিশেছে। তাঁর লেখা দুরূহ—দীক্ষিতের পক্ষেও; তাছাড়া তিনি যে একজন স্থপতি, তাঁর লেখা পড়ে তা মনে হয় না। একদিকে তিনি আধুনিক স্থাপত্যের অন্তঃসার গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনের স্থাপত্যকেন্দ্রিক প্রয়োগ তাঁর কাজকে প্রাচীন ও সমকালীন সকল নির্মাণকলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আইজেনম্যান বলেন, 'আমি তো ঘরবাড়ির মিস্ত্রি নই, আমার কাজ একেকটা টেকস্ট—পাঠকের উচিত তা পাঠ করা'। আর্কিটেকচার বলতে আমরা বুঝি বাড়িঘর দালানকোঠা, বসবাসযোগ্য ভবন, এককথায় একটা আশ্রয়স্থল : আইজেনম্যানের তত্ত্ব ও কাজ এর উল্টো—স্থাপত্যকে তিনি অই আবাসিক সংস্কার থেকে মুক্ত করেছেন, নির্মাণের মধ্যে দিয়ে উচ্চারণ করেছেন

নির্মাণবিরোধিতার সন্ত্রাস, ঘর-বাড়ি আশ্রয়ের মতো স্নিগ্ধ জড়পিন্ডের স্থলে সৃষ্টি করেছেন শিল্পকলা। ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর স্থাপত্যের কাজ না দেখে আইজেনম্যানকে বোঝা যাবেনা; তবু যেহেতু তিনি কেবল স্থপতি নন, তাত্ত্বিকও, এবং যেহেতু তাঁর সম্পর্কে বাংলায় এক হরফ কোথাও নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে, বিশেষত তাঁর উত্তরাধুনিক স্থাপত্যউদ্যোগ সম্পর্কে, কয়েকটি কথা বলা দরকার।

দুই

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সাহিত্যে যে পরিবর্তন (যেমন রোঁলা বার্থের 'লেখকের মৃত্যু' অথবা 'বয়ানের আনন্দ'), এবং দর্শনে যে রূপান্তর (যেমন দেরিদার বিনির্মাণবাদ) তাকে স্থাপত্যের পরিসরে পরীক্ষা করেন পিটার আইজেনম্যান, বার্নাড তাসুমি ও যাহা হাদিদ। সে দিক থেকে আইজেনম্যানের তত্ত্ব ও প্রাকটিস উত্তরাধুনিক নাস্তিবোধের জনয়িতা (তাঁর ভাষায়, 'নট ক্লাসিকাল', 'ডি-কম্পোজিশন','ডি-সেন্টারিং', 'ডিসকন্টিনিউটি')। ভাষাজিজ্ঞাসা ও দর্শন থেকে আইজেনম্যান আর্কিটেকচারের উদ্দীপন সংগ্রহ করেন; উত্তরাধুনিক স্থাপত্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থের জনয়িতা চার্লস যেন্‌কস তাই তাঁকে চিহ্নিত করেন এক অক্লান্ত অদিসিয়ুসরূপে—যিনি যুগপৎ ফ্রয়েড-লাঁকা-নীৎশে-দেরিদা দ্বারা উদ্বোধিত, আশ্রয়বিরোধি স্থাপত্যের শিল্পকার, যিনি ক্রমাগত সন্ধান করেছেন আধুনিকতা ও তার চৈতন্যের অনেকান্ত সব সংকেত, কোড ও ইশারা, খুঁজেছেন 'অনাত্মার' অব্যবহিত প্রতীক ও রূপবিধি ; আর তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গণহত্যা এলিয়েনেশন পারমাণবিক বোমা ও অন্যান্য সন্ত্রাসে আইজেনম্যান আধুনিক মানুষের নিয়তি সন্ধান করেছেন বারবার। আইজেনম্যান আধুনিক মানুষকে এসবের ভেতর দিয়ে বুঝতে চান, তাঁর স্থাপত্যকে তাই সমকালীন সাহিত্য ও দর্শনের পাশাপাশি পাঠ করা সম্ভব।

আধুনিকতা, উত্তরাধুনিকতা ও বিনির্মাণ বিষয়ে অনেক উপভোগ্য আরগুমেন্ট তৈরি করেন আইজেনম্যান তার কথাবার্তা সবসময়েই তির্যক, নিজস্ব, এবং বেশিরকম আধুনিকবাদী। 'বিচ্ছিন্নতা'কেই আধুনিকতা মনে না করলেও, একে তিনি খুব গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, 'বিচ্ছিন্নতা' আধুনিকতার একটা অবস্থা; বিপরীতে আধুনিকতা হলো, ধর্ম-বিজ্ঞান-দর্শনে সত্য, অরিজিন, মূল্যবোধ ও অন্তঃসার বিষয়ে যেসব প্রশ্ন-তর্ক-কৌতূহল-জিজ্ঞাসা জেগেছে তার পরিসর। সেদিক থেকে আধুনিকতা, প্রাকৃতিক সত্যের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধের এক অপরূপ সড়ক বা দরোজা বা দিগন্ত। এভাবে আধুনিকতা সৃষ্টি করে ত্রাস, আতংক ও উদ্বেগ : সেই উদ্বেগ থেকে জন্মায় ডিসলোকেশন, সেই ডিসলোকেশনকেই আমরা 'বিচ্ছিন্নতা' বলি কাজেই আধুনিকতা কেবল বিচ্ছিন্নতা নয়, বিচ্ছিন্নতার একটা অবস্থা।

আইজেনম্যান মনে করেন, স্থাপত্যে মডার্নিজম বা তার তত্ত্ব প্রযুক্তই হয়নি অতীতে। অন্য ডিসকোর্সে যেটা হয়েছে , যেমন 'ডিসলোকেশন অফ ট্রুথের উত্থাপন, স্থাপত্যে সেটা আসেনি। তিনি মনে করেন, মডার্নিজমের অই উপলব্ধি স্থাপত্যে আনা শিল্পীর কর্তব্য। আধুনিক স্থপতি সেই বাড়ি বানাবেন, যা আশ্রয়হীন অপ্রীতিকর বসবাসবিরোধি ও অবাঞ্ছিত। যেহেতু মানুষের কোথাও আশ্রয় নেই, তাই বাড়িঘরকে মনোজ্ঞ আশ্রয়ের আধার ভাবা প্রতারণা এবং কুসংস্কার।

তিন

১৯৮৮ সালের জুন মাসে নিউইয়র্কের 'ম্যুজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট'-এ বিনির্মাণবাদী স্থাপত্যের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 'ভিস্যুয়াল আর্টে' ডিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োগ-পরিধি নিয়ে প্রথম যেবৈঠক বসে, তা-ও এবছরই—টেইটগ্যালারি এবং একাডেমি গ্রুপ সেই সিম্পোজিয়ামের যৌথ উদ্যোক্তা। বিনির্মাণ কি একটা মুভমেন্ট? আন্দোলন? যদি হয়, তাকি মডার্ন? 'ডিকনস্ট্রাকশন' নামক দার্শনিক ধারণার প্রয়োগ, স্থাপত্যে, কতোদূর সংগত? এধরনের জিজ্ঞাসাকে সামনের রেখেই এই সিম্পোজিয়াম ও প্রদর্শনী। সিম্পোজিয়ামের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেরিদার যোগাযোগ ঘটে, এবং এই উপলক্ষে ক্রিস্টোফার নরিসকে দেরিদা একটা সাক্ষাৎকারও দেন। সিম্পোজিয়ামের শুরুতে ভিডিও-রেকর্ডের অই সাক্ষাৎকার ছিলো আকর্ষণীয় এক ব্যাপার।

পিটার আইজেনম্যানের বিশ্বাস, ডিকনস্ট্রাকশন জ্ঞানের অতিক্রমণকে প্রতীকায়িত করতে চায়। বিনির্মাণের চোখ দুই ব্যাপারের মাঝখানে (লুকস ফর 'দি বিট্যুইন") : সুন্দর ও কদর্য, যৌক্তিক ও যুক্তিরহিত—ডিকনস্ট্রাকশন এদু'য়ের মধ্যবর্তী জিনিশটাকে মূল্য দেয়; কেননা বিনির্মাণ খোঁজে 'দমিত'কে, 'রিয়াল রেসিস্ট্যান্ট'কে সে বার করতে চায়। বিনির্মাণ সিস্টেমকে নাড়িয়ে দেবে, সেটাই তো স্বাভাবিক, কেননা বিনির্মাণবাদী স্থাপত্যের লক্ষ্য হলো, 'বিচ্ছিন্ন মানুষের জন্যে অনুরূপ ঘরবাড়ি বানানো'। এই স্থাপত্য কখনোই 'ইলাসট্রেটিভ' হতে পারে না, কেননা স্থাপত্যের আবহমান সিস্টেমেই তার আপত্তি। আমাদের ভেতরের ত্রাস, শূন্যতা ও 'টেরর' স্থাপত্যেও বিম্বিত হওয়া চাই। ভেতরের শূন্যতা যদি এতোই অমোঘ হয় আমাদের, তাহলে বাড়িঘরে 'হার্মনি' থাকবে কেন?

তবে ডিকনস্ট্রাকশনের ব্যবহার দর্শন বা সাহিত্যে যতো সহজ, স্থাপত্যে অমন নয়। তারপরও অদিসিয়ুসের উদ্যম ও সৃষ্টিকৌশলে আইজেনম্যান স্থাপত্যের বাস্তব সমস্যা অতিক্রম করে যান, ভবনের পর ভবন তোলেন ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে, এবং বলেন, ডিকনস্ট্রাকশন কোনো স্টাইল নয়, মুভমেন্টও নয়, এ-আসলে স্থাপত্যের অনুশাসন ও কারুবিধি ধ্বংস করার বুদ্ধি। 'ভবন স্থায়ী, এবং সুনিশ্চিত'—এই ধারণা ভেঙে দেয় বিনির্মাণবাদী স্থাপত্য। বার্ণাড তাসুমি বলেন, 'আবাসিক নগরের ঘরবাড়ি এমনভাবে বানাতে হবে, যাতে মনে হয় এসব দুর্ঘটনার ফল'।

দর্শনের সঙ্গে স্থাপত্যের যোগ সম্ভবপর কিনা, তর্কের ব্যাপার; তবে দার্শনিকেরা স্থাপত্য নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেনও। দার্শনিকদের ভেতর কেউ স্থাপত্যকে নান্দনিক ফর্ম হিশেবে দেখেছেন, যেমন হেগেল; কেউ কেউ শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় স্থাপত্যকে উদাহরণ হিশেবে ব্যবহার করেছেন। 'দি অরিজিন অফ দি ওয়ার্ক অফ আর্ট' রচনায় হাইডেগারের গ্রীক মন্দির বিষয়ক আলোচনা মনে পড়ে। আবার দার্শনিকদের মধ্যে এমনও আছেন , যাঁরা স্থাপত্যের গড়নকে, আঙ্গিককে, কিংবা বলা যায় স্থাপত্যের রূপককে, দার্শনিক আরগুমেন্টের জন্যে প্রীতিকর দৃষ্টান্ত ভেবেছেন। স্থাপত্যের রূপক কান্টের দর্শনে উদাহরণ হিশেবে অনবরত এসেছে। তবে স্থাপত্য বিষয়ে দেকার্তের একটা আলোচনা তাঁর 'ডিসকোর্স অন মেথডের দ্বিতীয় ভাগে পাই, যা বেশ চিত্তাকর্ষক। দেকার্তের ভাবনা ছিলো এই : ইউরোপিয় নগরের বিকাশকে স্পষ্ট দুটো ভাগে বিভক্ত করা

যায়। পুরনো শহর, এবং নতুন নগরী। পুরনো শহর মূলত অপরিকল্পিত, বিশৃংখল; অই শহরের কোতাও কোতাও সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু তা অপরিকল্পিত, আকস্মিক, এবং ব্যতিক্রম। শহরের আধুনিকায়ন ঘটে স্থাপত্যের মাধ্যমে, বলা যায় সুশৃংখল স্থাপত্যের মাধ্যমে। দেকার্ত বলতে চান, সুশৃংখল স্থাপত্য মূলত যুক্তির দান, যৌক্তিকতাবাদের পরিণতি। অর্থাৎ যুক্তির ব্যবহার ইউরোপের নতুন নগরে দ্রষ্টব্য, যুক্তির ব্যবহার ও শৃংখলা ছাড়া অই নগর ও তার ঘরবাড়ি অমনভাবে গড়ে উঠতে পারতোনা। একটা জিনিশ মনে রাখতে হবে, দেকার্ত নিজের দর্শন ও অভিপ্রায় দিয়ে স্থাপত্যের বিকাশ বুঝতে চেয়েছেন। দেকার্ত বলতে চান, 'শিল্পী নামক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেকাজে সবচেয়ে বেশি মূর্ত, সেকাজ তত 'পারফেক্ট', 'নিখুঁত'। আমরা জানি দেকার্ত নিজে অগ্রজের দর্শনের পুনরাবৃত্তি করেননি, নিজের ব্যক্তিত্বকে চারিয়ে দিয়েছিলেন দর্শনে; ফলে নতুন এক প্রস্থানভূমি থেকে তাঁর দার্শনিক অভিযাত্রা শুরু হয়েছিলো। দেকার্ত পুরনো দর্শনের সিস্টেমকে গ্রাহ্য না করে নতুন এক সিস্টেম প্রস্তাব করেন। ফলে 'সত্তা' থেকে শুরু না হয়ে, তাঁর দর্শনের শুরু 'চিন্তা' থেকে।

দেকার্ত বলতে চান, স্থপতি কেবল ভবনের নকশা করবেন না, ভবন নির্মাণও করবেন; যেরকম তিনি নিজেও, কেবল পুরনো সিস্টেম অগ্রাহ্য করেননি, নতুন সিস্টেম রচনা করেছেন। এছাড়া পারফেকশন অসম্ভব, এমনই বলেন দেকার্ত। নিজের প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে স্থাপত্যের রূপকে বারবার ফিরে গেছেন দেকার্ত। তবে 'স্থাপত্য' বিষয়ে বিশেষভাবে এটুকুই তিনি বলেন যে, আধুনিক স্থাপত্য মূলত যুক্তিশীল চৈতন্যের ফল। এই চৈতন্যের অবলম্বন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নগর ও তার স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছে।

কিন্তু স্থাপত্যে আজ যাঁরা ডিকনস্ট্রাকশনের ধারণা প্রয়োগ করছেন, তাঁদের মত উল্টো। তাঁরা বলতে চান, ঘরবাড়ি যদি 'আধুনিক' মানুষের ব্যবহার্য হয়, তাহলে আধুনিকতার কনসেপ্ট তাতে প্রযুক্ত হতে বাধ্য। আধুনিক মানুষের যদি শেকড় না থাকে, সে যদি উন্মূলিত হয়, বিচ্ছিন্নতাই যদি হয় তার নিয়তি, তাহলে কেন তা তার ঘরবাড়িভবনে প্রতীকায়িত হবে না?

ডিকনস্ট্রাকশনের প্রতি কোনো কোনো আধুনিক স্থপতির ঝোঁক ভিন্ন একটা কারণেও তৈরি হয়েছে। তা হলো, জাক দেরিদা এই নতুন ধরনের স্থাপত্যে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, এবং সেই উৎসাহ কেবল মৌখিক উচ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেরিদা অন্তত দুজন স্থপতি ও তাত্ত্বিক সম্পর্কে বিশেষত লিখেছেন—একজন পিটার আইজেনম্যান, অপরজন বার্নাড তাসুমি। বিশদভাবে দেরিদার প্ররোচনার ফলেই বার্নাড তাসুমি যুক্তি ও উন্মাদনার বিভেদ বিলোপে এতোটা উদগ্র। দেরিদা দেখেন, যে-পরাতত্ত্বের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার, তা দর্শন-সাহিত্যে তো বটেই স্থাপত্যে এসে যেন, চিরকালের জন্যে বাসা বেঁধেছে (মেটাফিজিকস ইজ হাউজড আর্কিটেকচারালি); এইটাকে যখন আইজেনম্যান বা তাসুমি ঘরবাড়ি তৈরি করে ভেঙে দিচ্ছেন তাঁর উল্লসিত হবারই কথা। দেরিদা মনে করেন, 'স্থাপত্য' হবে একটা 'সম্ভাবনা' (সামথিং টু কাম), যার কোনো অতীত মডেল, অর্থাৎ 'প্রেজেন্স' থাকবেনা : অতএব স্থাপত্য যদি পরাতত্ত্ব রচনাও করে, তাহলে

'মেটাফিজিক্স অফ অ্যাবসেন্স'। অর্থের কোনো কেন্দ্র নেই, বাচ্য সবসময়েই অনির্দিষ্ট : আইজেনম্যান বাড়ি বানিয়ে দেখান, বাড়িরও কোনো কেন্দ্র নেই।

আইজেনম্যান 'মডার্নিজম'কে মনে করেন একগুচ্ছ 'না'-র শোভাযাত্রা : এই শোভাযাত্রায় তিনি অভিভূত ও আনন্দিত, নিন্দুকদের ভাষায় এ হলো 'মেটাফিজিক্স অফ নিহিলিজম'। সেটা খুব অসত্য নয়। আর্তেগার খুব প্রভাব থাকতে পারে এই স্থপতির ওপর; কেননা আইজেনম্যান মনে করেন, 'বিষয়' বা 'ধারণা' থেকে 'মানুষ', অথবা 'মানুষ' থেকে 'বিষয়' বা 'ধারণা' যেদিন আলাদা হলো, সেদিনই আধুনিকতার সূত্রপাত। তাঁর মতে, 'মডার্নিজম' এই বিচ্ছেদকে শুধু আচরনীয় নয়, পবিত্র এক শিল্পেও পরিণত করেছে। 'মডার্নিজম' মানবিক নয়-বি-মানবিক। "হাউজ এলিভেন এ" নামে আইজেনম্যান একটা ভবন তুলেছেন, ওটা দেখলে মনে হবে ভবনটার নিচে বোধহয় অন্ধকার গর্ত আছে, যেন ঠিক মাটির ওপর নয় (ভবনের দুটো অংশ; দূর থেকে মনে হবে উপরের ও নিচের অংশ বুঝি আলাদা, ঠিক দুটো শাদা বাকশো আলগা করে রাখার মতো), এবং যেন যে-কোনো সময় ধসে যেতে পারে। আইজেনম্যান বলেন, এরকম ভবন তৈরি করে একটি জিনিশ আমি বোঝাতে চাই—তাহলো, 'খণ্ডিত বিষয়ে'র যুগে আমাদের বসবাস, বিশ্বনিখিল আজ অতোটা নিশ্চিত নেই, আর আমাদের পৃথিবী গর্তে আকীর্ণ।

বার্নাড তাসুমি নিজেকে প্রথম 'উত্তরাধুনিক স্থপতি' দাবি করেন। বলেন, আমার কথা হলো, 'স্ট্রাকচার' জিনিশটার সঙ্গে আর্কিটেকচারের যে প্রায় আক্ষরিক সম্পর্ক, সেটা ভেঙ্গে দিতে হবে। স্ট্রাকচার কোথাও যখন থাকছেনা, কেবল স্থাপত্যেই তা থাকবে কেন? 'প্যারিসের পার্ক ডি লা ভিলের' (১৯৮২-) মধ্যেও আমি স্ট্রাকচারের ধারণা ভেঙে দিয়েছি। ফর্ম ও ফাংশন (কার্য ও আঙ্গিক), প্রোগ্রাম ও কনটেকস্ট (প্রসঙ্গ ও কর্মাকল্প), এবং স্ট্রাকচার ও মিনিং (অর্থ ও অবয়ব) —বহু বহুদিন থেকে একত্রবাসী, স্থাপত্যে তা আরো বেশি করে সত্য—এবার তার বিচ্ছেদের পালা। উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য হবে উত্তর-মানবিক স্থাপত্য, বার্ণাড তাসুমি বলেন। তাসুমির কোনো কোনো নকশা 'অংকে'র মতো দেখায়, সেটাও জ্ঞানকৃত; তাসুমি বলেন, বিশুদ্ধ গণিত থেকে ফলিত গণিতের দিকে আমার যাত্রা। স্থাপত্যকে ঐতিহাসিকভাবে একটা 'হার্মনিয়াস সিনথিসিস' ভাবা হয়েছে, এই 'সিনথিসিস' তাসুমির আক্রমণের লক্ষ্য। তাসুমির তাত্ত্বিক আলাপ বেশ মনোজ্ঞ; তাঁর মতে, স্থাপত্যের ডিকনস্ট্রাকশন মূলত 'সুপারইম্পোজিশন' : অর্থাৎ বিনির্মাণবাদী স্থাপত্য একদিকে স্থাপত্যের শৃংখলার নিগড় নষ্ট করে দেবে, অন্যদিকে তাতে ব্যবহৃত হবে সিনেমা, সাহিত্য, সমালোচনার বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও প্রত্যয়; কেননা স্থাপত্যের সঙ্গে অন্য ডিসিপ্লিনের অসদ্ভাব অকাম্য, কেননা গত দু-দশকে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের পিউরিটান স্বাতন্ত্র্য ও এককত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সিনেমায় যদি দর্শন ও মনোবীক্ষণ স্বাতন্ত্র্য ও এককত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সিনেমায় যদি দর্শন ও মনোবীক্ষণ যুগপৎ প্রযুক্ত হতে পারে, স্থাপত্যে হবে না কেন? মানববিদ্যার ডাঙায় দূরত্বনাশের এই প্রক্রিয়াকে তাসুমি 'ইন্টারটেকচ্যুয়ালিটি' বলেছেন (এক টেকস্ট আরেক টেকস্টের ভেতর, এক ডিসিপ্লিন আরেক ডিসিপ্লিনের ভেতর ঢুকে যাওয়া)।

চার

> আমি ভালোবাসি খেলা, আমি খেলোয়াড়। তাই হতে চেয়েছি আমি। খেলার মধ্যে দিয়ে আমি দেখিয়েছি ওটা প্রকাণ্ড এক কাজও বটে। দেখিয়েছি খেলা কতো বিভিন্নভাবে গভীর আর সিরিয়াস হতে পারে। তবে জয়ের জন্যে আমি খেলিনা।
>
> —পিটার আইজেনম্যান

ডিকনস্ট্রাকশন কোনো প্রদর্শনযোগ্য ব্যাপার, আইজেনম্যান মনে করেন না। ডিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট বস্তু, পাবলিক নয় আইজেনম্যানের সঙ্গে রসিকতা করে চার্লস য়েনকস বলেন, তাসুমির প্যারিসের কাজ দেখতে যদি ফ্রাসোয়া মিতেরাঁ আসে, তবে বলতেই হবে, ডিকনস্ট্রাকশন এখন গণসচেতনতাও তৈরি করেছে। আইজেনম্যান বলেন, ডিকনস্ট্রাকশন কি দেখা যায়? যায় না। এ হলো 'বিল্ডিং আনবিল্ডিবল আইডিয়া' অর্থাৎ যেসব আইডিয়া নির্মাণ করা যায় না, তার নির্মাণের নাম ডিকনস্ট্রাকশন

মানুষ বাড়ি বানায়, এবং সে বাড়ি সে অধিকার করে—অধিকারের এই বোধ, স্বত্বধারণা, আইজেনম্যান ধসিয়ে দেন যেন। বহুকাল ধরে মানুষ বাড়িবিষয়ে সংস্কারাচ্ছন্ন; বসবাসের অভ্যেস আধুনিক লোকেরাও বিশেষ বদলায়নি—আইজেনম্যান বাড়িঘর তৈরি করে দেখান অভ্যেসের বদল জরুরি। আইজেনম্যানের ভবনগুলো যেন ঠিক মাটিতে স্থাপিত নয়, যেনবা শূন্যে ঝুলে আছে, অথবা নিচে কোনো ভিত্তিই নেই; আধুনিক মানুষের মতো তাঁর বাড়িঘরের দেয়াল-ছাদ-খিলানগুলো আশ্চর্যভাবে ছাড়া ছাড়া, বিচ্ছিন্ন এবং বিপরীত; কোনো কোন ভবন ঠিক কম্পিউটারের মতো; কোনো কোন বাড়ির প্রবেশপথ উদ্ভট ও অস্পষ্ট। ফ্রাঙ্কফুর্টে আইজেনম্যান একটা ভবন তুলেছেন, দেখে বিভ্রম হয় যেন বড়ো বড়ো গ্রন্থ (আসলে কামরা) বিল্ডিং ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। আইজেনম্যানের ভবনগুলোর আভ্যন্তর আয়তন বাইরে থেকে বোঝা যায় না, প্রায় সবকটিই প্রচন্ডরকম জ্যামিতিক—সবক'টিতেই তির্যক রেখার নির্দেশ অদম্য, সবচেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য আতংক ও ত্রাস : তাঁর স্থাপত্য ভয় ধরিয়ে দেয়।

ঘরবাড়িতে 'বিচ্ছিন্নতা'র উপযোগ কতটুকু, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আইজেনম্যান মনে করেন, স্থাপত্য এতোকাল ছিলো খুব 'স-চেতন' একটা মাধ্যম তাতে 'অবচেতন' কখনো গ্রাহ্য হয়নি; কিন্তু 'অবচেতন' তো বড়ো একটা সত্য—সেই সত্য স্থাপত্যের মতো মানবিক কর্মে উপেক্ষিত হতে পারে না। স্থাপত্যে তা উপেক্ষিত হয়েছে কুসংস্কারের কারণে; স্থাপত্যকে ভাবা হয়েছে আশ্রয়ের নীড়, রিয়ালিটির মুরুব্বী, প্রতিষ্ঠান ও আশ্রম। কিন্তু আইজেনম্যান সেই কিংবদন্তী, যিনি সেই অসাধ্যের সাধক; ফলে একদিকে অবচেতন ও অন্যদিকে ডিকনস্ট্রাকশনের যুগপৎ তূর্যবাদক তিনি 'টেনর' বেঁচে আছে ও থাকে, কেননা ওটাই আধুনিক ও উত্তরাধুনিকের ললাটলিখন, কাজেই ঘরবাড়িকে ঘরবাড়ির বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে হবে; এইভাবে 'হার্মনি হোম' নামক বিশ্বসংঘাতক ধারণার বিপরীতে এক সৃষ্টিশীল বিনাশবাদের অভ্যর্থনা করেন আইজেনম্যান।

অদ্ভুত সব কথা বলেন এই বর্ষীয়ান ইহুদী, পিটার আইজেনম্যান। তাঁর মতে, প্রত্যেক 'আধুনিকে'র ভেতর একজন 'ইহুদী' বাস করে, 'মনোসমীক্ষণ'ও সেজন্যে এক ইহুদী প্রপঞ্চ : 'ইহুদী' মানে যে-কোথাও-বাস-করে বটে, কিন্তু তা তার অভিপ্রেত [illegible]

নয়. সে অন্য এক আবাসের স্বপ্ন দেখে. অন্য এক বাসভূমের সে যাত্রিক। সেজন্যে 'ইহুদী' কোনো ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের নাম নয়—'ইহুদী' এক অভ্রান্ত প্রতীক. অনিকেত আধুনিক মানুষের প্রতিবিম্ব। 'ইহুদী' মানে সকল আধুনিক মানুষের 'দুর্জ্ঞেয় অবচেতন'। এই অবচেতনকে মানুষ ভয় পায়, এই ছায়ার মুখোমুখি সে হতে চায় না : পিটার আইজেনম্যান অদ্ভুত সব বাড়িঘর তুলে অই অবচেতন, অই ছায়া, অই 'ব্যক্তিগত ইহুদী'র মুখোমুখি করে দেন আমাদের।

ইসাবেল আলেন্দে

[ম্যাসিডনের উইস্কনসিন য়ুনিভার্সিটিতে , ১৪ মার্চ ১৯৯১. ইসাবেল আলেন্দের একটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা, লাতিন আমেরিকার রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ে; সেদিনই আমরা তাঁর একটা সাক্ষাৎকার গ্রহণের সংকল্প করি। কিন্তু ওদিনের আবহাওয়া ছিলো খুব খারাপ, বৃষ্টি আর বরফে জবুথবু অবস্থা; বক্তৃতার অল্প আগে ইসাবেল আটকা পড়েন শিকাগো বিমানবন্দরে ; সেদিন ইসাবেল আলেন্দের সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় না। বর্তমান সাক্ষাৎকার আমরা নিই ওই ঘটনার দু-মাস পর, মুখোমুখি নয়, দূরভাষে; সদ্য এক সফর শেষে যখন তিনি ফিরেছেন তার বাড়িতে, ক্যালিফোর্নিয়ার সান রাফায়েলে

ভেনিজুয়েলার ক্যারাকাসে দীর্ঘ পনের বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর ইসাবেল আলেন্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস শুরু করেন। পেরুর লিমা অঞ্চলে তাঁর জন্ম, তাঁর বাবা ছিলেন একজন ডিপলোম্যাট। ছোটোবেলায় ইসাবেল চিলিতে দাদা-দাদীর বাড়িতে ছিলেন। দাদার নাম আগুস্টিন লুনা এবং দাদীর নাম ইসাবেলা; ইসাবেল আলেন্দের প্রথম উপন্যাস 'প্রেরণার বাসভূমে' (১৯৮২)–এ বইতে তাঁর দাদা আগুষ্টিন এক বড়ো প্রেরণা। ইসাবেল বহু জায়াগায় ছিলেন, থাকতে হয়েছে বলে; তাঁর বাবা পেশাসূত্রে নানা স্থানে বদলি হতেন, সেজন্যে তাদের বারবার জায়গাবদল করতে হতো—যেমন বলিভিয়া, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরিণামে ইসাবেল লেবানন ছেড়ে সান্তিয়াগো চলে যান, সান্তিয়াগোতে তাঁর স্কুলজীবন সমাপ্ত হয়, এবং তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনে কাজ করেন। তারপর চিলির দূরদর্শনে তিনি জার্নালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন; বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তাঁর রচনাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়; মহিলা বিভাগে একটা কলাম লিখে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন; লিখলেন নাটক, এবং শিশুদের জন্যে অনেকগুলো গল্প। ১৯৭০ সালে তাঁর চাচা সালভাদর আলেন্দে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু মাত্র তিনবছর পর এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাবদল হলো, ইসাবেলের জীবন তখন বিপন্ন। অবশ্য অভ্যুত্থানের পরও মাসকয়েক তিনি চিলিতেই ছিলেন। এরপর চিলি ছেড়ে তিনি ভেনিজুয়েলা যান, এবং ওখানেই তিনি চারটি বই লেখেন: (১) "প্রেরণার বাসভূমে" (১৯৮২); (২) "বিষয় প্রেম বিষয় দুঃখ" (১৯৮৪); (৩) " ইভা লুনা "(১৯৮৮); (৪) "ইভালুনার গল্পমালা" (১৯৯১)।

ইসাবেলের সঙ্গে কথা বলবার সময় দুটো ব্যাপারে আমরা খুব কৌতূহলী ছিলাম: (ক) লাতিন আমেরিকার রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, (খ) নিজের লেখার সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক; কিন্তু ইসাবেল বার বার বলেছেন, চিলি বা লাতিন আমেরিকার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর লেখার কোনো সম্পর্ক নেই। ইসাবেল নিজের লেখাকে বলেছেন 'অকাল মৃত্যু অবধি এক স্মৃতিচারণ'। 'প্রেরণার বাসভূমে' (১৯৮২) উপন্যাসের শুরুতে একটা চিঠি আছে, সেই চিঠিতে ইসাবেল তাঁর গল্প বলেছেন। সেটা ভেনিজুয়েলার নির্বাসন থেকে চিলির দাদুকে লেখা একখানা পত্র। ব্যাপারটা এমন দাদার বয়েস একশো বছর, তিনি মৃত্যুবরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেজন্যে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছেন। ইসাবেল বলতে চান, চিলিতে তাদের যে যৌথ-অনুপ্রাণিত জীবন তা বিস্মৃত হওয়া যাবেনা, কেননা, বিস্মরণ মানেই মৃত্যু।

ইসাবেল আলেন্দের রচনামালায় তার পরিবারের প্রভাব ও প্রেরণা ভিন্ন একটা সৌরভ তৈরি করেছে। আলেন্দে বারবার বলেন, তাঁর লেখা বিবেচ্য হতে পারে কেবল সাহিত্য হিশেবেই, রাজনীতির নিরিখ তাতে অকাম্য, এবং অবাঞ্ছিত।]

প্রশ্ন : আমাদের ধারণা আপনি কি লিখেছেন সেটা দিয়ে শুরু না করে জিগেশ করা উচিত, আপনি কি লেখেননি? এমন তো হতেই পারে বহু কিছু লেখা হয়নি, সুযোগ হয়নি বলে কিংবা লেখাই অসম্ভব ছিলো

উত্তর : আমি লেখা শুরু করি অনেক দেরিতে। চল্লিশ বছর বয়েসে। তখন মনে হয়েছিলো চল্লিশটা বছর আমার গোল্লায় গেছে।কতো কিছু লেখার ছিলো কতো কিছু বলার। তবে এমন কখনো হয়নি যে খালি পৃষ্ঠা নিয়ে বসে আছি টেবিলের ওপর, প্রহরের পর প্রহর গড়াচ্ছে, কি লিখবো ঠিক করতে পারছিনা। উল্টো লিখতে গিয়ে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়েছে, কাটছাট করতে হয়েছে, শেষবারের মতো বাছাই করতে হয়েছে। অনেক কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে এই রকম একটা অনুভূতি আমার সবসময়েই আছে, সেজন্যে বহু বিষয়ে অফুরন্ত লেখার প্রেরণা আমার মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান। এর ফলে এমন হয়েছে গল্প আমি নির্বাচন করি না, গল্পই আমাকে নির্বাচন করে। চরিত্র বা প্লটকে মনে রেখে একথা বলছিনা, এ আমার চার পাশের বাতাসের মধ্যেই আছে, এবং আমার দরোজায় তা অবিরাম হানা দিচ্ছে। যেহেতু বেশিক্ষণ সাড়া না দিয়ে থাকা সম্ভব নয়, ফলে আমার একটাই কাজ বসে যাওয়া এবং লিখে ফেলা।

প্রশ্ন : আপনি কি আরো কোন মাধ্যমে কাজ করার আগ্রহ বোধ করেছেন?

উত্তর : অল্প বয়েসে আমি থিয়েটারের নাটক লিখেছি এবং সে নাটক নিয়ে আমার ভারি একটা মমতা ছিলো; টীমের মধ্যে কাজ করতে ভালো লাগতো আমার, কেননা, কাজটা কারো একার নয়, কেবল আমিই দায়বদ্ধ নই–দায়িত্বটা সবার মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। চাইলেই অভিযোগ চাপানো যায় পরিচালক বা অন্য কারো ওপর। কিন্তু যখন আমি গল্প লিখি বা উপন্যাস, তার জন্যে তো কাউকে অভিযুক্ত করতে পারিনা, সব দায়ভার আমার । শিশুদের জন্যে গল্প লিখতে চেয়েছিলাম আমি যখন আমার বাচ্চারা ছিলো ছোট, এবং প্রতিরাতে তাদের আমি গল্প বলতাম । বহুবছর ধরে আমি ব্যঙ্গরচনা লিখেছি; আমার মনে হয় সে ধরনের লেখা সব থেকে কঠিন। মনে হয়না সেরকম কখনো লিখতে যাবো; খুব কঠিন মাধ্যম। কখনো কবিতা লেখার চেষ্টা করিনি, ভবিষ্যতে করবো বলে মনে হয়না।

প্রশ্ন : আপনি কবিতা পড়েন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি পাবলো নেরুদার খুব অনুরাগী। আমার বিশ্বাস একজন কবি ছ'লাইনে যা প্রকাশ করেন, তা বলার জন্যে আমার ছ'শো পৃষ্ঠা দরকার হয়।

প্রশ্ন : একটু আগে বললেন অনেক কিছু আপনার লেখার আছে, এবং তা বাছাই করার প্রয়োজন আছে : প্রশ্ন করি, আপনার বাছাইয়ের ভিত্তি কি?

উত্তর : আবেগ। প্রবল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। উপন্যাস একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া, উপন্যাস লিখতে গেলে টাইপরাইটার অথবা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে হয় মাসের পর

মাস, বছরের পর বছর। কাজেই কমিটেড না হয়ে উপায় নেই: যে গল্প লিখবো সে বিষয়ে প্রবল আবেগ এবং ভালোবাসা থাকতে হবে। সেই প্রেম এবং আবেগ ছাড়া কাজ করা অসম্ভব। অন্তত, আমার ক্ষেত্রে তো বটেই। আমি খুব পরিশ্রমী, এবং আমার নিয়মশৃংখলাও আছে, তবু আবেগটাই দরকার, আমি জানি, আমার সবগুলো বই প্রবল প্রচণ্ড আবেগের শস্য, সে আবেগ দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে আমার মধ্যে কাজ করে গেছে। ওই আবেগ আমাকে, আমার কাজ, গল্প ও উপন্যাসকে, এগিয়ে নিয়ে গেছে; তার ফলেই শক্তিবোধ করেছি আমি, এবং সুদীর্ঘ পীড়নবহুল স্বেদাক্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পেরেছি।

প্রশ্ন : তার মানে প্রত্যেকটা ভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ আপনার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার দ্বারা আনুপূর্ব আপনি চালিত হয়েছেন।

উত্তর : হ্যাঁ। আমার প্রথম বইয়ের কথা (প্রেরণার বাসভূমে) বলতে পারি। সে বই জন্মেছিলো এক প্রচন্ড আবেগের ঝরনামুখ থেকে, যাকে বলতে পারি নস্টালজিয়া, স্মৃতিবেদনা। আমি চিলি ছেড়েছিলাম এবং নির্বাসিত জীবনে উপনীত হয়েছিলাম, স্বাভাবিকভাবে পূর্বজীবনের প্রতি যে কাতরতা এবং ব্যাকুলতা , সেটাই আমাকে দিয়ে ওবই লিখিয়েছে। আমার দ্বিতীয় বই (বিষয় প্রেম বিষয় দুঃখ) ক্ষোভ এবং বিষাদের শস্য, একনায়কতন্ত্রের অপব্যবহার আমাকে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ করে। 'ইভা লুনা' উপনাসের পেছনে কার্যকর একটা ইতিবাচক অনুভূতি; সেই অনুভূতি আমার একটা আবিষ্কার: নারী হওয়ার কারণে নিজেকে নিজের ভালো লাগা; কেননা আমি চেয়েছি কেবল পুরুষ হতে; আমার তখন মনে হতো পুরুষ হওয়াটাই সবচেয়ে ভালো; চল্লিশে পা দিয়ে বুঝি, পুরুষেরা যা করে তার সবই আমি করেছি, কিছু-বা বেশি করেছি, এবং আমার জীবন চরিতার্থ। 'ইভা লুনা' উপন্যাসে এই গল্পটাই আমি বলেছি। অন্যদিকে আমার যে সাম্প্রতিক গল্পসংগ্রহ "ইভা লুনার গল্পমালা" তাতে কার্যকর ভিন্নধরনের একটা আবেগ। এমন কিছু থেকে এগুলোর জন্ম যা খবরের কাগজে আমি পড়েছি।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় উপন্যাসে ইভা লুনার যে কণ্ঠস্বর আমরা পাই, এবং গল্পগুলোতে তার যে কণ্ঠস্বর, দু'য়ের মধ্যে তফাত আছে?

উত্তর : আমার ধারণা গল্প এবং উপন্যাস দু'ক্ষেত্রে তার কণ্ঠস্বরই আছে, যদিওবা গল্পগুলোতে ইভার কণ্ঠস্বর আরো পরিণত। এর কারণ এ-ও হতে পারে যে আমি নিজেও তো বড়ো হয়েছি, বয়স্ক হয়েছি, তিন বছর ধরে আমি বাস করছি একটা ইংরেজি ভাষী দেশে, এদেশে প্রথম যখন আসি, তখন ইংরেজি বলতে রেস্তোঁরার ইংরেজিই আমি জানতাম। যদিও সত্যি হলো, আমি সবসময়েই ইংরেজিতে কথা বলেছি। ইংরেজি ছবি দেখেছি, ইংরেজি খবরের কাগজ পড়েছি, এ সবের মধ্যে দিয়ে আমার ভাষার এ্যাপ্রোচে বদল ঘটেছে। ইংরেজি খুবই সংক্ষিপ্ত খুবই প্রাগমেটিক ভাষা; স্প্যানিশ অনেকটা চারুময়। যখন লেখার ক্ষেত্রে একটিমাত্র আয়ুধই সম্বল, এবং তা হলো ভাষা, এবং আপনি সেই আয়ুধ, ব্যবহারের প্রক্রিয়া শেখেন ভিন্নভাবে, তখনি কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে, আমি ঠিক জানিনা এটা কি বা কেমন, কিন্তু একথা সত্য যে , এটা এমন কিছু যা গভীরভাবে শিকড়িত এবং যা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। আমি মনে করি ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পেবিধৃত বাস্তবতার এ্যাপ্রোচও বদলায়।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে, আপনি এখন ভিন্নধরনের পাঠকদের জন্যে লিখছেন?

উত্তর : না। আমি আগেও, এবং এখনও, একজনের জন্যেই লিখি, তিনি আমার মা।

প্রশ্ন : কাজেই ভাষার পরিবর্তন তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

উত্তর : ভাষার পরিবর্তন আসলে আমার নিজের ভিতরে: সেটা আমি বুঝতে পারলাম "ইভালুনার গল্পমালা"র (১৯৯১) ইংরেজি অনুবাদ যখন বার হলো এবং আমি পড়লাম। প্রথমে এ বই স্প্যানিশে বার হয়। বইটি কয়েক বছর ধরে কেবল লিখেই গেছি, মনোযোগ দিতে পারিনি। মনোযোগের জন্যে সময়ের যে দূরত্ব দরকার সেটা হয়নি। বইটির দিকে তাকাতে পারিনি, পড়িও নি কখনো, ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ার পর সেই অবকাশ এলো, এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি বই আমি আবিষ্কার করলাম। ইংরেজিতে বইটি পড়ে বুঝলাম এর ভেতরে অনেক অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে আপনার অনুবাদক কি অন্তরঙ্গ? বলছি এজন্যে যে মার্গারেট সিয়ারস পেডেন আপনার কয়েকটি বই অনুবাদ করেছেন।

উত্তর : না। মার্গারেটের সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে কাজ করি না, তিনি তাঁর কাজ করেন, বেশ দরদী ও সহানুভূতিশীল: আমাকে পড়তে দেন, আমি পড়ি, কিন্তু কোনো পরামর্শ দিতে পারিনা, কারণ আমার ইংরেজি জ্ঞান তো খুব ভালো নয়।

প্রশ্ন : ইভা লুনা বলে, সে সেই ধরনে লেখে যে ধরনের জীবন তার পছন্দ ; আপনি কি মনে করেন ইভা লুনার গল্পগুলো ইউটোপিয়ান ?

উত্তর : ইউটোপিয়ান ? না। আমার ধারণা গল্পগুলো অত্যন্ত বাস্তব। বাস্তব মানুষ এবং বাস্তব জিনিশ নিয়ে আমি লিখেছি, লিখেছি যা ঘটেছে তা ই নিয়ে, যা খবরের কাগজে পড়েছি, যা টেলিভিশনে দেখেছি, কিংবা শুনেছি লোকজনের মুখে। একটাই চেষ্টা, গল্পের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করা ; কোনো একটা লক্ষ্যে। ইভা লুনা যখন বলে যে, সে সেই ধরনে লেখে যে ধরনের জীবন তার পছন্দ, তখন সে আসলে বলতে চায়, যা কিছু গভীরভাবে শিকড়িত তা বুঝতে শেখো, দেখো প্রত্যেক মানুষ আর ঘটনার অন্তরালে আসল কি জিনিশ লুকিয়ে আছে

প্রশ্ন : আপনি একবার বলেছিলেন ,বিপ্লব হলো সবসময়েই একটা ভালোবাসা। আমি খুশি হবো যদি আপনি ওবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন। আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আপনার ধারণাও আমরা জানতে চাই

উত্তর : দুটো বিষয় আলাদা। রাজনৈতিক বিপ্লব আসলে ভালোবাসার ফল; বিপ্লব একটা সম্পূর্ণ কমিটমেন্ট। কোনো কিছু জন্যে নিজেকে ত্যাগ করা, উৎসর্গ করা, এমন হতে পারে যে, যার জন্যে জীবন উৎসর্গিত হলো তার ফল দেখে যাওয়া সম্ভব হলোনা। বিপ্লব মানে লড়াই, একটা ভয়াবহ জীবন বেছে নেওয়া: কারণ বিপ্লবীর স্বপ্ন 'পরিবর্তন'— নিজের জন্যে নয়, অন্য মানুষের জন্যে। দেখা যায়, যারা বিপ্লব করেন তাদের নিজের জীবন বেশ সুখী স্বচ্ছন্দই ছিলো, তারা হয় 'ছাত্র' অথবা 'মধ্যবিত্ত', কিন্তু ওটা পরিত্যাগ করে তারা সহিংস জগতে পা বাড়ান, এবং এভাবে সর্বস্ব উজাড় করেন, এবং এভাবে তাদের মৃত্যুও হয়। সেজন্যে আমার মতে বিপ্লব একটা ভালোবাসা, এবং বেশ

বিরাট, মহান, চরম ভালোবাসা। বিপ্লবের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো, ভালোবাসা প্রাণিত বিপ্লবীরা যদি সফল হয় তাহলে তারা হয়ে ওঠে অটোক্র্যাট, নিষ্ঠুর; তারা চলে আসে পাওয়ারের কেন্দ্রে, তখন তারা আর বিপ্লবী নয়, ক্ষমতা নিয়ে আমরা তখন একই সমস্যায় পড়ি, এবং সেটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়।

আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে বলি। দেখুন, আমি ধর্মীয় লোক নই; কোনো চার্চেরও না; তবু সারাজীবন এক বিভ্রম, এক মধুর ইন্দ্রজাল, আমাকে তাড়া করেছে। সেটা আর কিছু নয়, আমার দাদীমা, আমার সঙ্গে আমার দাদীমার বসবাস। আমি তরুণী থাকা অবস্থায় দাদীমা মারা যান। আমি তখন ছোট্ট একটি মেয়ে। দাদীমা ছিলেন সুন্দরী মহিলা, আকর্ষণীয়া, সুরসিকা, ছিলেন খুব সৃষ্টিশীল আর কল্পনাময়ী, এমন এক মানুষ, যার জীবন চমৎকার একটা বিষয় হতে পারে কোনো বইয়ের কিন্তু জগতে বাস্তবভাবে নির্ণেয় নয় যাঁর জীবন। দাদীমা অল্পবয়সে মারা যান। দাদীমা চাইতেন তাঁর ইমেজ জীবন্ত হোক, বা জীবন্ত থাকুক উত্তরকালে; আমার মনে হয় যে, সে-চেষ্টায় তিনি বেশ সফল হয়েছেন, কেননা তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশটা বছর কেটে গেলো, অথচ আমার ধারণা তিনি এখনো আমার সঙ্গে বাস করছেন। এইটে আমার একটা ধারণা এবং বিশ্বাস; যে বিশ্বাসের কারণে আমি ভাবছি এবং ধরে নিচ্ছি যে, তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলছে ও চলবে। এই ধারণা থেকেই আমার জীবনবোধ তৈরি হয়েছে এবং আমার জীবনভাবনায় এই বোধটাই আমি সম্প্রসারিত করেছি। আমি মনে করি এর ভেতর একটা প্রেরণা রয়ে গেছে, এমন একটা প্রেরণা যার আবেষ্টনীতে প্রতিবেশ ও পরিপার্শ্ব মুখর, সে প্রেরণা প্রাণীতে নক্ষত্রে পতঙ্গে লোকালয়ে জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে; আমি ওই প্রেরণার সংস্পর্শে থাকতে চাই। প্রাচীন ইন্ডিয়ানদের মতো আমার বিশ্বাস, চারপাশে কোনো কিছু যদি আমি ধ্বংস করি, তাহলে তা আমার দিকেই ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : আমাদের মনে হয় আপনি দুটো বিষয়ে কথা বললেন, সে দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ বোধ হয় আছে: আপনার কাছে বিপ্লব তখন অবাঞ্ছিত, যখন তা প্রাতিষ্ঠানিক; আর ধর্মও অবাঞ্ছিত, যখন তা আনুশাসনিক।

উত্তর : হতে পারে। ওভাবে কখনো ভাবিনি।

প্রশ্ন : আমাদের মনে পড়ে আপনার 'প্রেরণার বাসভূমে' উপন্যাসের সূচনাংশ যে খানে নিভিয়া বলছে যে, সে ইশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক চায়, তাই আনুশাসনিক ধর্মের তার প্রয়োজন নেই

উত্তর : প্রথাগত ধর্মের কোনো দরকার পড়েনা আমার; চার্চে আমি খুব বিরক্ত, মা তাই বলে 'তুই হলি একটা পুরনো ফ্যাশনের নৈরাজ্যবাদী।'

প্রশ্ন : একেবারে খাঁটি কথা। আচ্ছা চিলিতে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তার সঙ্গে আপনার লেখার সম্পর্ক কেমন?

উত্তর : আমার শেষ দুটো বইয়ের সঙ্গে চিলির কোনো সম্পর্কই নেই। তবে ছোটগল্পসংগ্রহের একটা গল্পের সঙ্গে চিলির যোগ আছে, সে গল্প দুজন যুবাপুরুষ সম্পর্কে, যারা নিগ্রহের শিকার। দুজনেই একসময় আবিষ্কার করে যে তারা এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছে, যখন তারা ছিলো একসঙ্গে বিছানায়; তারা পরস্পর মিলিত হতে

চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। এই গল্প চিলিবাসীদের নিয়ে, চিলির সেইসব মানুষ, যাদের আমি জানতাম। অন্য গল্পগুলো চিলি নিয়ে নয়, চিলির ভিত্তিতে নয়; চিলিতে আমি ছিলাম বিশ বছরের কম, অবশ্য এখনো নিজেকে চিলিরই একজন আমার মনে হয়; কিন্তু চিলিতে বর্তমানে যা ঘটছে, তার মধ্যে তো আমার অংশগ্রহণ নেই। চিলিতে নতুন গণতন্ত্রের জন্ম-প্রক্রিয়া চলছে, সতের বছরের ভয়াবহ ডিক্টেটরশিপের পর; কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, ওতে আমার অংশগ্রহণ নেই। আমি তো চিলির জন্যে কিছু করছিনা।

প্রশ্ন : কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গ্রুপ চিলিকে সমর্থন করে তাতে আপনার সমর্থন নেই?

উত্তর : কেন থাকবেনা? অবশ্যই সমর্থন আছে। যেমনটি আছে এল সালভাদরের জন্যে, নিকারাগুয়ার জন্যে, হিউম্যান রাইটের জন্যে, নারী-অধিকার ও নারীমুক্তির জন্যে, এতএব বুঝতেই পারছেন সমর্থন কেবল চিলি হওয়ার জন্যে নয়।

প্রশ্ন : আমি প্রশ্নটা তুলছি ভিন্ন কারণে, কারণ হলো সমালোচকেরা চিলি এবং আর্জেন্টিনার শিল্প ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কথা বলেন। এই ভিন্নতা বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানলে, এবং তার শেকড় বাকড় খুলে দেখালে, সুবিধে হয়। কেননা দেখা যায়, চিলির ঘটনাপরিস্থিতি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে প্রভাব ফেলে, যে প্রতিক্রিয়া জাগায়, আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে সেই প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ঘটেনা, শিল্পসাহিত্যে সে প্রভাব দেখা যায়না।

উত্তর : এই যুক্তি তো আমার অবোধ্য। পার্থক্য কেন হবে আমি বুঝতে পারছিনা। আর্জেন্টিনা তো এমন দেশ যেখানে শিল্পকলা খুব শক্তিশালী, বিশেষত থিয়েটার; এবং সাহিত্য ওখানে অনেকদিন থেকে খুব সমৃদ্ধ। লাতিন আমেরিকার অনেক উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রের নির্মাতা ওরাই। সেক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা চিলির চেয়ে উত্তম। চিলি হলো কবি এবং কবিতার দেশ। আমার মনে হয় এতো দ্রুত বিচার দেওয়া, পার্থক্য বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া, ঠিক এখনি এর কোনো দরকার নেই। কারণ সবেই তো বেরিয়ে এলাম আমরা সামরিক জান্তার দীর্ঘ করতল থেকে। আমার মনে হয় এটা নিয়ে উপন্যাস লিখে ফেলা কিংবা বাস্তবের পুনঃসৃষ্টি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। লেখা যেতে পারে ডক্যুমেন্টারি টেষ্টিমনি অবিকল আলেখ্য, যা ঘটেছে তার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ; কিন্তু চিলির ঘটনা নিয়ে মহৎ উপন্যাস লেখা অসম্ভব। চিলির সঙ্গে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ; এতো তাড়াতাড়ি এ কাজ পারা যাবেনা। আরো দূরত্ব, আরো ব্যবধান দরকার। ওই দূরত্ব এলে মহৎউপন্যাসের জন্ম নিশ্চিতভাবে হবে, এবং সেই উপন্যাসে থাকবে আয়রনি, রহস্য, কূটাভাস। কারণ এগুলো ভালো উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত।

আমি ভাবতে চাই চিলির সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি নিয়ে, চিলিতে এই এখন যা ঘটছে। চিলিতে একটা সাড়া আছে, এবং ছিলো; সতের বছরের দীর্ঘ অটোক্র্যাটিক রেজিম-এ ওখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছে, যদিও তা ছিলো আন্ডারগ্রাউন্ড। এই আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পসংগত এক্সচেইনজ-এ এসেছে। তবে পুরো ব্যাপারটি বড়ো পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখবার বুঝবার ভাববার দরকার আছে।

প্রশ্ন : আপনি তো বললেন চিলিতে, বিশেষত লাতিন আমেরিকায়, অনেকরকম সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে; আরো বললেন যে, এখন আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী—লাতিন

আমেরিকার নয়; কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কি আপনি বলবেন যে, আপনার সাহিত্যিক সম্প্রদায়, কিংবা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ও, পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন কি তবে আপনি নতুন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ?

উত্তর : এটা কিন্তু একেবারে আলাদা একটা প্রশ্ন । কারণ আমি আপনাদের বলেছি যে, এখানে এই দেশে আমি বেশ সুখে আছি। সুখী, কেননা, আমার একজন অসাধারণ স্বামী আছে, এবং আমি বেশ ভালোভাবে গৃহীতও হয়েছি। আমার তো মনে হয় মানুষের সঙ্গে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি যুক্ত। ভেনিজুয়েলাতেই বরং আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম, যদিও তা লেখকের জন্যে খুব খারাপ কিছু নয়। অন্যদিকে এখানে আমি মাইনরিটি ও মার্জিনাল, এবং বিদেশী; এবং সবসময়ে বিদেশী রয়ে যেতে হবে আমাকে; বিদেশী, ভাষার দিক থেকে, সংস্কৃতির দিক থেকে, জীবনযাত্রার প্যাটার্নের দিক থেকে, মূল্যবোধের দিক থেকে, সবদিক থেকে, এবং এটাও একজন লেখকের জন্যে খারাপ কিছু নয়। কেননা এর ফলে তাকানো যায় নির্ধারিত দূরত্ব থেকে, ইচ্ছে মতো সব আয়রনি গ্রহণ করা যায়। লেখকের জন্যে তো বটেই, যে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের জন্যেও এটা প্রীতিকর। তাছাড়া আমি আমার মহাদেশটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি, এবং দূরত্ব থাকার কারণে সেটা মন্দ নয়। উপরন্তু আমি নিত্য যাওয়া আসা করছি লাতিন আমেরিকায়, তাই আমার সম্পর্ক কোনো না কোনোভাবে রয়ে যাচ্ছে। ঘরে এখনো আমি স্প্যানিশ বলি, তাছাড়া স্প্যানিশ আমার লেখার ভাষা। পুরো ব্যাপারটা সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

প্রশ্ন : আপনি বলতে চান, এ দূরত্ব ভালো, যদিও মাঝে–মধ্যে ঘটনা পরিস্থিতি লক্ষ করেন আপনি

উত্তর : আমার বক্তব্য হলো, যতোক্ষণ না আমি গজদন্তমিনারবাসী হচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত এটা ভালো। আমি সবসময় থাকছি একটা অনিশ্চিত জায়গায়, এমন দেশে, যে-দেশটা আমার নয়—ব্যক্তিগত জীবনে এর একটা চাপ—উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক; আমার কথা, কেবল এইটুকু যে লেখার জন্যে এটা মন্দ নয়। অনিরাপত্তা উৎকণ্ঠা প্রেশার এইসব দরকার আছে। ব্যাপারটা এমন যে কিছুই নিশ্চিত নয়, প্রশ্ন আছে অনেক কিন্তু কোনো জবাব নেই; যদি মনে হয় জবাব আছে, তাহলে সেটা হবে, ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক।

প্রশ্ন : এই ক'বছরে আপনার পাঠকের সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হলো?

উত্তর : হ্যাঁ পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। গতকাল আমার এজেন্ট জানালো, তুরস্কে আমার দুটো বইয়ের পাইরেট সংস্করণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে, ভিয়েতনামেও একটা বইয়ের পাইরেট সংস্কণ হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, আমার বইপত্র দূরদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তবে আমার অডিয়েন্স খুব বদলায়নি বলে ধারণা। আমার অডিয়েন্স মূলত তরুণরা, তাও মেয়েরা নয় ছেলেরা, সাধারণত খুব বয়স্ক, এবং খুব তরুণরাই, আমার লেখা পড়ে। তবে এর মাঝামাঝি যে বয়সটা সেই বয়সের লোকেরা আমার লেখা পড়েনা। অনেক জায়গা বক্তৃতা করেছি তো, তাই অডিয়েন্স বিষয়ে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

প্রশ্ন : তরুণ বলতে আপনি কাদের কথা বলছেন? যাদের বয়স বিশ কিংবা তার নিচে?

উত্তর : যাদের বয়েস বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তাদের কথা বলছি। এদের অধিকাংশ ছাত্র, এবং খুব তরুণ। মেয়েরাও আছে, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ধরনের; তাদের সামাজিক শ্রেণীও বিচিত্র। এদেরকে আমি জানি, কেননা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বক্তৃতা-সফরে এদেরই চোখে পড়ে। তবে লেখার সময় এদের কথা আমি ভাবিনা। বিপুল পাঠক সম্প্রদায়ের কথা ভেবে কিন্তু আমি লিখিনা। একেবারেই না। কেবল একজনের কথা মনে রেখেই আমি লিখি এবং সেই একজনকে উদ্দেশ্য করেই আমি আমার গল্প বলে যাই, আমার ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে। লক্ষ্য থাকে গল্পটা যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়, উপভোগ্য হয়; তাছাড়া আমি চাই পাঠকের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নে অংশগ্রহণ করতে। দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন : 'দেখো, এই-ই হচ্ছে। এবার চেষ্টা করে এর অর্থ খোঁজো, ভেবে দেখো এর ভেতর 'সত্য' আছে কিনা'।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে একজন বিদেশীর মতো আপনার বসবাস, কাজেই এখানকার জীবনের সঙ্গে আপনার দূরত্ব রয়ে গেছে, যে-রকম দূরত্ব লাতিন আমেরিকার সঙ্গেও রয়েছে আপনার। এই দুই পরিপ্রেক্ষিতের ফলে, ভবিষ্যতে, আপনার লেখার বিষয় বদলাবে কি? লেখার লোকেশনের কথা বলতে চাইছি, আপনি যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিতে গল্প লিখবেন কিনা?

উত্তর : মনে হয় লিখবো। হ্যাঁ লিখবো। ভেনিজুয়েলায় ১৩ বছর কাটিয়ে এইরকমই তো হয়েছে; আমি "ইভা লুনা" লিখেছি, এবং এরকম আরো অনেক গল্প—একই পরিবেশের। কাজেই আগে-পরে, নিশ্চিত, আমি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে লিখতে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এ-নিয়ে কিছুটা দুঃখিত?

উত্তর : দুঃখিত? না, একেবারেই না। বরং উল্টো। দেখুন একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়; চ্যালেঞ্জটা হলো, প্রত্যেকটা বই ভিন্ন হওয়া চাই। প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতিটি বিষয় নতুনভাবে আবিষ্কার করা চাই। এই কাজ থেকে শেখার কিছু নেই, কেবল ভাষাটা ছাড়া। 'লেখা' এমন একটা 'জব', যেখানে সবকিছু জন্ম নেয় নতুন করে। সেজন্যে আমার দেশ বা আমার বিদেশ সম্পর্কে, এই বাস্তবতা বা ওই বাস্তবতা সম্পর্কে, লেখা একটা চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কি!

প্রশ্ন : লিখতে গিয়ে যখন দেখেন আপনি আপনারই ভুবনের ভেতর আরেকটা ভুবন তৈরি করছেন, কিংবা সৃজ্যমান ভুবন মিলে যাচ্ছে প্রাক্তন বৃত্তের সঙ্গে, তখন আপনার খারাপ লাগে না?

উত্তর : আমার মনে হয়, এধরনের চিন্তা খানিকটা কৃত্রিম। আমার একটা অস্বস্তি হয়, যখন লোকেরা আমার আগের বইগুলোর চরিত্রসমূহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। যেমন 'এই লোকটার কি হয়েছিলো'? 'ইভা লুনা'য় রিয়াদ হালাভি-র সঙ্গে কি হলো'? 'দি হাউস অফ দি স্পিরিটস'-এর এ্যালবা পরিণামে পৌঁছুলোনা কেন?' ইত্যাদি। সাহিত্যভুবন বিরাট এক সমস্যা এজন্যে যে, তার স্রষ্টা আপনি নিজে, এবং সব আপনিই করেন; সকল সিদ্ধান্ত আপনার, এবং আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চরিত্রগুলোকে জানেন। কিন্তু অন্য দিকে এটা কৃত্রিমও, কেননা আমি তো সর্বদা এঁকে চলেছি বাস্তবতার প্রতিকৃতি। চরিত্র নয়, বাস্তবতা। সেজন্যে যা আমি লিখেছি এবং যে ভুবন সৃষ্টি করেছি, তার সঙ্গে কালের নিয়মে বাস্তবতার দূরত্ব যদি তৈরি হয়ে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তিগত গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদই আমার বাঞ্ছিত; কেননা আমি সবসময় বাস্তব মানুষ সম্পর্কে কথা বলতে

চাই।

প্রশ্ন : আপনার বইপত্র তো খুব বিকোয়, ধরে নেয়া যায় বেস্ট—সেলিং সাক্ষাৎকারেরও আপনি জনয়িত্রী হবেন। 'সাহিত্যিক সাক্ষাৎকার' সম্পর্কে কিছু বলবেন কি, যেমন ধরুন, কেন লোকেরা এধরনের সাক্ষাৎকার বিষয়ে এতো উৎসাহী?

উত্তর : এ—বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ, কেননা আমি কখনো সাক্ষাৎকার পড়ি না। আমি তো রিভিয়্যুও পড়িনা। কোন্ লেখক কি বলছেন, তা নিয়ে আমার একেবারেই উৎসাহ নেই, আমি পড়তে চাই তাদের লেখা। ম্যাজিশিয়ানের যাদুটাই আমি দেখতে চাই, যাদুর কলকবজা নয়। ব্যালে দেখতে গিয়ে আমি ভাবিনা, ওরকম লম্ফঝম্ফ কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, তার পেছনে কী পরিশ্রম বা অনুশীলন রয়ে গেছে!

প্রশ্ন : কিন্তু পাঠকরা তো গল্পের মতোই সাক্ষাৎকার পড়ে।

উত্তর: তাদের ফিকশন পড়তে দিন, ইন্টারভিউ নয়। আমি অনেক সাক্ষাৎকার দিয়েছি, যেসব সাক্ষাৎকারে আমার ব্যক্তিগত জীবনসংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ বেশি। আপনারা সাহিত্যিক সাক্ষাৎকারই নিচ্ছেন, কিন্তু ওগুলো এরকম নয়। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একই প্রশ্ন অনেকে অনেকবার করেছে। যেমন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার কখন প্রথম দেখা হয়েছিলো, ইত্যাদি। আশ্চর্য হবেন, আমি বিশ জায়গায় বিশ রকম বলেছি। আমি নিশ্চিত, ওই বিশরকম কথাই সত্য। আমার জীবনকে আমি ফিকশনের বাইরে ভাবিনা।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় 'ফোক টেল' ও 'ওরাল ট্রাডিশনে'র একটা ঢং আছে।

উত্তর : তা আছে। আমার লেখার কণ্ঠস্বর লোকগল্পের মতো; লোকগল্পের সঙ্গে আমার লেখার অনেকেই তুলনা করেছেন। আমার গল্পের কণ্ঠস্বরটা হয়তো আমার মায়ের, কিংবা দাদীর, কিংবা গৃহপরিচারিকার; গল্প বলার যে-ঐতিহ্যে আমি বড়ো হয়েছি, এ হয়তো সেই কণ্ঠস্বর।

প্রশ্ন : গল্পবলার একটা ঢং আপনার প্রথম উপন্যাসে প্রবলভাবে আছে, যেমন 'নিভিয়া' গল্প বলে যাচ্ছে, 'ক্লারা'কে।

উত্তর : গাল-গপ্পো, গসিপ, উপকথা ইত্যাদি অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা বড়ো হয়েছি। কেবল ঘরের গল্প নয়। আমার দাদা ঘরে রেডিও রাখার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন; তাঁর ধারণা, রেডিও খুব স্থূল কথা প্রচার করে। তবে, কিচেনে আমাদের একটা রেডিও ছিলো, লুকিয়ে তা আমরা শুনতাম, এবং প্রতিদিনই ওতে 'রেডিও নভেলা' প্রচারিত হতো।

প্রশ্ন : সোপ অপেরা?

উত্তর : হ্যাঁ, সোপ অপেরার মতোই; সারাবছর ধরে 'নভেলা'গুলো চলতো এবং মনে হতো, 'নভেলা'র মানুষগুলো আমাদের পরিবারের লোকজনের মতো। ওইরকম একটা আবহাওয়ায় আমি বেড়ে উঠেছি।

প্রশ্ন : আপনি তো নিশ্চিতভাবে একজন সম্মোহন-সৃষ্টিকারী গল্পকার। 'সাক্ষাৎকার' বিষয়ে আপনার কি ধারণা? 'সাক্ষাৎকার'ও কি আরেক ধরনের গল্প বলা নয়, আরেক ধরনের ন্যারেটিভ?

উত্তর : না, আমি সম্মোহক গল্পকার নই, আমি আসলে 'জন্ম মিথ্যুক'। অন্যপক্ষে, 'সত্য' কোথায় আছে আমি জানিনা। একটা গল্প দু-তিনবার বলার পর আমার মনে হয়,

সত্যি সত্যি ওরকম ঘটেছে। বাস্তবতা ও ফ্যান্টাসির মধ্যে আমি কোনো তফাত করিনা। ওই দুইয়ের মধ্যে ভেদরেখা একটা নিশ্চয়ই আছে. কিন্তু ওটার অনুসন্ধান চালালে 'লেখা' জিনিশটার কোনো মূল্য থাকে না।

প্রশ্ন : 'ট্রুথ' এবং 'ফিকশনে'র পার্থক্য. কিংবা 'ফিকশন'-এর সত্য-মিথ্যা নিয়ে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : বার্কেলী-তে আমি ছাত্রদের 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং' পড়াচ্ছিলাম। ছাত্রদের আমি ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, উপন্যাস লেখার প্রথম শর্ত 'মিথ্যে' বলতে জানা। তুমি মিথ্যে লিখছো, এবং তুমি মিথ্যে লিখবে, এইটে ঠিক করে নেওয়া চাই. না হয় উপন্যাস লেখা যাবে না। ছাত্র ছিলো মোট চৌদ্দ জন: প্রত্যেকেই উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছিলো। আমার কথা শুনে অধিকাংশ ছাত্র একেবারে মুষড়ে গেলো। কেননা তারা কোনো না কোনো 'সত্য' ধরে অগ্রসর হতে চাচ্ছে।

কিন্তু 'ফিকশন' তো 'সত্য' নয়. 'ফিকশন' হলো 'মিথ্যা'। ফিকশনের প্রথম মিথ্যে হলো. তুমি জীবনের কিছু গন্ডগোলকে শৃংখলাবদ্ধ করতে চাচ্ছো। এটা ফিকশনের প্রথম মিথ্যে। তার মধ্যে তুমি একটা ধারাবাহিকতা তৈরি করতে চাচ্ছো. অনেককিছু থেকে কেবল কয়েকটি জিনিশ বাছাই করছো. তুমি ধরে নিচ্ছো বাছাই করা জিনিশটি গুরুত্বপূর্ণ. অন্যগুলো গৌণ। তদুপরি ওই জিনিসগুলো নিয়ে তুমি লিখছো. একান্তই তোমার পটভূমি থেকে। এর সবটাই মিথ্যে, কেননা জীবন তা নয়। জীবনে সবকিছু একসঙ্গে ঘটে এবং সেখানে কোনো নির্বাচন চলে না। সেখানে তুমি 'বস্' নও, 'জীবন'ই 'বস্'। কাজেই লেখক হিশেবে প্রথমেই যদি ভাবতে পারি ফিকশন হলো 'মিথ্যা'—তাহলেই ভালো, তাহলেই স্বাধীনভাবে লেখা যায়। তারপর তুমি পা দিলে একটা বৃত্তে: সেই বৃত্ত যতো বড়ো হবে, সত্যের খোঁজও মিলবে ততো বেশি।

আমার কাছে এই-ই হলো 'ফিকশন'। আমার জীবনের সঙ্গে আমি অন্তুতভাবে যুক্ত। দশ থেকে বারো ঘন্টা একাকী একটা ঘরে আমি লিখি। কারো সঙ্গে আমি কথা বলি না; টেলিফোনও ধরিনা। লেখার সময় মনে হয়. কে যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে: আমার গোচরাতীত কি যেন কাজ করে চলেছে। আমি 'ফিকশন' তৈরি করে চলেছি. কিন্তু ও-যেন আমার নয়. আমি যেন তার স্রষ্টা নই. উপাদান। স্রেফ উপাদান। এই দীর্ঘ, যন্ত্রণাকর. প্রাত্যহিক লেখার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমি নিজের সম্পর্কে এবং জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি. অনেক কিছু শিখেছি। হয়তো অন্যরাও এটা অন্যভাবে করে. চিকিৎসকের কাছে যায়. কথা বলে. জীবন ও তার যন্ত্রণা নিয়ে আলাপ করে। আমি করি লেখার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু লেখার সময় তা টের পাইনা. বুঝিনা। পরে যখন দেখি. বুঝি. এমন কিছু আবিষ্কার করেছি আমি. যে-বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম না। এইভাবে ফিকশনের ভেতর দিয়ে. অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিশের খোকড়-বাকড়ে. সত্যের উদঘাটন চলতে থাকে : নিজের বিষয়ে সত্য. জীবন বিষয়ে সত্য. জগত বিষয়ে সত্য।

প্রশ্ন : আচ্ছা এবার বলুন. কি জিনিশ একটা গল্পের 'ভালো উপসংহার' তৈরি করে?

উত্তর: সেটা আমি জানি না। ছোটগল্পের কথায় যদি আসি. সেটা 'উপন্যাস' থেকে

ভিন্ন। 'ছোটগল্প' একটা আপেলের মতো: আপেলের মতো সম্পূর্ণ. এবং ছোটগল্পের কেবল একটামাত্র 'উপসংহার'ই থাকা সম্ভব। একটিমাত্র। যেটি উপসংহার—সেটিই তার উপসংহার. অন্য কোনোটি নয়। সেই উপসংহার তুমি জানবে, যদি না জানো তাহলে ছোটগল্প তোমার লেখার কথা নয়। 'ছোটগল্প' আমার দৃষ্টিতে একটা তীরের মতো. বর্শার ফলার মতো : শুরু থেকেই যার নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। ছোটগল্প লেখার সময় তুমি জানবে তুমি কি লিখছো। কিন্তু উপন্যাসে জানবে না। উপন্যাস ধীর, মন্থর: রোগীর প্রাত্যহিক কাজকর্মের মতো। তোমার মাথায় প্যাটার্ন একটা আছে. তুমি ধীরে ধীরে এগোচ্ছো: কিন্তু এগোতে এগোতে, সহসাই লক্ষ করবে, যা লিখতে চাচ্ছো, তা হচ্ছেনা, অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে। কেননা উপন্যাসের একটা নিজস্ব জীবন আছে. আছে নিজস্ব গতি। কিন্তু ছোটগল্পে তা নয়, ছোটগল্পে ওরকম পরিবর্তন ঘটলে ওটা আর ছোটগল্প হবে না। 'ছোটগল্প' লেখকের প্রচন্ড নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আকার নেবে: নিয়ন্ত্রণ বেশি বলে তা বিপজ্জনক। সেজন্যে আমার মতে. পৃথিবীতে অসাধারণ ছোটগল্প খুব কম লেখা হয়েছে। খুবই কম। কিন্তু অসাধারণ উপন্যাস লেখা হয়েছে অনেকগুলো। উপন্যাসে রাজ্যের ভুল করা যায়. ছোটগল্পে তার উপায় নেই।

সূত্র : CONTEMPORARY LITERATURE Winter 1992 Vol 33 Number 4 The University of Wisconsin Press Madison

রেনেসাঁসের মিথ

কাজী আবদুল ওদুদ ফিরে ফিরে বলেছেন রেনেসাঁস, যুক্তিধর্ম ও জাগরণের কথা। তাঁর লক্ষ্য : উদারমানবিকবোধ, সম্প্রীতি, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ; তাঁর প্রেরণা : পশ্চিমের মনস্বিতা, এনলাইটেনমেন্ট, আলোকপর্ব। পশ্চিমের রেনেসাঁস এবং বাংলার জাগরণকে তিনি তুলনা করেছেন, উভয়ের সাদৃশ্য খুঁজেছেন, সাদৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রেনেসাঁসে তাঁর বিশ্বাস সুস্থির, দৃঢ়, মীমাংসিত : পশ্চিমের জ্ঞান ও আধুনিকতা বিষয়ে তাঁর কোনো প্রশ্ন নেই। ফলে কাজী আবদুল ওদুদ আমৃত্যু, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বুদ্ধির মুক্তির কথা বলেছেন : কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্য এবং বিশ্বাস বিচার করা দরকার।

পশ্চিমের রেনেসাঁস একটা বৈপ্লবিক প্রকল্প, এবং একটা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া। রেনেসাঁস-প্রকল্পের অন্তঃসার আমাদের যতোটা আকৃষ্ট করেছে, তার প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার জটিলতায় আমরা অতোটা মনোযোগ দিইনি। ফলে মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও স্বাধীনতার কথা আমরা অবিরাম বলেছি, কিন্তু সমস্যার মূলে পৌঁছুতে চাইনি বা পারিনি। পশ্চিমের রেনেসাঁস 'ঈশ্বর' এবং 'মানুষ'—এই দুই সমস্যার একটা সমাধান করেছিলো। যেখানে ঈশ্বরের অবস্থান, তার জায়গায় রেনেসাঁস স্থাপন করে মানুষকে। বাঙলা এবং বাঙালীর ইতিহাসে এই উচ্ছেদপ্রক্রিয়া লক্ষ্যযোগ্য নয়। রিফরমেশন তো রেনেসাঁস নয়, কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদসহ অনেকেই রিফরমেশনকে 'রেনেসাঁস' বলেছেন : তাঁদের বৃহদায়তন টেক্স্টের সারাংশ তাই। যে কারণে কাজী আবদুল ওদুদ সামাজিক প্রক্রিয়া, উপনিবেশের আধিপত্য কিংবা রাজনীতি বিষয়ে নিস্পৃহ : তার উৎসাহ খানিকটা বিমূর্ত, কিছু বা রোমান্টিক, মানবতাবাদ; তিনি ব্যক্তির উৎকর্ষ দিয়ে বাঙালি সমাজের গড়ন বুঝবার চেষ্টা করেছেন, সেই গড়ন বদলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। মানবতাবাদের অতিরঞ্জন ও রাজনীতির অনুপস্থিতি তাঁর মনোলোকে ব্যক্তি বিষয়ে কতোগুলো বিশ্বাস দৃঢ় করেছে; যেমন (ক) ব্যক্তি অফুরন্তভাবে সৃষ্টিশীল ও সম্ভাবনাময় (খ) জ্ঞানের উৎকর্ষে ব্যক্তি পৌঁছুতে পারে অসীমতায়, এবং এধরনের ব্যক্তি ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক (গ) এরকম কিছু ব্যক্তি চারপাশ আলো করে আবির্ভূত হন উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায়, এবং এঁরাই বাংলার রেনেসাঁসের ঐতিহাসিকতা সম্পাদন করেন। 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬) গ্রন্থে কাজী আবদুল ওদুদ একগুচ্ছ মনস্বীপুরুষের নাম বলেছেন—যেমন রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধী, পরমহংস, অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাজী আবদুল ওদুদ এঁদের মনস্বিতায় মুগ্ধ, এই মনস্বিতা ও উৎকর্ষ তাঁর চোখে জাগরণের দলিল; কাজী আবদুল ওদুদ এঁদের চিন্তা ও কাজের মূল্যায়ন করেছেন, সেই মূল্যায়নের ভেতর কাজী সাহেবের রেনেসাঁস ভাবনা সীমাবদ্ধ। কাজী আবদুল ওদুদ ব্যক্তিকে মূল্য দিয়েছেন, ব্যক্তির মনন ও তার উৎকর্ষকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ তিনি তাকিয়েছেন পশ্চিমের দিকে : পশ্চিমের আলোকিত ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির অঙ্গীকার, ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ তাঁকে স্বপ্নকাতর করে তুলেছে। পশ্চিমের বিকল্প বা সমকল্প ভারতবর্ষে সম্ভবপর কিনা তিনি ভেবেছেন। সম্ভাব্যতার কথা

ভাবতে গিয়ে তিনি একগুচ্ছ বাঙালি ভাবুকের ইমেজ মনের ভেতর গেঁথে নিয়েছেন, এবং সেই ইমেজের ভিত্তিতে বঙ্গীয় জাগরণের আখ্যান তাঁর চোখে সুস্পষ্ট হয়েছে।

আমরা বাঙালি সমাজের গড়নের দিক থেকে কাজী সাহেবের জাগরণের চিন্তা বুঝতে চাই। তার আগে বলা দরকার, 'রেনেসাঁস' বিষয়ে পশ্চিমের যে উচ্চাভিলাষ ছিলো, তা বর্তমানে বিপন্ন। যুক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকাও এখন আর নেই। এই শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর মুহূর্তে কয়েকজন জর্মন মনস্বী পশ্চিমের রেনেসাঁস, যুক্তিবাদ, আলোকপর্ব ও এনলাইটেনমেন্টের যে পুনর্বিচার করেছেন, তার সঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের রেনেসাঁস-মুগ্ধতা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

কাজী আবদুল ওদুদ পশ্চিমের রেনেসাঁসকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে উৎসাহী। রেনেসাঁসের মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ কাজী সাহেবের দৃষ্টিতে বিচারোর্ধ। পশ্চিমের রেনেসাঁস প্রশ্নোর্ধ, এই চিন্তার ভেতর একটা সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, এমনকি স্বতঃসিদ্ধতা আছে। আবার সেই রেনেসাঁসকে বঙ্গীয় পটভূমিতে স্থাপনের মধ্যে আছে একটা আতিশয্য। এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতে, পশ্চিমের সভ্যতা তৈরি করেছে 'ব্যক্তি', অর্থাৎ 'ইনডিভিজুয়াল'; আমাদের সমাজে 'ব্যক্তি' (ইনডিভিজুয়াল) নেই, আছে 'পুরুষ' (পার্সন)। 'ব্যক্তির' জায়গায় 'পুরুষে'র উপস্থিতি আমাদের সমাজের দোষ না গুণ, ভালো না খারাপ, সে কথা ভিন্ন, কিন্তু এইটে আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য; কাজেই রেনেসাঁসের ফল হিশেবে পশ্চিমে ব্যক্তিবাদের যে স্ফুরণ দেখি তার সঙ্গে আমাদের গোড়ার গোলাযোগ এইখানে। এই গোলোযোগ তৈরি করেছে বিচিত্র সমস্যা, যে সমস্যা পশ্চিম থেকে ভিন্ন। রেনেসাঁসের ব্যক্তি প্রথমে 'ঈশ্বরে'র স্থানে 'মানুষ'কে বসিয়েছে, অতঃপর সেই ব্যক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছে 'সমাজে'র সঙ্গে : এভাবে পশ্চিমে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাত একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ায় বিকশিত। পশ্চিমের ঘটনাগুলো এই রকম :

ক. রেনেসাঁস

খ. রিফরমেশন

গ. কাউন্টার রিফরমেশন

ঘ. রোমান্টিসিজম

পশ্চিমে 'রোমান্টিসিজমে'র শেকড় রেনেসাঁসে, কিন্তু আমাদের রোমান্টিসিজম কাউন্টার-রিফরমেশনের শস্য—বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের এই ভাবনার সঙ্গে আমি একমত। রোমান্টিসিজমের উৎসের খোঁজে অভিযাত্রিক হতে পারি, কিন্তু সে-অভিযাত্রায় কোনো 'রেনেসাঁসে'র গঙ্গোত্রী মিলবেনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে : পশ্চিমে রেনেসাঁস একটা প্রক্রিয়া, যে-প্রক্রিয়া বেগানা ও ভিন্ন। কিন্তু কাজী সাহেব "বাংলার জাগরণে"-র (১৯৫৬) শুরুতেই বাংলার জাগরণ এবং পশ্চিমের রেনেসাঁসকে এক করে দেখেছেন। তাঁর মনোযোগের সবটুকু জোর ব্যক্তির ওপর, ব্যক্তির উৎকর্ষের ওপর, ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনস্বিতার ওপর।

কিন্তু এই 'ব্যক্তি' সে, 'ব্যক্তি' নয়, পশ্চিম যাকে 'ইনডিভিজুয়াল' বলেছে। আমাদের 'ব্যক্তি' হলো 'পার্সন', পরিবারের পুরুষ, যে-পুরুষ 'সমাজে'র অংশ : যে সমাজের সঙ্গে

এই 'পুরুনে'র বিরাট কোনো ঝগড়া কখনো বাঁধেনি। ইশ্বরের সঙ্গে বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে বিরোধ, অনুশাসনের সঙ্গে বিরোধ আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর নেই। এই অভিজ্ঞতা ছাড়া কি 'রেনেসাঁস' হয়? এই অভিজ্ঞতা ছাড়া কি পশ্চিমের রেনেসাঁস হয়েছে? আমরা পশ্চিমের আধুনিকায়নের ভেতর আছি এবং ছিলাম, কিন্তু আধুনিকায়ন (অর্থাৎ প্রযুক্তি, টেকনোসায়েন্স, সামাজিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের ব্যবহার) আমাদের ভেতর আধুনিকতার মুহূর্ত তৈরি করেনি, আধুনিকতার অভিজ্ঞতা তৈরি করেনি। অথচ কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের অবাক করে দিয়ে বলেন :

> 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ তাও এমনি একটি (অর্থাৎ ইউরোপের মতো) রেনেসাঁস : তার প্রভাবও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী—সমস্ত ভারতবর্ষ তার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সর্বক্ষেত্রেই নবীন ভারতে যে রূপান্তর ঘটল তার মূলে এক বড়ো শক্তিরূপে কাজ করেছে এই রেনেসাঁস।'
> [দ্রষ্টব্য, "বাংলার জাগরণ", কাজী আবদুল ওদুদ, প্র প্র. ১৯৫৬, পৃ ১-২]

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কাজী আবদুল ওদুদের 'রেনেসাঁস' বিষয়ে আমি যা বলছি, তা নরহরি কবিরাজ বা বিনয় ঘোষের পুনর্ভাষণ নয়। তারা অনেক কিছুর সরলীকরণ করেছেন, এবং 'বিপ্লবের' অনুপস্থিতি তাঁদের সকল তর্কের মূল। মার্কসবাদ যদি একটা বিকাশমান প্রকল্প হয়, তাহলে এঁদের সঙ্গে সেই মার্কসবাদের সম্পর্ক অকিঞ্চিৎকর।

পশ্চিমের 'রেনেসাঁসে'র উচ্চাশা খোদ পশ্চিমেই আজ অস্তমিত। রেনেসাঁসের সমালোচনা পশ্চিমে শুরু হয়েছে, ঢের আগে : কাজী সাহেবের জীবদ্দশায়। যাঁরা সে সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মনোভঙ্গি মার্কসিস্ট। জর্মনির ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানায় রেনেসাঁসের সমালোচনার সূত্রপাত। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে জর্মনির ফ্রাঙ্কফুর্টে (১৯২৩) এই ঘরানার জন্ম, ম্যাক্স হোর্কেইমারের অধ্যক্ষতায় (১৯৩১) এর বিকাশ। নাজীপর্বে, হিটলারের উৎত্রাসনের সময়, ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানা আমেরিকায় স্থানান্তরিত হয়; অবশ্য পঞ্চাশের দশকে ঘরানা জর্মনিতে পুনরায় ফিরে আসে। প্রতিষ্ঠার পর দু-দশকের (১৯৩১-১৯৫০) মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানা রেনেসাঁস, আলোকপর্ব, যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা বিষয়ে যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করে, তা ব্যতিক্রম ও নতুন।

রেনেসাঁসের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ রচনা করেন থিওডর আডর্নো ও ম্যাক্স হোর্কেইমার, তাঁদের যৌথপ্রণীত 'দি ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট' (১৯৪৪) গ্রন্থে। রেনেসাঁসের ভিত্তি: যুক্তি, এবং রেনেসাঁস-উদ্ভূত আধনিকতারও ভিত্তি: যুক্তি। এই যুক্তি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন, যুক্তির অবিনশ্বর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যুক্তি যদি আধুনিকতার ভিত্তি হয়, তাহলে বলতে হবে বিশ্বযুদ্ধ ও নাৎসী হত্যাযজ্ঞের মূলেও এই যুক্তি কার্যকর। কারণ যুদ্ধের যুক্তি আছে, এবং হত্যার যুক্তির কথা নাৎসীরা বলেছে। বিশ্বযুদ্ধে যে ব্যাপক মানবধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাসচেম্বার, আসউইচ : এর পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তির বৈধতায় যুদ্ধের হত্যাকান্ড সম্পন্ন। তাহলে 'যুক্তি'র আইডেনটিটি কি, এই মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন আডর্নো এবং হোর্কেইমার। যদি হত্যারও 'যুক্তি' থাকে, তাহলে সেই যুক্তি, এবং সেই যুক্তির রেনেসাঁস, এবং আধুনিকতা বিষয়ে

উল্লসিত হবার কি আছে, এটা ঘরানার মূল জিজ্ঞাসা। এই সূত্রে তাঁরা পশ্চিমের দর্শন, যুক্তিবাদ এবং আধুনিকতার পুনর্বিচার করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের সঙ্গে তর্ক হয়েছে হেগেলের, যে হেগেল ইতিহাসের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেছেন 'অধিকারের দর্শন' বইতে। হেগেলের কথা ছিলো : সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট, বিষয় এবং বিষয়ী, রিয়াল এবং র‍্যাশনাল, তত্ত্ব এবং প্রয়োগ এক হয়ে যাবে একদিন, এবং তখনই ইতিহাসের প্রান্তে পৌছুবে মানুষ। রিয়াল এবং র‍্যাশনাল এক হয়ে গেলে ইতিহাসের আর দরকার হবেনা। রিয়াল এবং র‍্যাশনাল (যুক্তি এবং বাস্তব) এক হয়ে যাওয়ার ঘটনা তিনি লক্ষ্য করেন বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে, নেপোলিয়নের রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে। কিন্তু 'রাষ্ট্র' কখনোই সেই স্বপ্ন সফল হতে দেয় না; রাষ্ট্রের মধ্যে রিয়াল-র‍্যাশনালের এককালীনতায় হেগেল যে য়ুটোপিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন, তা কল্পস্বর্গ মাত্র, তা মিথ্যা। যুক্তিবাদের মাধ্যমে হেগেল আধুনিক জীবনের সমাধান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। এইভাবে পশ্চিমী দর্শনের যুক্তিবাদ ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘরানা বিশ্লেষণ করে দেখেছে।

'যুক্তি'র এই সমস্যা কাজী আবদুল ওদুদকে ভাবিত করেনি। অথচ তাঁর সমুখেই ভাবনার একাধিক উপকরণ ছিলো। কাজী সাহেব 'মানবতাবাদে'র কথা বলেছেন, এই মানবতাবাদ লোকজ/বঙ্গীয় নয় : এটা পশ্চিমের 'হিউম্যানিজমে'র পুনরাবৃত্তি। 'হিউম্যানিজম' রেনেসাঁসের লক্ষ্য ; কাজেই ঘুরে ফিরে হিউম্যানিজমের কথা বলা, এবং ঘুরে ফিরে হিউম্যানিজমে ফিরে আসা, কাজী সাহেবের চিন্তার প্রধান দিক। কিন্তু পশ্চিমের হিউম্যানিজম মর্মত 'খ্রিস্টিয় মানবতাবাদ', কাজেই তা সম্প্রদায়-সাপেক্ষ, কাজেই তাতে 'এক্সক্লুশন' বা বাদ দেয়ার ব্যাপার আছে, এবং ছিলো। খ্রিস্টিয় মনোলোকের বাইরে 'হিউম্যানিজম' ছিলোনা; অর্থাৎ এই 'হিউম্যানিজমে'র প্রয়োগ ও ব্যবহার 'খ্রিস্টিয় পৃথিবী'তে সীমাবদ্ধ, তার বাইরে নয়। যাঁরা এই হিউম্যানিজমের কথা বলেছেন, তাঁরা 'অ-খ্রিষ্টান মানবসম্প্রদায়'কে মানবপর্যায়ভুক্ত করেননি। 'অ-খ্রিস্টান আদার' (যেমন ভারতবর্ষ, অরিয়েন্ট, চীন-জাপান, এশিয়া) তাঁদের চোখে অসভ্য এবং বর্বর। পশ্চিমের হিউম্যানিস্টরা এই প্রক্রিয়ায় বর্বরের উপর প্রভুত্বের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতা, স্কলারশিপের সঙ্গে কর্তৃত্বের যোগ দ্রষ্টব্য হয়। পশ্চিমের প্রভুরা 'অরিয়েন্টালিজমের' প্রজেক্ট তৈরি করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বৈধতা সম্পাদন করেন। আমরা যাকে 'উপনিবেশ' বলছি, তা তাঁদের চোখে বর্বর সমাজকে সভ্য করার প্রক্রিয়া। ঔপনিবেশিক খ্রিষ্টিয়-পশ্চিমের হিউম্যানিস্ট প্রভুরা মিশনারী প্রেরণ করলেন ভারতবর্ষে এবং প্রচার করলেন হিউম্যানিজম।

এই 'হিউম্যানিজম'কে কাজী আবদুল ওদুদ নির্দ্বন্দ্বভাবে গ্রহণ করেছেন, হিউম্যানিজমের রাজনীতি ও তার ঔপনিবেশিকতা তাঁকে চিন্তিত করেনি। এই হিউম্যানিজমকে তিনি ধরে নিয়েছেন 'নিরপেক্ষ মানবতাবাদ' হিশেবে, যা সত্য নয়।

কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁসের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তাধারায় তিনি দেখেছেন 'মারাত্মক দুর্বলতা' (পৃ. ১০১)। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদকে তাঁর মনে হয়েছে 'হিন্দু ঐতিহ্য গর্ব'। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের ভেতর খুঁজে পান ঔপনিবেশিকতার একটা প্রতিরোধ: তিনি প্রাচীন

ভারতের কথা বারবার বলেছেন, সেই বলার ভেতর একটা আবেগ নিশ্চয়ই ছিলো—যে আবেগ আসলে প্রতিরোধের আকুতি, উপনিবেশবিরোধিতার বাসনা। পশ্চিমী যুক্তির মোহগ্রস্থতায় এই আকুতির সদর্থ স্বচ্ছ হবে না। কাজী সাহেবের কাছেও স্বচ্ছ হয়নি। পশ্চিমের মেটান্যারেটিভস (দর্শন/বিজ্ঞান/ইতিহাস/সংস্কৃতিতত্ত্ব) বঙ্কিম ভালো করে পাঠ করেছিলেন, তবু বঙ্কিম কেন প্রাচীন ভারতের কথা বলছেন? কেন লিখছেন 'বন্দে মাতরম'? কেন বলছেন নিষ্কাম দেশপ্রেম কিংবা হিন্দু অতীতের কথা? কারণ, ঔপনিবেশিক বাঙলা বঙ্কিমকে স্বস্তি দেয়নি; তিনি ভাবতে পারেন নি পশ্চিমের প্রগতি ও প্রযুক্তি স্বদেশের কিংবা স্বজাতির। পরাধীন বাংলায় মানবতাবাদের বিলাসিতা কাজী ওদুদের পক্ষে সম্ভবপর হলেও বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সেজন্যে বঙ্কিম স্বদেশের ধর্ম, লোকবাদ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) "বাংলার জাগরণ" (১৯৫৬) গ্রন্থ ও গ্রন্থের প্রতিপাদ্যকে আমি এইভাবে পড়তে চাই। শতাব্দীর সূর্যাস্তবেলায় উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ স্বভাবত ভিন্ন হবে। তবে মনে রাখা দরকার, এটি কাজী সাহেবের একমাত্র গ্রন্থ নয়, এবং এই গ্রন্থের চিন্তা কাজী সাহেবের একমাত্র চিন্তা নয়।

কাজী সাহেব ধর্মের পরিসরে যুক্তিবাদের কথা ভেবেছেন, তাঁর ভাবনা অন্তঃসারপূর্ণ: কারণ ধর্মের ভেতরই আমরা ছিলাম এবং এখনো আছি, যদিও ক'দিন আগে একটা বাংলা শতাব্দী আমরা পার করে দিয়েছি এবং ক'দিন পর একটা খ্রিস্টিয় শতাব্দী আমরা পার করে দেবো: একটা অপরিবর্তনীয় বৃহৎ অন্ধকার আলখেল্লার ভেতর আমাদের বসবাস। কাজী আবদুল ওদুদের টেক্স্টে প্রবেশ করে এই আলখেল্লার আবরণ আমরা অল্প হলেও সরাতে পারি।

বাঙালি মুসলমানের দীপায়নপর্বের কথা ভাবলে রেনেসাঁসের মিথ ও কাজী সাহেবের মুখ একসঙ্গে মনে পড়ে।

ডিকনস্ট্রাকশন ও অনুবাদতত্ত্ব

এই শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সাহিত্য-আলোচনা ও সংস্কৃতি-ব্যাখ্যায় বড়ো এক রূপান্তর ঘটে যাওয়ায় আমরা যারা বাংলা ভাষার লিখিপড়ি তাদের জন্যে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই সমস্যা যেমন জটিল, তেমনি স্তরবহুল। আমরা ফুটনোট, কিন্তু প্রবেশ করতে চাইছি পশ্চিমের টেক্স্টে : এই হলো সমস্যার একটা ধরন। আরেকটা সমস্যা হলো, বাংলা সমালোচনার শব্দরাশি ও অভিব্যক্তিগুলো খুব পুরনো, সেকারণে উত্তরগ্রন্থনবাদী উত্তরাধুনিক ভাষা-পরিভাষা ও প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ তাতে নিয়ে আসা ইসব ধারণার ব্যবহার ও প্রয়োগ, কিংবা সমালোচনা, সবই কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাদের সমালোচনার ফ্রেম ও তার ভাষাকাঠামো গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের লেখকদের বয়ান ভাষ্য বিশ্লেষণ ও মুদ্রাদোষকে অবলম্বন করে। অন্যদিকে কবিতার আলোচনা বলতে আমরা বুঝেছি, বিভিন্ন ভাগে কবিতার উপকরণের বিন্যাস। অজিতকুমার চক্রবর্তীর (১২৯৩-১৩২৫) "রবীন্দ্রনাথ" (১৩১৯) বইটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচারের ক্ষেত্রে তো বটেই, বাংলা কাব্যের বিদ্যায়তানিক আলোচনাকেও দারুণ প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ পর্যায়ের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা অন্তর্দৃষ্টিগুণসম্পন্ন হলেও, তা একদিকে যেমন সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা দেয় না, অন্যদিকে বুদ্ধদেবের নিজের দ্বিধা, সংকোচ ও রোমান্টিকতা তাঁর ভাষ্যে তৈরি করেছে বিশেষ এক টেনশন ও অনির্দিষ্টতা। ইউরোপের ফেনমেনলজি, মেটাফিজিক্স ও আলোকপর্বীয় দর্শনের পটভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্র-কাব্যের যে বিশেষ সমালোচনা লেখেন, তার অভিপ্রেত বিকাশ ও বিস্তার পরবর্তীকালে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এর কারণ, উত্তরসাধকেরা 'দর্শন'-কে সাহিত্যের ব্যাখ্যায় খুব জরুরি ভাবেন নি, কিংবা ভাবলেও দার্শনিক সমালোচনার অধিকার তাদের অনায়ত্ত ছিলো। বুদ্ধদেব বসু যতোটা স্টাইলিস্ট ছিলেন, সে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন না; দর্শনকে বুদ্ধদেব ভয় পেতেন, এবং সমালোচনাকে তিনি দর্শনের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেননি। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখের পর উল্লেখের চাতুর্যে 'দর্শন' ব্যাপারটাকে একটা ভীতিকর অর্থহীনতায় নিয়ে গেছেন। তবে দার্শনিক পরিভাষা সৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু দে-র সমালোচনা প্রবন্ধ গদ্যের পরিমাণ অল্প নয়, কিন্তু অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সত্ত্বেও তাঁর একান্ত উপলব্ধিটুকু লেখায় বারবার ফসকে গেছে। এদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর গদ্যে ভাবনার গভীরতা ও দার্শনিকতা ছিলো সবচেয়ে বেশি, কিন্তু 'সাম্প্রতিক' ছাড়া বাংলা ভাষায় তিনি বেশি গদ্য লেখেননি। নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় একজন অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১২৯১-১৩৬৭) একটি মাত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যে কাজ সম্পন্ন করেন, তার পরিপূরক কোনো বই আমরা লিখতে পারিনি।

আজকের দিনে আমাদের সমস্যা ভিন্ন। সমালোচনার একটা কালপর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে আমাদের, তা বোঝা যায়; কিন্তু নতুন পর্বে প্রবেশের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, উপকরণ, আসবাবপত্র ও এপারেটাস আমাদের হাতে নেই। সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তি নতুন এক দিগন্তে

ঢুঁ মারতে চাইছে, অথচ আমাদের এক্সপ্রেশনগুলো কিছুতেই নতুন করা যাচ্ছে না পুরনো পুঁজিতে নতুন বিষয়-আশয় অধিগত বা অভিব্যক্ত করা কঠিন। আনন্দের কথা, অনেকেই প্রাণপণে নতুন দিগন্তে উপনীত হবার জন্যে ব্যাকুল ও বিমথিত। পাঠজগতেও সাধারণভাবে একটা হাওয়া-বদল হয়ে গেছে। তরুণদের উদ্যম চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি: খুব প্রাথমিক হলেও, সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ বিশেষভাবে এখন দ্রষ্টব্য। 'সংস্কৃতি' কথাটি অনেক ব্যাপ্ত, সেই ব্যাপ্তির আন্দাজ তরুণদের ভেতরও ফ'লে উঠছে। কিছুদিন পূর্বেও ষাটদশকের পত্র-পত্রিকা-ভাষা-মুদ্রাদোষের অনুকরণে তরুণরা যুক্ত হতো, এখন হয় না। এটা শুভলক্ষণ। একাডেমিক ক্ষেত্রেও, বুদ্ধিবৃত্তি, অকিঞ্চিৎকর হলেও, সমকালীন হয়ে উঠতে চাইছে। বিদেশে প্রতিষ্ঠানের লোকেরাই সৃষ্টিশীল লেখা লিখছেন, যাকে 'প্রাতিষ্ঠানিক ডিকনস্ট্রাকশন' বলতে পারি। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের গোপাল-রাখালের দ্বন্দ্ব বাঙালি মধ্যবিত্তের চিরন্তন এক বাস্তবতা: বিদ্যায়তনে গোপালগুচ্ছের পাশাপাশি রাখালের দলও যে দেখা দিচ্ছে, সেটা খাটো করে দেখা যায়না। বিদেশ থেকে পড়ে এসে অনেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়সূচীতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ এর ভেতর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালচারাল স্টাডিজে'র মতো বিভাগ প্রবর্তিত হয়, অবাক হবো না। তাড়াতাড়ি কিছুই হবে না, কিন্তু আশা-ভরসায় বিশ্বাস রাখা ভালো।

পশ্চিমের সঙ্গে আপাতত আমাদের যোগাযোগের সূত্র অনুবাদ ও রূপান্তর। তবে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট মুহূর্তে অন্য সব বিষয়ের মতো অনুবাদ বস্তুটাও কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ অনুবাদেও রাজনীতি আছে, এবং থাকে, এবং সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। ইউরোপ-আমেরিকায় গত কয়েক দশকে 'অনুবাদ-তত্ত্ব' বা 'ট্রান্সলেশন থিওরি' তৈরি হয়েছে। বলা বাহুল্য এই অনুবাদ-তত্ত্বও সমালোচনা-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

'অনুবাদ' অবশ্যই কোনো মূল পাঠের পুনর্লিখন। যেহেতু তা লিখন নয়, পুনর্লিখন, কাজেই তাতে মতাদর্শিক প্রস্তাব থেকে যায়, এবং পুনর্লিখনের উদ্দেশ্য যাই থাকুক তার নন্দনতত্ত্বের শ্রী ও চৈতন্য মূলের তুলনায় ভিন্ন, এবং সেই ভিন্নতার কারণ : বিশেষ সমাজে ওর উপযোগ ও সাহিত্যতাত্ত্বিক প্ররোচনার প্রবৃত্তি, কোনো অনুবাদ, অর্থাৎ পুনর্লিখন, এই আইডিওলজি ও প্ররোচনা বাদ দিতে পারে না। ক্ষমতার একটা সার্ভিস হিশেবে এই অনুবাদতাত্ত্বিক প্ররোচনার উদ্গম, এবং এজন্যেই অনুবাদ কখনো কখনো সাহিত্যবোধে পরিবর্তন আনে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের নতুন নতুন বোধ, বিশ্বাস, প্রত্যয় ও কনসেপ্ট গোচরে আসে, সেজন্যে 'সাহিত্যের অনুবাদ' সাহিত্যের উদ্ভাবনার সহায়ক। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এক সংস্কৃতির ক্ষমতা অন্য সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হয়। তবে অনুবাদ ও পুনর্লিখন সবসময় ইনোভেশনের অনুকূল নয়, কখনো কখনো গতিরোধকও; এর ফলেই অনুবাদ-তত্ত্ব একটা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিশেবে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে, যার লক্ষ্য সাহিত্যের প্ররোচনামূলক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান ও তদন্ত, চিহ্নবদলের কারুকাজ ও তার রাজনীতি, সর্বোপরি প্ররোচনা-সর্বস্ব বর্তমানকালের অন্যসব ফর্মের মতো সাহিত্যিক প্ররোচনার পর্যালোচনা। সাহিত্য ও সমাজে মতাদর্শ, পরিবর্তন ও পাওয়ারের যে সমস্যা, অনুবাদ-তত্ত্বও তাকে কেন্দ্রীয় আলোচ্য মেনেছে।

'অনুবাদ' যেহেতু 'পুনর্লিখন' কাজেই তার সঙ্গে মতাদর্শের যোগ গভীর। কথাটি আরো সহজে এভাবে বুঝতে পারি যে, যখন এক দেশের টেক্স্ট অন্য দেশে, কিংবা এক ভাষার টেক্স্ট অন্য ভাষায় অনূদিত হয়— নানা সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যা সম্পর্কে অনুবাদক সচেতন হলেও তাঁর লক্ষ্য থাকে বিশেষ সমাজে ও সংস্কৃতিতে অনুদিত টেক্স্টের উপযোগ, ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা। এই লক্ষ্যটি খুব বিপজ্জনক, কেননা অনুবাদক সবসময়েই যোগাযোগের প্রসঙ্গটিকে প্রেফার করেন, এবং তার কারণে বিশেষ ভাষার অভিব্যক্তিগুলো অন্যভাষায় নিষ্ঠুরভাবে বদলে যায়। ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজের অনুবাদ আদৃত হওয়ার বাসনায় অনুবাদক এক মারাত্মক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, ফলে বহু 'সাইলেন্স' অনূদিত টেকস্টে থেকে যায়। সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নে তো বটেই, সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রয়োজনেও অই 'নিঃশব্দ শূন্যস্থানগুলো' খুব জরুরি, ও সংকেতবহ, অথচ এক্ষেত্রে অনুবাদকের করনীয় কিছু নেই। 'রিপ্রেজেন্টেশনে'র আদি সমস্যা এখানটায় এসে নতুন এক আকার নেয়।

অনুবাদ-তত্ত্বের ক্ষেত্রে বড়ো পরিবর্তন এসেছে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনের সূত্রে। 'অনুবাদ' বলতে আমরা ধরে নিই 'মূল পাঠ' বলে একটা জিনিশ আছে, এবং 'অনুবাদ' হলো তার পুনর্লিখন, পুনর্লিখিত পাঠ অই মূল পাঠকে অনুসরণ করে, এবং অনূদিত পাঠ যদি মূল পাঠের অনুগ হয় তাহলে অনুবাদ সার্থক। বলা বাহুল্য বিনির্মাণ-পর্বে 'অনুবাদ' কথাটি অতো সহজ নেই আর।

অনুবাদ সম্পর্কে 'ডিকনস্ট্রাকশনে'র পূর্বে যতো আলোচনা হয়েছে, তার সারকথা হলো: অনুবাদ মূলত একই বস্তুর এক আধার থেকে অন্য আধারে স্থানান্তর, স্থানান্তরসূত্রে একই নান্দনিক অভিজ্ঞতার সম্প্রসার, ভাষাগত আবয়বিক ভিন্নরূপ, এককথায় 'টার্গেট কালচারে' গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে এক ভাষাবস্তু অন্য ভাষার আধারে বিন্যাস। অর্থাৎ অনুবাদ সম্পর্কিত সকল ভাবনার মূলে এই ধারণা কার্যকর যে, 'অরিজিনাল টেক্স্ট' বা মূল পাঠ হলো প্রধান জিনিশ, আর অনুবাদ তার অধস্তন রূপান্তর। দেরিদা বললেন, 'অনুবাদ'কে এরকম অধস্তন ভাবা ন্যায়সঙ্গত নয়। 'অনুবাদ'ও একটা লেখন, সেই লেখন মূল টেকস্টের মতো মূলব্যন—কেননা 'মূল পাঠ' বলে কিছু নেই—অরিজিন ও অরিজিনালের যে-কোনো রকম উপস্থিতি তাঁর মতে সন্দেহজনক ও অবাঞ্ছিত। দেরিদা 'অনুবাদ'কে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, আত্মনিয়ন্ত্রিত, মুক্তরূপে দেখতে আগ্রহী। ভাষাচিহ্ন নিরন্তর পরিবর্তন-সাপেক্ষ, এবং তার কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ নেই।

বিনির্মাণবাদীরা অদ্ভুত সব কথা তুলেছেন অনুবাদ সম্পর্কে। বিনির্মাণবাদীদের অনুসন্ধান এইরকম: (ক) অনুবাদ হলো মূলের অনুগামী—এইটে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তার স্থানে যদি এমন কথা বলি যে, অনুবাদ নয়, 'মূল'-ই, অনুবাদের ওপর নির্ভরশীল? (খ) অনুবাদ ছাড়া মূল পাঠের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব অসম্ভব; কাজেই মূলপাঠের কারণে নয় বরং অনূদিত পাঠের গুণে মূল পাঠ টিকে থাকে; (গ) মূল পাঠের ওপর 'অর্থ' নির্ভরশীল নয়, নির্ভরশীল অনূদিত পাঠের ওপর, কাজেই অর্থবোধের ক্ষেত্রে মূল পাঠের

ভূমিকা গৌণ: (ঘ) টেক্স্টের আইডেনটিটি 'মূল-পাঠ' না 'অনূদিত পাঠ'? (ঙ) 'মূলপাঠে'র পূর্বে কি ছিলো বা থাকে ? কোনো আইডিয়া? একটা ফর্ম? কোনো বস্তু? কিছুই না? 'প্রি-অরিজিনাল' প্রক্রিয়ায় চিন্তা করা কি সম্ভব? অনুবাদ-বিষয়ে বিনির্মাণবাদীদের যুগান্তকারী বাক্যটি এরকম : 'অনূদিত পাঠ আমরা লিখিনা, বরং অনূদিত পাঠই আমাদের লেখে'— 'দি ট্রানস্‌লেটেড টেক্‌স্ট রাইটস আয, নট উই দি ট্রান্‌সলেটেড টেক্‌স্ট'। 'ডিফারেন্সে'র যে-প্রসঙ্গ ডিকনস্ট্রাকশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই ধারণা তারা অনুবাদ-তত্ত্বেও প্রয়োগ করেন। কারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধান জিনিশটাই হলো 'ভাষা', আর ভাষা হলো চিহ্ন-ব্যবস্থা, আর চিহ্নের অর্থ চিহ্নের সাদৃশ্যে নয় পার্থক্যেই নির্ণেয়। সেজন্যে অনূদিত পাঠ অবশ্যই ভিন্ন একটা পাঠ এবং সেই ভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ। ডিকনস্ট্রাক্‌শন অনুবাদকর্মে কতোটা সাহায্য করবে বলা কঠিন, কিন্তু এর ফলে 'অনুবাদ ডিসকোর্সে'র বোধ-উপলব্ধিতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। দেরিদা, টেকস্টের ব্যাখ্যানে যেমন অনুবাদ-প্রসঙ্গেও বচন-বাচ্যের অনন্তরঙ্গ অবলোকন করতে চান দেরিদার মতে, অনুবাদ মূলত বচন-বাচ্যের পার্থক্যই অনুশীলন করে [পজিশনস", ১৯৮১, পৃ.২১]। অনুবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেরিদার কাছে : তিনি বলেন, সকল দর্শনই অনুবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত—তাঁর ভাষায় : দর্শনের উৎস হলো 'অনুবাদ', অথবা 'আনুবাদিকতার থিসিস', অনুবাদক অথবা পাঠক যদি ভাবেন এই বুঝি অবিকল লেখা হলো, কিংবা এইটে বা ওইটে তার আইডেনটিটি, কিংবা এইটেই প্রকৃত বিবৃতি—দেরিদা তাকে চ্যালেঞ্জ করবেন। অনুবাদ হলো এক যাত্রা : আইডেনটিটি (অভেদ) থেকে ডিফারেন্সের (বিভেদ) দিকে। টেক্‌স্টের কোনো 'ডিপ স্ট্রাকচার' নেই, কাজেই তার কোনো অলংঘনীয় অর্থও নেই, কাজেই মূল পাঠ আর অনূদিত পাঠে অর্থবিকৃতির উদ্বেগ উপহাস্য। এই অনুবাদ-তত্ত্বের যদি কোনো ভিত্তি থাকে, তবে তা 'না-আইডেনটি' 'না-উপস্থিতি' : মানবভাষা সবক্ষেত্রেই উপস্থাপনব্যর্থ, এইটে দেরিদার দাবি। দেরিদার মতে 'অনুবাদে' যা থাকে, তা চিহ্নায়নের বিভিন্ন চেইন ছাড়া আর কিছুই নয় : মূল পাঠ ও অনূদিত পাঠ এক প্রতীকী সম্পর্কে যুক্ত, দুই পাঠই দুইপাঠকে প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে, বদল ঘটায়, রূপান্তর আনে, দুটোই অভিন্নকিছুর নাম দেয় ও নাম বদলায়। অর্থের সংস্কার ও মূল-আনুগত্যের বাতিক থেকে 'অনুবাদ'কে মুক্ত করা কিংবা মুক্ত ভাবা সম্ভব কিনা, ডিকনস্ট্রাকশন তাই পরীক্ষা করে দেখে। ভাষার বাইরে অর্থ আছে, এইটে যেমন বিনির্মাণবাদীরা মানেনা, তেমনি 'উৎস-পাঠ' (সোর্স টেক্‌স্ট) ও 'লক্ষ্য-পাঠ' (টার্গেট টেক্‌স্ট) আলাদা— এটাও স্বীকার করেনা কাজেই অনুবাদের একান্ত ও একমাত্র নির্ভর হলো ভাষা এবং ভাষা থেকে ভাষার পার্থক্য : আর কিছু নয়—ভাবনা নয়, চিন্তা নয়। কারণ এসবের অনুবাদের অর্থই হলো পরাতাত্ত্বিক বিশ্বাসের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে ফেলা।

বিনির্মাণবাদী অনুবাদ-তত্ত্বের সারকথা তাই, যেটা অন্য প্রসঙ্গেও তাঁরা বারবার বলেছেন। সেটা আর কিছু নয়, বিকল্প-চিন্তার অভ্যেস সমাজে তৈরি করা, এবং তা সংস্কৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। ডিকনস্ট্রাকশনকে তাই বিকল্পচিন্তার বিকল্প নাম বলা যেতে পারে। প্যারিসেই এর সূত্রপাত, মূলত Tel Quel নামক এক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ষাটের দশকে এই কাগজে আবির্ভাব, এবং আটষট্টির মে মাসের ছাত্র আন্দোলন এই

কাগজকে খুব অনুপ্রাণিত করে। রূপবাদী লেখকেরা এই কাগজের বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড তৈরি করেন। একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একগুচ্ছ ভাবুক, যাদের মধ্যে ফিলিপ সোলারস, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, মার্সেলিন প্লেইনেট, জাঁ পিয়ের ফেই, জ্যাকুলিন রিসে, জাঁ রিকার্ডো অন্যতম; এর সঙ্গে আরো জড়িত ছিলেন রোলাঁ বার্থ, তদোরভ, পিয়ের বুলেয, জাক দেরিদা। তোদোরভ ও ক্রিস্তেভা দু'জনেই বুলেগেরিয়া থেকে এসেছেন এবং গোড়ার দিকে এঁরা ছিলেন রুশ রূপবাদের অনুসারী। লুইস আলথুসার এই সংঘে যদিও ছিলেন না, কিন্তু বেশ প্রভাব ছিলো তাঁর, মিলও ছিলো। কাগজের ভাবুকেরা একদিকে কার্ল মার্কস অন্যদিকে রোমান ইয়াকবসন পাঠ করেছেন, কিন্তু মেলাতে যান নি। সংঘাতের নিরাকারণ, কিংবা যে কোনো ধরনের সমাধানে তাঁদের অরুচি ছিলো, বিকল্প-চিন্তার দুয়ারদিগন্তগুলো খুলে দেয়াকেই তাঁরা কর্তব্য ভেবেছেন। দেরিদার সঙ্গে এদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো, ডিকনস্ট্রাকশনের প্রাথমিক স্তরে দেরিদাও গ্রন্থনবাদের উপযোগ স্বীকার করেন।

যাই হোক, বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, প্রত্যেক টেক্‌স্টই অসম্পূর্ণ ও সম্ভাবনাময়: প্রত্যেক টেক্‌স্টেই শূন্যস্থান, স্খলন, পরিবর্তন থাকে। থাকে বলেই এতে অর্থের নির্দিষ্টতা অকাম্য। বচন-বাচ্যের অর্থের বাঁধুনি শিথিল করার অভিপ্রায়ে যে ডিকনস্ট্রাকশনের জন্ম, অনুবাদ-তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সে যে উৎস-পাঠ ও অন্বিষ্ট-পাঠের ভিন্নতার কথা বলবে, অন্তত গুরুত্ব দেবে, সেটা বলা বাহুল্য।

তবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য কিংবা সমালোচনার, বিনির্মাণবাদী অনুবাদ-তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা কি, এই তর্ক তোলা যায়। আমি মনে করি এর প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট। প্রথম কথা , ডিকনস্ট্রাকশন 'ভাষা'কে মনে করে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা মনে করিনা। আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের শিক্ষকের ভাষা জানার দরকার নেই; ভূগোল গণিত ইতিহাস রসায়নের শিক্ষক ভুল বাক্যে ভুল বাংলা লিখবেন, এইটে আমরা ধরে নিয়েছি। দর্শনের শিক্ষক বাংলায় কিছু লিখলে তা দার্শনিক, অর্থাৎ অপাঠ্য, হতে বাধ্য, এটা আমাদের বোধ-অভিজ্ঞতায় এতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে আমরা কখনো প্রশ্নও করিনা। পশ্চিমের দর্শনের শ্রেষ্ঠ সব ক'টি, অন্তত অনেকগুলো বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে কিন্তু তা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না। যে-গ্রন্থগুলো পশ্চিমের চিন্তা, সমাজ, সভ্যতাকে বদলে দিয়েছিলো, তা অনূদিত হবার পর পড়ার প্রবৃত্তি হয়না কেন ভাববার বিষয়। অনুবাদের অর্থ যদি হয় ভাষাদূষণ বাক্যদূষণ শব্দদূষণ, তাহলে বিনির্মাণবাদী অনুবাদ-তত্ত্ব অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক। যদি তা না হয়, কবে না-হবে জানিনা, তাহলে এই তত্ত্বের আভ্যন্তর শক্তি ও সংস্কৃতি আমরা টের পাবো।

ভিক্টোরিয় উপন্যাসে অপরাধী নারী

বর্তমান মুহূর্তের পশ্চিম সমালোচনাশাস্ত্রকে যেভাবে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করে চলেছে, তার কতটুকু খবর আমরা পাই বলা মুশকিল। পশ্চিমের 'আধুনিক সমালোচনা'র বিষয়গুলো কিন্তু 'আধুনিক' নয়; অর্থাৎ আমাদের ধারণায় 'আধুনিক' নয়। কারণ আমাদের আধুনিকতার বোধ একটু আলাদা : কোনো রচনা সম্পর্কে রিভিয়্যুকার যদি 'নিঃসঙ্গতা' 'বিচ্ছিন্নতা' 'অনিকেত চেতনা' 'অভিযোজন ব্যর্থতা' 'পারক্যবোধ' 'অস্তিত্বের সংকট' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেন, তাহলে সেই রচনাকে আমরা 'আধুনিক' বলি। অনেক সমালোচনায় দেখা যাবে বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি, এবং প্রতিটি উদ্ধৃতির নিচে দু-লাইন ক'রে ভাষ্য : সেই ভাষ্যে একরাশ বিশেষণবাচক শব্দ অনেকটা পতিতার মতো পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। যে-ছেলেটি গ্রাম থেকে এসেছে, যার শরীর থেকে ঘাস-প্রকৃতি-ধান-খড়ের গন্ধ এখনো যায়নি,যে অনেক চেষ্টার পরও কিছুতেই ডিগ্রি পাশ করতে পারছেনা : সে-ও 'আধুনিকতা'র পশ্চাৎধাবন করে, সে-ও পিকাসোর ছবি দিয়ে তার বইয়ের মলাট বানায়; সর্বোপরি সে লেখে 'আধুনিক' কবিতা, এবং আমাদের সমালোচকেরাও তার কবিতা থেকে বিচ্ছিন্নতা শূন্যতা অস্তিত্বসংকট প্রভৃতির মতো 'আধুনিক' বিষয়গুলো খুঁজে বার করেন। আমাদের আধুনিকতার বোধ ও উপলব্ধি এতোই গভীর আর উদ্ভট যে, আমরা প্রাচীন সাহিত্যপাঠ ছেড়েই দিয়েছি। প্রাচীন বলতে আমি বোঝাচ্ছি প্রকাশকালের দিক থেকে যা সমকালীন নয়। আমাদের সাহিত্যচর্চা এখন সবদিক থেকে সমকালীন, কারণ তা দৈনিক কাগজের সাহিত্যপৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ।

বলছিলাম সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যসমালোচনার বিষয়বস্তু ও তার প্রাচীনতার কথা। পশ্চিমের সমালোচকেরা যথেষ্ট পুরনো বিষয় নিয়ে কাজ করছেন এখন, কিন্তু পুরনো বিষয়ের যে বিচার এবং বিশ্লেষণ তঁদের লেখাপত্রে দেখি তা শুধু আধুনিক নয়, উত্তরাধুনিক। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'ভিক্টোরিয়ান স্টাডিজ', অর্থাৎ ভিক্টোরিয় যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন। সমালোচকেরা যে-পদ্ধতিতে এখন ভিক্টোরিয় সাহিত্য পাঠ করছেন, তা দেখে মনে হয় পশ্চিমের দেখার চোখটাই বদলে গেছে। দেখার চোখ বদলালে বিশ্লেষণের ধরনও বদলাবে। বদলেছেও।

ভিক্টোরিয়ান স্টাডিজের একটি সমালোচনা গ্রন্থ নিয়ে এবার কথা বলবো। ভার্জিনিয়া মরিস নামের এক লেখিকা অদ্ভুত শিরোনামের একখানা বই[১] লিখেছেন 'ডাবল জেপ্যারডি : উইমেন হু কিল ইন ভিক্টোরিয়ান ফিকশন' (১৯৯০)। অর্থাৎ ভিক্টোরিয় যুগের উপন্যাসে খুনী নারীদের নিয়ে লেখা বই। 'খুন' এমনিতেই রোমাঞ্চকর, তার ওপর ভিক্টোরিয় উপন্যাসে তার ছড়াছড়ি অনেক বেশি। রোমাঞ্চের কারণেও আমরা অনেক সময় ভিক্টোরিয় উপন্যাস পছন্দ করে থাকি, এ কথা অস্বীকার করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে খুনী যদি

১. Double Jeopardy : Women who kill in Victoran Fiction, by virginia B. Morris. Lexington: University Press of Kentucky. 1990: PP. 182. Price: $ 20.00.

আবার 'পুরুষ' না- হয়ে 'নারী' হয়, তবে তো কৌতূহল ধরে রাখাই কঠিন। কিন্তু ভার্জিনিয়া মরিস মজার জন্যে এ-বই লেখেন নি, খুনী মহিলার খোঁজে বেরিয়ে তিনি গোটা ভিক্টোরিয়া যুগের একটা অর্ধবিচার আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

প্রথম প্রশ্ন হলো, কেন একজন নারী খুন করে? ভিক্টোরিয় উপন্যাসের খুনী নারীদের মনস্তত্ত্বই-বা কি? মরিস বলেন : ভিক্টোরিয় যুগে ধারণাটাই এমন ছিলো যে, 'নারী'রা কোনো অপরাধ করতে পারেনা; যদি অপরাধ করেও বসে, তা অস্বাভাবিক, এবং তা উন্মাদনা মাত্র। কিন্তু নারীরাও অপরাধ করে, ভিক্টোরিয় নারীরাও করতো, এবং তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়পর্বের বহু বহু উপন্যাস।

ভিক্টোরিয় নারীরা শুধু অপরাধ নয়, 'খুনে'র মতো মারাত্মক অপরাধ করতো। কিন্তু এই খুন বা অপরাধ ছিলো মূলত নিজের জীবনের হাজার দুর্ভোগের চূড়ান্ত একটা প্রতিবাদ। অপরাধবিজ্ঞানীরা পুরুষদের অপরাধের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু নারীদের অপরাধকে তারা গুরুত্ব দেন না; নারীর অপরাধকে তারা গণ্য করেন নারীস্বভাব লংঘন করার মতো একটা বিকৃতি। নারীর অপরাধকে তারা ব্যাখ্যা করেন পাগলামি, অস্বাভাবিকতা, হরমোন-ঘটিত ভারসাম্যহীনতা বলে। এককথায় নারীর অপরাধ জৈব গোলযোগের অভিব্যক্তি মাত্র, এবং সেজন্যে তা স্বাভাবিক নয়। নারী যে যুক্তিসংগতভাবে,স্বাধীন চিন্তায়,নিজের দায়িত্বে 'খুন' করতে পারে, অপরাধবিজ্ঞানীর লিঙ্গকেন্দ্রিক মস্তিষ্ক তা ভাবতে পারেনা। ভিক্টোরিয় যুগের বিচারকেরা পর্যন্ত এই মানসিকতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও নারীর খুন বা অপরাধকে ব্যতিক্রম ব'লে গণ্য করতেন। এতে সন্দেহ নেই যে, নারীর অপরাধ গৃহকোণেই সীমাবদ্ধ; ভিক্টোরিয় যুগে 'গৃহ'ই ছিলো নারীর নির্দিষ্ট স্বর্গ ও নরক। নারীর অপরাধও মোটের ওপর পুরুষ, স্বামী, অথবা প্রেমিককে কেন্দ্র করে আবর্তিত : উপন্যাস ও বাস্তব জীবন দুক্ষেত্রেই এটা সত্য। কিন্তু এই গৃহের ভেতর নারীর জীবন যখন দোযখের আগুনে আতপ্ত হয়ে ওঠে, যখন সেই দাহ তার অসহ্য বোধ হয়, তখন নারী অপরাধ করে, তখন সে খুন করে। এই খুন বা অপরাধ বিভিন্ন কারণে : স্বামীর মারধোর-এর জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, প্রতিশোধ বা প্রতিবাদের জন্যে; অপরাধের মধ্য দিয়ে ভিক্টোরিয় নারীরা ওই সমাজ ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

কিন্তু ভার্জিনিয়া মরিস একটা অদ্ভুত তথ্য নির্দেশ করেন আমাদের। ভিক্টোরিয় উপন্যাসের নারীকেন্দ্রিক অপরাধজগতের বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে মরিস দেখান, সে সময়ের উপন্যাস সামাজিক তত্ত্ব বা আইনবিধির তুলনায় কতো এগিয়ে ছিলো। কারণ যে-সময়ের উপন্যাসে অপরাধের কথা আসছে, তখন পর্যন্ত আইন ও সমাজশাস্ত্রীরা এইসব খেয়াল করতে পারেননি। কিন্তু নারীর অপরাধ শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার জন্যে সমাজতাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয়নি (এখনো হয়না), সাহিত্যই তা ঠিক ঠিক ধরিয়ে দেয়। মনে রাখা দরকার স্ত্রী পেটানোর বিরুদ্ধে ব্রিটেনে আইন পাশ হয় অনেক পরে [illegible]

চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, টমাস হার্ডি [illegible]
এমনকি আর্থার কোনান ডয়েলের ফিকশনসমূহ [illegible]
[illegible]

সংঘাত ও আর্ততি। তবে মরিস যে মাঝে মাঝেই সরলীকরণ করেন নি এমন নয়: ডিকেন্স এবং এলিয়টের ক্ষেত্রে সরলীকরণ তো সুস্পষ্ট. কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্য অনেক। মরিস যে প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান. যার কথা একটু আগে বলেছি, তার জন্যে সবচেয়ে যুতসই ঔপন্যাসিক সম্ভবত উইলকি কলিন্স। কলিন্সের উপন্যাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মরিস মনন ও আবেগের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন। উইলকি কলিন্স ভিক্টোরিয় যুগের র‍্যাডিকাল নারী-ঔপন্যাসিকদের একজন. যিনি আগাগোড়া ভিক্টোরিয় মধ্যশ্রেণী. তার মূল্যবোধ. আইন এবং অনুশাসনকে আক্রমণ করেছেন. কলিন্স অত্যন্ত সচেতনভাবে 'অপরাধ'কে ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখায়: 'অপরাধ' তাঁর উপন্যাসে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনিবার্য প্রতিবাদের প্রতীক। জর্জ এলিয়টের 'ডানিয়েল ডেরোন্ডা'র বিশ্লেষণে মরিস যে সরলীকরণ করেছেন, কলিন্সের 'আরমাডেল' এবং 'ম্যান এন্ড ওয়াইফ'-এর আলোচনায় সেই পরিমাণ গভীরতা দেখি। সেজন্যে মরিস কলিন্সের 'ম্যান এন্ড ওয়াইফ' উপন্যাস বিষয়ে সহজেই বলতে পারেন : এই উপন্যাসের একটাই বার্তা. তা হলো. নারীদের যদি বাঁচতে হয়. আত্মরক্ষা করতেই হবে তাদের: আর এতে 'হত্যা'ই একমাত্র পথ, অন্তত আর কোনো পথ নেই (পৃ. ১১৮)। তবে কোনান ডয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন এবং প্রথাবদ্ধ; কোনান ডয়েল ভাবতেন. অন্য অপরাধবিজ্ঞানীর মতো. যে. নারীর অপরাধ স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

ভার্জিনিয়া মরিসের বই কেবল নারীর অপরাধের মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেনা. একইসঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেয়. ভিক্টোরিয় সমাজের আভ্যন্তর সংকট. দাম্পত্যজীবনের অসংগতি. লিঙ্গভিত্তিক শোষণ. প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নিষ্ঠুরতম কারুকার্য। ভিক্টোরিয় সমাজ ছিলো এমন. যেখানে প্রতিবাদ প্রকাশের জন্যে একটাই পথ ছিলো নারীর. তা হলো 'হত্যা'। অপরাধের মধ্য দিয়ে ভিক্টোরিয়া নারীরা কিভাবে স্বাধীনতার দিকে যাত্রা করলো. ভার্জিনিয়া মরিসের বইতে তার বেশকিছু স্কেচ আঁকা আছে।

পুনশ্চ : পরিভাষা ও অনুষঙ্গ

উত্তর-গ্রন্থনবাদী সমালোচনা সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য আমরাও খানিকটা জেনে গেছি। উত্তর-গ্রন্থনবাদী চেতনালোকের অনুবাদকাজে অনেককেই আজ উৎসুক দেখা যায়। চিন্তার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক ও সংঘাত ছাড়া চিন্তার বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাভাষীরা এতোকাল যে ধরনের ভাষা ও ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন, তার সঙ্গে পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্ববিশ্বের যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া পুনরাবৃত্তির ঝোঁক. অভ্যেসের আরাম ও বুদ্ধিশূন্য মস্তিষ্ক নতুন বিষয়কে স্বাগত করার ক্ষেত্রে বাধা। তবুও, তারপরও, যারা এই ভুবনে ঢুকে পড়তে উদগ্রীব, তাদের সমস্যাও অনেক। প্রথম সমস্যা, পরিপ্রেক্ষিতহীনভাবে কিছুই লেখা সম্ভব হচ্ছে না; অর্থাৎ কিছু বলতে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতের বিবরণ জরুরি হয়ে যায়, কেননা সেই পরিপ্রেক্ষিত খুব প্রাথমিক হলেও অনেক পাঠকের সেই ধারণাটুকু নেই। দ্বিতীয়, এবং প্রধান সমস্যা হলো, পরিভাষার সমস্যা। উত্তর-গ্রন্থনবাদী চিন্তা বাংলায় আনতে হলে বিশেষ বিশেষ শব্দ, অনুষঙ্গ ও পরিভাষার ব্যবহার জরুরি। বাংলায় তা নেই। কিন্তু নেই বলেই যে অসম্ভব, তা নয়; ইতিমধ্যে অনেক বাংলা পরিভাষা তৈরিও হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়. মোটেও যথেষ্ট নয়।

'পরিভাষা' আপনা আপনি তৈরি হয়না, অভিধানের শব্দার্থ খুঁজে এবং শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে 'পরিভাষা' তৈরি করা যায় না। 'পরিভাষা'র জন্যে দরকার জ্ঞানচর্চা চিন্তাচর্চা ভাষাচর্চার বিশেষ পরিবেশ, এবং একধরনের সামাজিক সম্পৃক্তি। ব্যক্তিগত উদ্যমে কিছুদূর যেতে পারি, কিন্তু চারপাশের সাংস্কৃতিক অভিরুচি তার সঙ্গে না মিললে অইসব প্রয়াস নিরর্থ হতে বাধ্য। মনে রাখা দরকার, বাংলা একাডেমি অভিধান দিতে পারে, কিন্তু পরিভাষা নয়; আর দিলেও তা আচরিত হবে না (যেমন হয়নি), কেননা তার মধ্যে আশপাশের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মিলনের স্বাক্ষর নেই। সেজন্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'পরিভাষা' নামক বস্তুটি দু-দশ মাস ঘরে বসে থাকলেই তৈরি হয়ে উঠবে না, এবং সেই ধরনের পরিভাষার দরকারও নেই। রেমন্ড উইলিয়ামস যখন "কি-ওয়র্ডস" (১৯৭৬) লেখেন, তখন তা সর্বস্বীকৃত হয়ে ওঠে, কেননা ব্যক্তিগত মনীষার পাশাপাশি তার মধ্যে এসে মিলেছে পশ্চিমের দীর্ঘদিনকার ধারাবাহিক সংস্কৃতি-চেষ্টার উত্তরাধিকার। উত্তর-গ্রন্থনবাদকে যদি আমরা বাংলায় ব্যবহার্য করে তুলতে চাই, বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা ভাঙতে হবে. পাঠ-পরিধি আরো আধুনিক ও আরো সমকালীন করতে হবে।

ইতিমধ্যে অবশ্য চিন্তা ও রচনায় আমাদের খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। আমি একান্তভাবে বাংলাভাষায় লেখালেখির কথাই তুলছি। প্রবাল দাশগুপ্ত. শিশিরকুমার দাশ. গৌতম ভদ্র. দীপেশ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে পোস্টস্ট্রাকচারলিস্ট শব্দ-পরিভাষা-অনুষঙ্গ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। প্রবাল দাশগুপ্ত এমন সব পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন.

ইংরেজি ফরাশি থেকে, যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে থেকে আমি কিছুসংখ্যক পরিভাষা এখানে তুলে দিচ্ছি, পাঠকদের সুবিধের জন্যে। ইংরেজি শব্দগুলো বাংলা উচ্চারণে দিয়েছি। পরিভাষা-প্রণেতাদের নাম পাশাপাশি উল্লেখ করিনি, কেননা তা গবেষকদের কাজে লাগবে, সাধারণ পাঠকের নয়। তাছাড়া গবেষকেরা তা জানেন বলেই বিশ্বাস। পরিভাষার এই তালিকার (যার প্রথম অনুচ্ছেদের প্রায় সবটাই প্রবাল দাশগুপ্তের) পর আমি কিছু কিছু উত্তর গ্রন্থনবাদী অনুষঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, কারো কারো তা প্রয়োজন হতে পারে।

পরিভাষা

কনটেকস্ট: প্রসঙ্গ। রেফারেন্স টু কনটেকস্ট : প্রসঙ্গ-নির্দেশ। ডিসকোর্স: ভাষণ, বহস, বাচকতা। ডিসকার্সিভিটি: সন্দর্ভ। ডিসকার্সিভ প্রাকটিস: সন্দর্ভকার্য। ডিসকার্সিভ ফরমেশন : সন্দর্ভরূপায়তি। পারোল : কথন। পারফরমান্স : নিবেদন, নির্বাহ। ইলোকিউশন : বাচন। কনভারসেশন : কথোপকথন। টার্ন : পালা। টেকস্ট : বয়ান। টেক্সচ্যালিটি : বয়ন। ইন্টারটেক্সচ্যুয়ালিটি : আন্তর্বয়ন। লগোস : বাণী। কমিউনিকেশন : সংকথন। প্রাগম্যাটিক : কার্যবাদী। ফেনমেনন : বস্তুরূপ। নুমেনন : বস্তুরূপ। রিয়ালিটি : বস্তুতা। রিয়ালিজম : বস্তুতাবাদ। ফেনমেনলজি : বস্তুরূপতত্ত্ব। অ্যাপিয়ারেন্স : প্রতিভাস। ক্যাটেগরি : প্রকর। জাঁর : বর্গ। গ্রাম্মাটোলজি : ব্যা-কৃতিবিজ্ঞান। ডিসপার্সন : কলাপ। জুইসাঁস : স্ফুরণ। মেটাফিজিক্স : পরাতত্ত্ব, অধিবিদ্যা। মেটাল্যাংগুয়েজ : অধিভাষা। টেক্সচ্যুয়াল এনালাইসিস : বয়ান বিশ্লেষণ। প্যাসিভ রিডিং : অক্রিয় পঠন। অর্ডার অফ থিংস : বস্তুর বর্গমালা। হার্মনিওটিকস : মর্মোদঘাটনতত্ত্ব। এমপিরিসিজম : নৈদর্শিক ভাবনীতি। লিমিটলেস প্লে : অনন্তরঙ্গ। ক্রীটিক : অধিবিচার। সেন্টার-পেরিফেরি : কেন্দ্র-পরিধি। আপ্রিওরি : পূর্বাক্ষ। আ পোস্তোরিওরি : উত্তরাক্ষ। এমপিরিক্যাল ওয়ার্ল্ড : নিদর্শজগত। রিজন : মনন। প্রিভিলেজ : পুরোভূতি। ডায়ালেকটিকাল : বিসংবাদী। ট্রানসেনডেন্টাল : তুরীয়। ক্যাটেগরিকাল ইমপেরেটিভ : নিত্য অনুজ্ঞা। সাবলিমেশন : উৎকাশ। এনলাইটেনমেন্ট : আলোকপর্ব। এপিস্তেমে : প্রেক্ষা। প্র্যাকটিস : প্রয়োগকার্য। স্ট্রাকচারালিজম : গ্রন্থনবাদ। পোস্টস্ট্রাকচারালিজম : উত্তরগ্রন্থনবাদ। রিপ্রেজেন্টেশন : প্রতিরূপণ। কগনিটিভ : জ্ঞানগত। পপ্যুলার : জনবাদী। মোমেন্টাম : ভরবেগ। হাইপথিসিস : উপকল্প। আইডিওলজি : ভাবনীতি, মতাদর্শ। ফ্রিকোয়েন্সি : পৌন ঃপুন্য। জেনিয়লজি : কুলুজিতত্ত্ব।

হিস্টরিওগ্রাফি : ইতিহাসবিদ্যা। মডেল : প্রতিকল্প। র‍্যাডিকাল : আমূলবাদী। ইনডেজেনাস : দেশজ। টোটেম : কুলকেতু। এলিয়েনেশন : ঐতরিকতা। হায়ারারকি : থাকবন্দী। সেমিওলজি : চিহ্নবিজ্ঞান। এলিট : উচ্চকোটি, উচ্চবর্গ। ডিকনস্ট্রাকশন : নির্মাণউন্মোচন, গ্রন্থনমোচন। সাবঅলটার্ন : নিম্নকোটি, নিম্নবর্গ। ক্যারিযমা : কুহক। ডোমেইন : ডাঙা। টেলিওলজি : উদ্দেশ্যবাদ। প্যারাডাইম : আদিকল্প। প্লুরালিস্টিক : অনেকত্ববাদী। মিথ : অতিকথা। পজিটিভিজম : দৃষ্টবাদ। ইন্টারসেকশন : প্রতিচ্ছেদ। করেসপন্ডেনস : প্রতিষঙ্গ। হাই কালচার : মার্গ সংস্কৃতি। সাবজেক্ট : কর্তা, বিষয়ী।

অবজেক্ট : বিষয়। টেক্সচার : বুনট। ইনভার্সন : বিপর্যয়। হেটরোজেনেইটি : সাংকর্য। প্যাটার্ন : রূপকল্প। ডুয়ালিটি : উতোর-চাপান।

মাস্টার ন্যারেটিভ : কাহিনীকল্প। লেট ক্যাপিটালিজম : পরিণত পুঁজিবাদ। সাইমুলটেনেটি : যুগপত্তা। কনসারভেটিজম : সংরক্ষণবাদ। টেলস : পরমকারণ। ক্লোযার : আবদ্ধতা। কোড : সংকেত। আটারেন্স : উক্তি। টাইপলজি : প্রকারতত্ত্ব। রেফারেনশিয়াল : নির্দেশী। হোমোজেনিটি : সমজনিতি। ডিজাইন : আকল্প। ডাইকটমি : দ্বিভাজন। ফাংশন : বৃত্তি। পলিফনি : বহুস্বরসঙ্গতি। পলিফনিক-ডিসকোর্স : বহুস্বর বিবরণ। ব্রোকেন : ক্ষুন্ন। ডায়ালজিক : সংলাপপ্রধান। সিমানটিক ডিজাইন : বাগর্থিক আকল্প। কোডিফিকেশন : সংকেতায়ন। সারফেস স্ট্রাকচার : বহিরঙ্গ-সংস্থান। স্ট্রাকচারাল থিওরি : আকরণতত্ত্ব। মেটোনেমি : লক্ষণা। সেক্সচুয়াল পলিটিক্স : লৈঙ্গিক রাজনীতি। ফ্যালিক ক্রিটিসিজম : শৈশ্নিক সমালোচনা। ক্লোযার : আটক-ফাটক। কনস্ট্রাকট : নির্মিতি। স্পীচ : বাচন। বাইনারি অপজিট : বিপরীত যুগ্নপদ। প্রবলেমেটিক : সমস্যাপট। ট্রানসেনডেন্টাল সিগনিফাইড : পরম চিহ্নন। ভলান্টারিসম : স্বেচ্ছাবাদ। মাইগ্র্যান্ট ইনটেলেজেনসিয়া : পরবাসী বুদ্ধিবৃত্তি। প্লুরাল ন্যারেটিভ : বহুবাচক আখ্যান। হেগেমনি : প্রাধিকার। ডেভেলপিং ডিসকোর্স : জায়মান বাচকতা।

অনুষঙ্গ

কার্নিভাল : রুশ উপন্যাসতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন 'কার্নিভাল'কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। কার্নিভাল তাঁর বিবেচনায় লোক-প্রতীপ-সংস্কৃতির (পপুলার কাউন্টার কালচার) একটা বিশেষ আঙ্গিক। রেনেসাঁস ও মধ্যযুগের কার্নিভাল উৎসবকে গুরুত্ব দেবার কারণ, সমকালীন সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে 'কার্নিভাল' সত্যিই এক কাউন্টার কালচারের আবেদন অমোঘ করে তোলে। কার্নিভালে কোনো বন্ধন নেই, কার্নিভাল সকল আপিশী নিয়ম, কানুন ও শৃংখলার বিপরীতে ভাষাগত সংস্কৃতির বেগানা আয়তন তুলে আনে। সামন্ত সংস্কৃতির গাম্ভীর্য কার্নিভালে এসে ভেঙে পড়েছে, বাখতিন লক্ষ করেন। কার্নিভালের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও অনির্দিষ্টতা যাই থাক, ফোক কার্নিভাল রঙ্গরসের একটা একক সংস্কৃতি এর ভেতর রয়ে গেছে। মিখাইল বাখতিনের মতে শিল্প ও জীবনের সীমান্তরেখায় অই সংস্কৃতির অবস্থান। বাখতিনের 'কার্নিভালেস্ক' এক প্রতীপ-সংস্কৃতির মূর্তরূপ—যা একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও লোকমনস্ক ও গণতান্ত্রিক, এবং যা দাপ্তরিক কেজো সুশৃংখল (ফরমাল/হায়ারারকিকাল) সংস্কৃতির বিপরীত। বাখতিনের পলিফনি বা বহুস্বর অনুষঙ্গটি কার্নিভালের সঙ্গে ওতোপ্রোত।

সাম্প্রতিককালে 'কার্নিভাল' বা 'কার্নিভালেস্ক' অবশ্য ঐতিহ্যিক-স্বতস্ফূর্ত কাউন্টার-কালচার নির্দেশ করে। বাখতিন কার্নিভালে দেখেন 'অট্টহাসি' নামক এক উদ্দীপক সাংস্কৃতিক উপাদান, যা আপিশী সংস্কৃতি কখনো অনুমোদন করেনি। দস্তয়েভস্কির উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে বাখতিন কার্নিভালের অমোঘ প্রস্বর আবিষ্কার করেন তাতে, এবং বলেন : কার্নিভাল বাস্তবতার বোধ ও বিচারের ক্ষেত্রে সবসময় অনুসরণ করে জীবন্ত বর্তমান ও তার অভিজ্ঞতাকে, লিজেন্ডকে নয়; আর কার্নিভালের বৈশিষ্ট্য তার শৈলীর বহুত্বে, বহুস্বর বাচন ও অনির্দিষ্টতায়।

বায়োক্রিটিসিজম : নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনার একটা ধরন। নারীবাদী সমালোচকেরা মনে করেন সাহিত্যকাজের বিশ্লেষণে শরীরতাত্ত্বিক উপাদানরাশি সর্বাগ্রে খুঁটিয়ে দেখা দরকার; কেননা, নারীবাদীরা জৈবতাত্ত্বিক জেন্ডারের ভিন্নতাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়।

এসিমিলেশন : এসিমিলেশন বা সমীভবন। মিখাইল বাখতিনের একটা পরিভাষা। উপন্যাসবিধৃত চরিত্র কখনো কখনো অপর একটি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ মিলিয়ে ফেলে নিজের চৈতন্যের সঙ্গে, বাখতিন তাকে 'এসিমিলেশন' বলেন। বাখতিনের 'সমীভবন' পরিভাষাটিকে স্যামুয়েল কোলরিজের 'উইলিং সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ' কথাটি দিয়েও বোঝা যেতে পারে।

আওরা : বিখ্যাত মার্কসিস্ট নন্দনতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেনজামিনের বহুব্যবহৃত পরিভাষা। 'আওরা' মূলত এক ধরনের মরমী অনুভব বা উপলব্ধি— যা শিল্পকাজ কিংবা প্রাত্যহিক কোনো বিনিময়কে (যেমন 'হ্যালো' শব্দটি) ঘিরে থাকে। ওয়াল্টার বেনজামিনের মতে, অন্যান্য অনেক কিছুর মতো, এই আওরা-ও, যন্ত্রপ্রকৌশলের যুগে নষ্ট হয়ে গেছে।

অথর : শব্দটি কিছুকাল আগেও খুব সাধারণ (ও স্বাভাবিক) একটা শব্দ ছিলো। কিন্তু ১৯৭৭ সালে রোঁলা বার্থের 'দি ডেথ অফ দি অথর' এবং ১৯৮০ সালে মিশেল ফুকোর 'হোয়াট ইজ এন অথর' প্রকাশিত হওয়ার পর 'অথর' (রচয়িতা) কনসেপ্ট জটিলতায় আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে লেখক/রচয়িতা/অথর সূক্ষ্মতর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ফুকোর মতে, যে কেউ 'লেখক' নয়; কেননা তাহলে স্বাক্ষরিত পত্রের লেখককেও লেখক বলতে হবে। 'লেখক' তিনি, যার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে অই সময়ের পুরো 'ডিসকোর্স' ও তার 'সার্কুলেশন' সম্পর্কে বলতে হয়। 'অথর' শব্দটি কিভাবে দেখা দিলো ইউরোপে, তার উৎস সন্ধান করেছেন বার্থ ও ফুকো; বুঝেছেন, 'অথর' ধারণাটির সঙ্গে মতার্দশেরও একটা যোগ আছে— অর্থাৎ 'লেখক' হলেন 'মর্যাদাবান ব্যক্তি'। বার্থ ও ফুকো মর্যাদার অই বোধ, বিভাব ও কিংবদন্তী থেকে 'অথর' কনসেপ্টটিকে মুক্ত করেন, যে-কারণে আজকে 'অথরে'র চেয়ে 'টেকস্ট' গুরুত্বপূর্ণ : 'অথর' এবং 'টেকস্ট' কে 'পরে' এবং 'আগে' শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। মিশেল ফুকো স্পষ্ট বলেছেন : 'দি অথর এন্ড দি লিভিং পার্সন হু রোট দি ওয়ার্ক শুড নট বি একোয়েটেড'। আগে 'লেখক' ছিলেন 'ইশ্বর' কিংবা 'ইশ্বরপ্রতিম', সেই লেখকইশ্বরের সিংহাসন উত্তরাধুনিক কলিকালে বিধ্বস্ত। উত্তরাধুনিকতাবাদ 'অরিজিন'-এর (উৎস/মূল) বিরুদ্ধতায় উচ্চকণ্ঠ, 'অথর' ধারণাটির পরিবর্তনের মধ্যেও তা উদ্ভাসিত। সেজন্যেই বার্থের স্মরণীয় উক্তি : পাঠকের জন্ম হতে পারে কেবল লেখকের মৃত্যুর বদৌলতে। লেখকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত না হলে বহুবাচনিক বিশ্লেষণ অসম্ভব।

ফ্লিকার : ব্র্যায়ান ম্যাকহেল এই পরিভাষার উদ্ভাবক। একটি টেকস্টে যখন যুগপৎ একাধিক বিকল্প-অর্থ খেলা করে, এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া অসম্ভব হয়—তাকে বলে 'ফ্লিকার'।

ডায়ালযিক : সংলাপ-প্রধান। এই শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে মিখাইল বাখতিনের লেখাপত্র ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ার সূত্রে ডায়ালজি, ডায়ালগ, ডায়ালজিক,

ডায়ালজিকাল প্রভৃতি শব্দ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। 'সংলাপ' বলতে এমনিতে যে ধারণা প্রচারিত ছিলো, বাখতিনের বিশ্লেষণ ও ভাবনা তাতে পরিবর্তন আনে। বাখতিন ডায়ালজিকে কেবল উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিশেবে নয়, বরং মানবভাষারই এক স্বভাব বলে চিহ্নিত করেন। একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মৌখিক বিনিময়কে 'ডায়ালগ' বলি আমরা; কিন্তু ব্যখতিন এবং তাঁর সতীর্থ ভলোনিসভ বললেন : মৌখিক আন্তরক্রিয়া হলো ভাষারই একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেজন্যে বাখতিন দেখান, 'ডিসকোর্স' বা 'আটারেন্স' যাকে বলা হয়—তাতে যদিও দৃশ্যত অই মিথষ্ক্রিয়া নেই, কিন্তু অন্তর্লীনভাবে আছে। কেননা, বাখতিনের মতে : যে কোনো উচ্চারণ অন্য উচ্চারণকে মিশিয়ে নেয়, যে কোনো উচ্চারণই অনেক সংগোপন মিথষ্ক্রিয়ায় আকারিত, এবং যে-কোনো উচ্চারণই অন্য উচ্চারণকে গ্রাস করে ফেলে, এক উচ্চারণের অস্থিতে অন্য উচ্চারণের শোনিত মিশে যায়। বাখতিন ভাষা ও তার উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্যকে সংলাপের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেন, যেজন্যে বাখতিনের চোখে 'ভাষা' সবসময় এক সপ্রাণ ডায়ালজি। বাখতিন উদাহরণ দিয়ে বলেন, একজনের পোশাক যদি অন্যজন পরে, সেই পোশাক যদি আবার অন্যের গায়ে ওঠে—তাহলে প্রথম ব্যক্তির পোশাকের গন্ধ তা থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য : ডায়ালজির ভেতর দিয়ে ভাষারও অই রকম চরিত্র বদল ঘটে। মিখাইল বাখতিনের এই 'ডায়ালজিক' ধারণাটির সঙ্গে বর্তমানকালের 'ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি' ও 'ট্রানসটেক্সচ্যুয়লিটি' এবং হ্যারল্ড ব্লুমের 'অ্যাংযাইটি অফ ইনফ্লুয়েন্স' কনসেপ্টসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

কালচার : রেমন্ড উইলিয়ামসর মতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজি ভাষার দু-তিনটি জটিলতম শব্দের অন্যতম। "চাবিশব্দগুচ্ছ" (১৯৭৬) বইতে 'সংস্কৃতি' নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা বিশদ ও জটিল। তবে, আধুনিক ব্যবহারে 'কালচার' শব্দটি মোটামুটি তিনভাবে প্রযুক্ত হয় : (১) বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মগত ও নান্দনিক উন্নয়নের সাধারণ প্রক্রিয়া (২) জীবনের একটা বিশেষ পথ ও পদ্ধতি (৩) বুদ্ধিবৃত্তিক, বিশেষত শৈল্পিক, কাজ ও প্রাকটিস।

সাম্প্রতিক সমালোচনায় 'সংস্কৃতি' শব্দটির আয়তন বেড়ে গেছে অনেক। তবে, একান্তভাবে মার্কসিস্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে যারা সাহিত্যকে সামাজিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চান, তারাই এই শব্দটিকে ওরকম বড়ো একটা ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেন। 'সংস্কৃতিকে' ওরকম বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার কারণে ইউরোপ আমেরিকায় 'কালচারাল স্টাডিজ' এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় বিভাগে পরিণত।

আশির দশকে ব্রিটেনে 'কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজম' নামক একটা পরিভাষা সৃষ্টি হয়। চৈতনের দিক থেকে এটা (বিশেষত) মার্কিনী 'নিউ হিস্টিরিসিজমে'র কাছাকাছি। 'কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজম'-এ 'সংস্কৃতি'কে ভাবা হয় বিভিন্ন ডিসকোর্সের একটা 'সিস্টেম' হিশেবে; স্বভাবত 'পপুলার ম্যাটেরিয়াল' বা 'লোকবাদী বস্তুনিচয়ে' এর মনোযোগ বেশি। তবে প্রাচীন ও বহমান, মার্কসীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সংস্কৃতি ভাবনার মিল আছে।

বর্তমান যুগে 'কালচারাল স্টাডিজ' নামক বিশেষ ধরনের ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণার ক্ষেত্র সৃষ্টির মূলে যে মনস্বীর অবদান সবচেয়ে বেশি, তাঁর নাম রেমন্ড উইলিয়ামস।

১৯৬৪ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় 'সেন্টার ফর কনটেমপরারি কালচারাল স্টাডিজ'। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কালচারাল স্টাডিজ' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

কোড : 'কোড' বা সংকেত। সেমিওটিকসের প্রভাবে 'কোড' পরিভাষাটি এখন অহরহ ব্যবহৃত হয়। রোঁলা বার্থের কথাই বলি। বার্থ বলতে চান, 'টেক্স্ট' হলো বিভিন্ন কোড-এর সমন্বিত রূপ : টেক্স্ট বুঝতে হলে অই 'কোড'গুলো বুঝতে হবে, এবং অই কোডগুলোর অনুধাবন ছাড়া বিশ্লেষণ অসাধ্য।

রোঁলা বার্থের মতে, কোনো একটা সাহিত্যকর্মপাঠ করার ক্ষেত্রে পাঁচ ধরনের 'কোড' বিবেচ্য : (১) প্রোয়েইরিটিক কোড : পাঠকের সাহিত্যপাঠে এটি অনুধাবনের ধরন নিয়ন্ত্রণ করে; (২) সেমিক কোড : এই কোড পাঠ্যবস্তুর উপাদাননিচয়ের সঙ্গে যুক্ত, যে উপাদানগুলো সাহিত্যিক চরিত্রসমূহের অনুধাবনের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; (৩) সিম্বলিক কোড : প্রতীকী অর্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কোড পাঠককে নিয়ন্ত্রণ করে; (৪) রেফেরেনশিয়াল কোড : এই কোড বয়ানবিধৃত উল্লেখের সঙ্গে জড়িত।

রোঁলা বার্থ বলতে চান, সাহিত্য পাঠের অর্থ হলো এই সংকেতগুলোর অনুসরণ ও অনুধাবন, এবং একেই তিনি নাম দেন 'টেক্সচ্যুয়াল এনালাইসিস'।

হোমোলজি : সমস্তর। 'হোমোলজি'কে কেউ কেউ 'স্ট্রাকচারাল প্যারালেলিজম'ও বলেন। অর্থাৎ আবয়বিক সাদৃশ্য বা পুনরাবৃত্তি। এটা হতে পারে কোনো একটা নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মে, অথবা অন্য ক্ষেত্রে। যেমন ভাষার সংগঠন ও মানবিক অবচেতনের সাদৃশ্য। সাংগঠনিকেরা দাবি করেন এই সমস্তর বা হোমোলজি ভাষার সিস্টেমের মধ্যে যেমন আছে, আছে অন্য সিস্টেমেও। জ্ঞাতিসম্পর্ক থেকে সাহিত্য পর্যন্ত এর বিস্তার। এই জায়গায় এসে সাংগঠনিকেরা বলেন, ব্যাকরণিক বাক্যে যেমন, তেমনি কোনো সাহিত্যকর্মের ন্যারেটিভ সিনট্যাক্সেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিখ্যাত সমালোচক তোদোরভ তাই বলেন : সাহিত্যের একটা চরিত্র হলো 'বিশেষ্য' এবং তার কর্ম হলো 'ক্রিয়া' : আর এই দু'য়ের সম্মিলনে যে-কোনো আখ্যানের প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়। ফরাশি মার্কসিস্ট সমালোচক লুসিয়ান গোল্ডম্যান আরো এগিয়ে গেছেন: তিনি শ্রেণী পরিস্থিতি, বিশ্বদৃষ্টি ও শিল্পগত আঙ্গিকের ভেতর হোমোলজির কথা বলেন। তবে ফ্রেডরিক জেমসন বলেন : হোমোলজি আছে, কিন্তু সেটার সঙ্গে 'মেডিয়েশনে'র মিল নেই— কেননা হোমোলজির সাদৃশ্য সংগঠনিক স্তরে, আর মেডিয়েশন একধরনের নির্ভরতা, হেঁয়ালি, মন্ময়তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

হট এন্ড কুল মিডিয়া : গরম ও ঠান্ডা মাধ্যম। মার্শাল ম্যাকলুহান ব্যবহৃত শব্দ। ম্যাকলুহান মিডিয়া টেকনোলজির সবচেয়ে সংবেদনশীল বিশ্লেষক: তাঁর মতে : হট মিডিয়া সর্বদা স্বয়ম্পূর্ণ, তার ভেতর ভরানোর কোনো পরিসর নেই; আর 'কুল মিডিয়ায়' খানিকটা পরিসর আছে। রেডিও-সিনেমাকে ম্যাকলুহান 'হট মিডিয়া' মনে করেন, আর টেলিফোন-টেলিভিশনকে নাম দেন 'কুল মিডিয়া।' ম্যাকলুহানের মতে 'হট মিডিয়া' সবসময় 'হাই ডেফিনিশনে' উচ্চকণ্ঠ।

হেটরোগ্লসিয়া : মিখাইল বাখতিনের মতে বহুবাচনিক সামাজিক স্বর ডায়ালজির

কারণে পরস্পরসম্পৃক্ত হয়, এবং তা, লেখকের কথা বিবরণকারের কথা ও চরিত্রের উচ্চারণমালার সমবায়ে উত্থাপিত হয় উপন্যাসে : এই মুহূর্তটিকে বাখতিন 'হেটরোগ্লসিয়া' বলে চিহ্নিত করেন।

গ্রাম্মাটোলজি : প্রবাল দাশগুপ্ত এর বাংলা করেছেন 'ব্যাকৃতিবিজ্ঞান'। তবে জাক দেরিদার মতে : 'গ্রাম্মাটোলজি' ভাষার ব্যাকরণ নয়, বরং লেখার বিজ্ঞান (সায়েন্স অফ রাইটিং)— যে বিজ্ঞান স্বাধীনতার চিহ্নমালা মেলে ধরে সারা দুনিয়ায়। তবে এই শতাব্দীতে জাক দেরিদার পূর্বে শব্দটি ব্যবহার করেছেন আই. যে. যেলভ, পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত তাঁর বইটির নাম : "এ স্টাডি অফ রাইটিং : দি ফাউন্ডেশনস অফ গ্রাম্মাটোলজি" (১৯৫২)। দেরিদার লেখার বিজ্ঞান অবশ্য কোনো ফর্মূলা নয়, প্রেসক্রিপশন নয়, ব্যাকরণ নয়, দেরিদা বরং স্বাধীন লেখনের কথাই বলেন : যে 'লেখন' কোনো কিছুকে প্রশ্নোর্ধ ভাববেনা; ফলে একদিকে তা অন্তর্বিরোধময়, অন্যদিকে নিজেই নিজের সমালোচক।

আসলে দেরিদা 'গ্রাম্মাটোলজি' শব্দটিকে ফের্দিন দ্য সোসুরের 'সেমিওলজি'-শব্দের বিকল্পরূপে উত্থাপন করতে চান, এবং করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক অধস্তনতা ও ব্যাখ্যাকেন্দ্রিক নির্যাতন থেকে দেরিদা 'রাইটিং' ব্যাপারটাকে মুক্ত করতে আগ্রহী।

জেন্ডার : বাংলায় বলি 'লিঙ্গ'। বলা দরকার 'অজৈব লিঙ্গ'। নারীবাদীদের মতে, যেসব সামাজিক সাংস্কৃতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, 'সেক্স'-এর দিক থেকে বি-ভিন্ন জৈব প্রজাতির উপর, আরোপ করা হয় তা-ই 'জেন্ডার'। সহজ কথায়, 'জেন্ডার' সমাজ বা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, আর 'সেক্স' জৈবতাত্ত্বিক। এইভাবে বুঝে নিলে 'জেন্ডার' ও 'সেক্স'-এর পার্থক্য সহজে বোঝা যাবে।

প্রেজেন্স : 'উপস্থিতি'। জাক দেরিদার মতে যেসব নাম (বা বিষয়) মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত (যেমন 'এসেন্স', 'একজিসটেন্স' 'সাবসট্যান্স', 'সাবজেক্ট')—তাই 'প্রেজেন্স'। যেমন 'গড' যেমন 'ম্যান' : পশ্চিমের চিন্তা, মন ও মস্তিষ্কে এইগুলো বিষয়ে বিশেষ রকম ধারণা এক সার্বক্ষণিক 'উপস্থিতি'। উপস্থিতির কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে জন্ম নেয় ব্যাখ্যাকেন্দ্রিক বিশ্বাস (লোগোসেন্ট্রিক বিলিফ), এবং একেই দেরিদা 'মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স' বা উপস্থিতির পরাতত্ত্ব বলেন।

সাইন : চিহ্ন। সেমিওটিক্স সাম্প্রতিক সাহিত্য সমালোচনাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে। সেমিওটিক্স 'চিহ্ন' ও 'চিহ্নের প্রকৃতি' নিয়ে কথা বলে; সংস্কৃতি ও ইতিহাসে এই চিহ্নের জীবনরূপ সন্ধান করে 'সেমিওটিক্স'। তবে কথা হলো, যাকে আমরা যোগাযোগ বলি তা সাহিত্যে এবং সাহিত্যের বাইরেও আছে। তবে 'সাইন' এবং 'সিস্টেম' এক নয়, যেমন এক নয় 'ইনটেনশন' ও 'মোটিভেশন'।

'সাইন' কথাটির প্রবর্তক সোসুর। সোসুর 'ভাষা'কে মনে করেন 'সাইন সিস্টেম', অর্থাৎ চিহ্ন-ব্যবস্থা। অর্থাৎ 'ভাষা' হলো চিহ্নের সমষ্টি, তবে এই 'সাইন' বা 'চিহ্ন'কে ভাষাবহির্ভূত বিষয়-আশয়েও বুঝবার চেষ্টা হয়েছে, এভাবে দেখা দেয় সেমিওলজি।

পরবর্তীকালে সোসুরকে অনুসরণ করে সোসুরকে অতিক্রম করার প্রয়াস দেখা যায় পোষ্ট-স্ট্রাকচারালিস্টদের মধ্যে। তাঁরা বললেন, যেমন দেরিদা, যে, বচন ও বাচ্য পরস্পর সম্পর্কিত নয়: দেরিদা টেক্স্টের 'ইনটেনডেড মিনিং'-এর সঙ্গে তার 'প্লেফুল মিনিং'-এর

পার্থক্য করেন এইভাবে। সোসুর ভাষাকে সিস্টেম হিশেবে দেখেছেন, সোসুরও ভাবেননি যে ভাষার চিহ্ন ও চিহ্নের সম্পর্ক পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো—কিন্তু অস্বীকারও করেননি তিনি। পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা অস্বীকার করেছেন। 'ভাষা'র সঙ্গে 'এক্সট্রা-লিংগুইস্টিক রিয়েলিটি'র সম্পর্ক নেই, এটা সোসুরও বলেছেন— তবে অতো জোর দিয়ে বলেননি, বলেছেন উত্তর-অবয়ববাদীরা : উত্তর-আবয়বিক সাহিত্য ও তার সমালোচনা তাই জীবন থেকে, সমাজ থেকে এবং ইতিহাস থেকে বিচ্যুত।

ডিসেমিনেশন : দ্যোতিতের (সিগনিফাইড) অনুপস্থিতিতে অর্থের অনন্ত সম্ভাবনার জন্যে দ্যোতকের (সিগনিফাইয়ার) বিচিত্র রঙ্গকে জাক দেরিদা 'ডিসেমিনেশন' বলেন। 'ডিসেমিনেশন' ও 'এমার্সনীয় দুর্বোধ্যতা'— এক নয়, আলাদা : ডিসেমিনেশনের নব নব অর্থের সম্ভাবনা স্বত:স্ফূর্ত, এবং এই অর্থসমূহ কোনোভাবেই লেখকের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; ডিসেমিনেশনের অর্থসম্ভাবনা ও অর্থসৃষ্টির মূলে একমাত্র উপাদান—ভাষা, অন্য কিছু নয়।

গ্যাপ : শূন্যস্থান। পাঠ ও পাঠককেন্দ্রিক সমালোচনায় (রিডার-রেসপনস ক্রিটিসিজম) গ্যাপ বা 'শূন্যস্থান' শব্দটি বারবার আসে। জর্মন সমালোচক উলফগ্যাং আইশার টেক্স্টের বিভিন্ন ব্লাঙ্ক বা খালি জায়গার কথা বলেন; তাঁর মতে, টেক্স্টের এই শূন্যস্থানপূরণের দায়িত্ব পাঠকের। এই শূন্যস্থান থাকে শব্দের ভেতরে, বাক্যের ভেতরে; অনু-যৌগ-উপবাক্যের অভ্যন্তরে, অনুচ্ছেদে, স্তবকে। পাঠকের দায়িত্ব হলো, ঐসব শূন্যস্থানে সাড়া দেয়া—সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীলভাবে। আইশার বলতে চান, যে কোনো টেক্স্টে শূন্যস্থান থেকে যায়, এবং তা অ-নিবার্য : হতে পারে তা দুরূহ, অস্বচ্ছ, জটিল, এমনকি অনির্দিষ্ট (ইনডিটারমিনেট)।

মূলত এই শূন্যস্থানের উৎস পাঠকের পাঠ ও উপলব্ধির বিচিত্র্য। একজন পাঠক বিভিন্ন টেক্স্টে এই শূন্যতা পেতে পারেন, কিংবা অভিন্ন টেক্স্টে বিভিন্ন গ্যাপ থাকতে পারে; এবং তা পূরণ করা যেতে পারে নানাভাবে। কাজেই টেক্স্টের পাঠ, বোধ ও উপলব্ধি বহুরকম হতে বাধ্য, এবং হওয়া উচিত।

পাঠককেন্দ্রিক সমালোচনায় 'পাঠ' ব্যাপারটা নিষ্ক্রিয় আর থাকে না, হয়ে ওঠে সক্রিয়, উদ্দীপক, সংকেত ও সংঘাতময়। ডিকনস্ট্রাকশন এইভাবে যে-কোনো বয়ানের র‍্যাডিকাল আত্মবিরোধ তুলে আনে।

আইডিওলজি : মতাদর্শ বা ভাবাদর্শ। 'মতাদর্শ' মূলত বিশ্বাসের একটা ব্যবস্থা, যাতে অন্তরিত মানুষের প্রথা, আচরণ, স্বভাব, অনুশীলন ও প্রাকটিস। মতাদর্শ সাধারণত বিশেষ বিশেষ সমাজসংঘের সঙ্গে যুক্ত। সমাজসংঘের সদস্যরা তাদের মতাদর্শকে মনে করে অভ্রান্ত, প্রাকৃতিক, এমনকি য়ুনিভার্সাল বা বিশ্বজনীন। কিন্তু কোনো একটি 'মতাদর্শ' কোনো একটি সমাজের জন্যে হয়তো অভ্রান্ত, কিন্তু তা হতে পারে অন্য সমাজের জন্যে একেবারে বিপরীতধর্মী ও মিথ্যা। একই সমাজের ভেতর থাকতে পারে বিভিন্ন মতাদর্শ, তার মধ্যে এক বা একাধিক হয়তো নিয়ন্ত্রক।

মতাদর্শ কখনো শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আচরিত হয়। কখনো আপনাতেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে মতাদর্শিক বিশ্বাস সবসময় সচেতনভাবে নয়, কখনো

অচেতনভাবে গৃহীত হয়। জোহানা স্মিথ নামের একজন সমালোচক ভালোই বলেন 'মতাদর্শ' আমাদের সকল অভিজ্ঞতার অপরীক্ষিত ভিত্তিভূমি'।

'কোনো' টেক্স্টই মতাদর্শ এড়াতে পারে না, এবং যে কোনো 'টেক্স্ট' কোনো কোনো মতাদর্শের প্রতিফলক। সেজন্যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যজগতে টেক্স্টের মতাদর্শিক পুনর্বিচার গুরুত্ব পাচ্ছে খুব বেশি। এডওয়ার্ড সাইদ, ফ্রেডরিক জেমসন এই ধরনের সমালোচনার অভিযাত্রিক।

ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি : টেক্স্টের ভেতরকার আন্ত:সম্পর্কের পরিস্থিতিকে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বলা হয়। প্রত্যেক লেখকই অন্য অন্য লেখক বা লেখকের টেক্স্ট দ্বারা প্রভাবিত, এবং প্রত্যেক টেক্স্টই বিভিন্ন টেক্স্টের দিকে উন্মুখ। টেক্স্টের ভেতর বিচিত্র উল্লেখ থাকে, এবং থাকা স্বাভাবিক; সেই উল্লেখ সর্বদা সুস্পষ্ট নয়, কখনো কখনো সংগোপন ও আচ্ছাদিত; লেখকেরা বিভিন্নভাবে অতিক্রান্ত বয়ানের প্রতিধ্বনি করেন—চেতন কিংবা অচেতনভাবে। পাঠকের কর্তব্য হলো : এই 'আন্তরপাঠকেন্দ্রিক সম্পর্কের' (ইন্টারটেক্সচুয়াল রিলেশনশিপ) আবিষ্কার ও বিবেচনা। উত্তর-আবয়বিক সমালোচকেরা এমনও বলেছেন যে, আন্তর্বয়ানের সূত্র ছাড়া টেক্স্টের অর্থোপলব্ধি ও ব্যাখ্যান অসাধ্য।

কেউ কেউ সাহিত্যকাজের সঙ্গে অপরাপর ডিসকোর্সের সম্পকর্কেও 'ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি' বলেন; যেমন যোশেফ কনরাডের 'হার্ট অফ ডার্কনেস' উপন্যাসে সঙ্গে সমকালীন ডিসকোর্সের সম্পর্ক। এডওয়ার্ড সাইদ এই ইন্টারটেক্সচুয়াল পদ্ধতিতে কনরাডের উপন্যাস পাঠ করেছেন।

ন্যারেটিভ : গল্প, অথবা। 'ন্যারেটিভ' শব্দটিকে এখন অনেকখানি শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়। ন্যারেটিভের বাংলা 'আখ্যান' চলতে পারে। 'আখ্যান' (ন্যারেটিভ) বলতে যেমন কনরাডের 'হার্ট অফ ডার্কনেস' বুঝবো, তেমনি ফ্রেডরিক কার্লের লেখা কনরাডের 'জীবনী'ও আখ্যান ছাড়া কিছু নয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কেস হিষ্ট্রিগুলোও আখ্যান বই কি ! আরো সাধারণভাবে 'ন্যারেটিভ' শব্দটির প্রয়োগ করা হয় আজকাল—যেমন ব্রুক টমাসের লেখা 'সাইকোএনালিসিস ন্যারেটিভের অবচেতন যাত্রা'।

ডিসকোর্স : সাধারণভাবে 'ডিসকোর্স' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় : (১) কোনো একটা বিষয় বা জ্ঞানের এলাকার লিখিত বা মৌখিক আলোচনা (২) নির্দিষ্ট আখ্যানের বিশেষ কোনো অবস্থান, যা বিশেষ কিছু বিষয়ের জন্যে তর্ক করে, অথবা যা একটা নির্দিষ্ট 'ভ্যালু সিস্টেম' বা মূল্যব্যবস্থার জন্যে লড়ে। এজাজ আহমদ 'ডিসকোর্স' বলতে বোঝেন 'এপিস্টেমিক কনস্ট্রাকশন' বা জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্মাণ, অর্থাৎ যার উদ্ভব ও বিকাশ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ঘটে। আরো সাধারণভাবে বললে, 'ডিসকোর্স' হলো যে ভাষাকাঠামোতে কোনো একটা বিষয়, অথবা জ্ঞানের কোনো একটা এলাকা আলোচিত-বিশ্লেষিত হয়। ডিসকোর্সেই আকারিত ও সংগৃহীত হয় মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা। একটা সমাজও তৈরি হয় বিভিন্ন ডিসকোর্স অথবা 'ডিসকোর্স কমিউনিটি' দ্বারা : যেমন ডিসকোর্সের কোনো কোনোটি নিয়ন্ত্রক মতাদর্শ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ডিসকোর্সের থাকে নিজস্ব শব্দ, সংকেত, ভাষা, কানুন, শৃংখলা : ডিসকোর্স সৃষ্টি করে জ্ঞান, সেই জ্ঞান জন্ম দেয় ক্ষমতার। জাক লাঁকা 'অবচেতন'কেও ডিসকোর্সের একটা ফর্ম মনে করেন, কেননা 'অবচেতনা-ডিসকোর্সের প্যাটার্ন' সাহিত্যে সবসময় পুনরাবৃত্ত।